PG BN S1-04 (DSE)

দ্বি-বার্ষিক স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রম
(সি.বি.সি.এস; এন.ই.পি ২০২০ অনুসরণে)

প্রথম ষাণ্মাসিক

বাংলা বানান, ছন্দ ও অলংকার, সম্পাদনা

বাংলা



পদ্মনাথ গোহাঞিবরুয়া মানবিক বিদ্যা অনুষদ
কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ রাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

বিষয় বিশেষজ্ঞ মণ্ডলী

ড° উষারঞ্জন ভট্টাচার্য, অধ্যাপক, (অবসরপ্রাপ্ত), বাংলা বিভাগ, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়

ড° জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত, সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, প্রাগ্‌জ্যোতিষ মহাবিদ্যালয়

ড° কান্তারভূষণ নন্দী, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, এল.ও.কে.ডি মহাবিদ্যালয়

ড° সঞ্জয় ভট্টাচার্য, সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়

পাঠ্যবিষয়ের সমন্বয় রক্ষাকারী : ড° সৈকত রাউত, কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ রাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

ড° মৃণাল জ্যোতি গোস্বামী, কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ রাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যয়ন উপকরণ নির্মাণ গোষ্ঠীর সদস্য

অধ্যায়	**লেখক**
১, ২ ও ৩	ড° সঞ্জয় দে, নগাঁও মহাবিদ্যালয় (অটোনমাস)
৪,৫,৬,৭ ও ৮	ড° মহুয়া চ্যাটার্জী, এল. ও. কে. ডি মহাবিদ্যালয়
৯	ড° তীর্থঙ্কর চক্রবর্তী, হাইলাকান্দি ওমেন্স কলেজ
১০ ও ১১	দীপঙ্কর সাহা, গবেষক, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়
১২, ১৩ ও ১৪	ড° সৈকত রাউত, কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ রাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদনা

বিষয়বস্তু ও ভাষা সম্পাদনা : ড° সঞ্জয় ভট্টাচার্য, অধ্যাপক, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়

ড° সৈকত রাউত, কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ রাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

গ্রন্থন বিভাগের সম্পাদনা : ড° সৈকত রাউত, কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ রাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

This Self learning Material (SLM) of the Krishna Kanta Handique State Open University is made available under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 License (international) httpÊ.//creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

ISBN :

কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ রাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়ে পঞ্জীয়ক দ্বারা প্রকাশিত

মুখ্য কার্যালয় : পাটগাঁও, রাণী গেট, গুয়াহাটি- ৭৮১০১৭

নগর ক্যাম্পাস : রাষ্ট্রীয় সড়কপথ-২৭, রেশম নগর, খানাপাড়া, গুয়াহাটি-৭৮১০২২; www.kkhsou.in

পাঠ্য বিষয়ের পরিচয় : 'বাংলা বানান, ছন্দ ও অলংকার, সম্পাদনা

বর্তমান মডিউলটি CBCS দ্বারা প্রস্তাবিত NEP-2020 আদরা অনুযায়ী সাজানো একটি দ্বি-বার্ষিক স্নাতকোত্তর পাঠক্রমের প্রথম যাণ্মাসিকের জন্য গৃহীত পাঠ্য বিষয়। এই পাঠ্য বিষয়ের শিরোনাম 'বাংলা বানান, ছন্দ ও অলংকার, সম্পাদনা', শিরোনামটি মডিউলের অধীন পাঠে কী কী আয়ত্ত করা যেতে পারে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়। সমগ্র পাঠ্য বিষয়টি অধ্যয়ন করলে শিক্ষার্থী ও শিক্ষা অনুরাগীরা বাংলা বানান রীতি, তার পরিবর্তন ও রূপান্তর, সাম্প্রতিক গতি-প্রকৃতির সঙ্গে পরিচিত হবেন। সেই সঙ্গে বাংলা ছন্দ ও অলংকার এবং সম্পাদনার বৃহৎ ক্ষেত্রটিকে এখানে পাঠ্য বিষয় হিসাবে নির্বাচন করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের বুদ্ধিবৃত্তির কৌতূহল নিবৃত্তি এবং পরীক্ষা-ভিত্তিক উদ্দেশ্যের সমস্ত দিককে আয়ত্ত করার জন্য বাংলা বিদ্যাচর্চায় অন্তর্ভুক্ত এই সকল বিষয়কে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই স্ব-অধ্যয়নমূলক বইটি শিক্ষার্থীদের জন্য একটি দিক-নির্দেশক সেতুবন্ধন মাত্র। আশা করা যায়, আগ্রহী শিক্ষার্থীরা পাঠ্য অন্তর্গত পাঠগুলি ভালো ভাবে আয়ত্ত করে তাদের সৃজনশীলতা এবং শেখার মান প্রদর্শন করতে সক্ষম হবেন। তাঁরা স্বশিক্ষা অর্জনের পথে সফলভাবে এগিয়ে যেতে পারবেন।

এই মডিউলটিতে ১৪টি অধ্যায় আছে প্রথম অধ্যায়ে রয়েছে বাংলা বানানের ইতিহাস ও সমস্যা পর্যালোচনা। দ্বিতীয় অধ্যায়ে রয়েছে বাংলা বানানের গঠন পর্যালোচনা, তৃতীয় অধ্যায়ে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির বানানবিধি, চতুর্থ অধ্যায়ে রয়েছে বাংলা ছন্দ পরিচয়, পঞ্চম অধ্যায়ে রয়েছে বাংলা ছন্দ নির্ণয়, ষষ্ঠ অধ্যায়ে রয়েছে বাংলা অলংকার পরিচয়-১ম পর্ব, সপ্তম অধ্যায়ে রয়েছে বাংলা অলংকার পরিচয়-২য় পর্ব, অষ্টম অধ্যায়ে রয়েছে বাংলা অলংকার পরিচয়-৩য় পর্ব, নবম অধ্যায়ে রয়েছে বাংলার খ্যাতনামা সম্পাদকদের পরিচয়, দশম অধ্যায়ে রয়েছে বাংলা সম্পাদনার স্বরূপ ও নানা প্রসঙ্গ, একাদশ অধ্যায়ে রয়েছে সম্পাদনার নীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, দ্বাদশ অধ্যায়ে রয়েছে গ্রন্থ সম্পাদনা, ত্রয়োদশ অধ্যায়ে রয়েছে প্রুফ সংশোধন-১ম পর্ব, চতুর্দশ অধ্যায়ে রয়েছে প্রুফ সংশোধন-২য় পর্ব। এভাবে বানান, ছন্দ-অলংকারের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলোকে উপলব্ধি ও আত্মস্থ করার সমস্ত উপকরণে সমৃদ্ধ এই কর্মের পাঠ্যক্রম শিক্ষার্থীদের কাছে সফল ভাবে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছে।

এই পাঠ্যবিষয়গুলো অধ্যয়ন করার সময়, শিক্ষার্থী মূল পাঠের নীচে আয়তকার বাক্সের মধ্যে পাঠের অতিরিক্ত কিছু বিষয় 'আসুন জেনে নেই' শিরোনামে জানতে পারবেন। আবার, 'অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন'-এর মাধ্যমে প্রদত্ত প্রশ্নাবলি শিক্ষার্থীর অধ্যয়নের অগ্রগতির স্ব-মূল্যায়নের সুবিধা দেবে। এই প্রশ্নাবলির উত্তর বা উত্তরের নির্দিষ্ট সংকেত 'অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত'-এ উল্লেখ করা হয়েছে। 'অতিরিক্ত পঠন' বিভাগে উল্লিখিত বইগুলোও এই অধ্যায়ে আলোচিত বিভিন্ন ধারণার বিস্তারিত অধ্যয়নের জন্য সহায়ক একই সঙ্গে এই উল্লেখ অধ্যায়টি গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে ঋণস্বীকার হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। শিক্ষার্থী যদি এই বিষয় সম্পর্কে আরও জানতে চান তবে উল্লিখিত বইগুলো অধ্যয়ন করতে পারেন। কিছু নমুনা প্রশ্নও অধ্যায়ের শেষে 'আদর্শ প্রশ্নাবলি' হিসেবে দেওয়া হয়েছে।

বিষয় সূচি

অধ্যায় ১ : বাংলা বানানের ইতিহাস ও সমস্যা পর্যালোচনা

বাংলা বর্ণমালা ও তাদের উচ্চারণ, বানান কেন্দ্রিক নানা সমস্যা ও তার সমাধান প্রয়াস

অধ্যায় ২ : বাংলা বানানের গঠন পর্যালোচনা

বাংলা বানান গঠনের রীতিপদ্ধতি, ণত্ববিধি-ষত্ববিধি

অধ্যায় ৩ : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির বানানবিধি

আকাদেমি নির্দেশিত বাংলা বানানের সূত্রসমূহের পর্যালোচনা

অধ্যায়- ৪ : বাংলা ছন্দ পরিচয়

বাংলা ছন্দের ত্রিধারা, ছন্দ নির্ণয়ের নানা অনুষঙ্গ ও পদ্ধতি

অধ্যায়- ৫ : বাংলা ছন্দ নির্ণয়

নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুযায়ী ছন্দ নির্ণয়

অধ্যায়- ৬ : বাংলা অলংকার পরিচয়-১

বাংলা অলংকারের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্যসমূহ, প্রকারভেদ, উপাদান

অধ্যায়- ৭ : বাংলা অলংকার পরিচয়-২

শব্দালংকারের সামগ্রিক পরিচয়, নির্বাচিত অলংকারসমূহ-শব্দালংকার— ১. অনুপ্রাস ২. যমক ৩. শ্লেষ ৪. বক্রোক্তি : সংজ্ঞা ও নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণে নির্বাচিত অলংকার নির্ণয়

অধ্যায়- ৮ : বাংলা অলংকার পরিচয়- ৩

অর্থালংকারের সামগ্রিক পরিচয়, নির্বাচিত অলংকারসমূহ—

অর্থালঙ্কার- ১. উপমা ২. রূপক ৩. উৎপ্রেক্ষা ৪. অপহ্নুতি ৫. ব্যতিরেক ৬. ব্যাজস্তুতি, সংজ্ঞা নির্ণয় ও নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণে নির্বাচিত অলংকার নির্ণয়

অধ্যায়- ৯ : বাংলার খ্যাতনামা সম্পাদকের পরিচয়

নির্বাচিত সম্পাদক- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাগরময় ঘোষ

অধ্যায়- ১০ : বাংলা সম্পাদনা স্বরূপ ও নানা প্রসঙ্গ

সম্পাদনা কী ও কেন, সম্পাদক ও সম্পাদনা, সম্পাদকীয় নির্মাণ, সংবাদ সূচনা ও পুনর্লিখন, সংকলন ও কপি পরীক্ষা

অধ্যায়- ১১ : সম্পাদনার নীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ

সম্পাদনার নীতিসমূহ, সংবাদপত্র সম্পাদনা, সম্পাদনা চিহ্ন, অঙ্গসজ্জা, শিরোনাম, টাইপসজ্জা ও মার্জিন

অধ্যায়- ১২ : গ্রন্থ সম্পাদনা

গ্রন্থ সম্পাদনা কী, গ্রন্থ সম্পাদকের করণীয় কর্তব্য, নীতি ও নিয়ম

অধ্যায়- ১৩ : প্রুফ সংশোধন- ১

প্রুফ সংশোধন কী ও কেন, প্রুফ সংশোধনের ইতিহাস

অধ্যায়- ১৪ : প্রুফ সংশোধন- ২

পাণ্ডুলিপি পরিচয়, প্রুফ সংশোধন প্রক্রিয়া, প্রুফ সংশোধনের বিভিন্ন সংকেত চিহ্ন ও তাদের প্রয়োগ

অধ্যায় ১ : বাংলা বানানের ইতিহাস ও সমস্যা পর্যালোচনা

অধ্যায় বিন্যাস

১.১ জ্ঞাতব্য বিষয়
১.২ পরিচিতি
১.৩ বাংলা বানানের ইতিহাস
১.৪ বাংলা বর্ণমালা, উচ্চারণকেন্দ্রিক নানা সমস্যা ও তার সমাধান সূত্র
১.৫ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম
১.৬ অতিরিক্ত পঠন
১.৭ অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্নের উত্তর সংকেত
১.৮ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই অধ্যায়টি পড়ে আপনি—

- বাংলা বানানের ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- বাংলা বানানের বর্ণ ও তাদের উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- বাংলা বর্ণসমূহ ও তাদের উচ্চারণজনিত সমস্যার সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- সমস্যা সমাধানের প্রয়াস সম্পর্কেও জানতে পারবেন।

১.২ পরিচিতি

বানান সম্পর্কে বিস্তারিত জানার আগে বানান কী তা জানা প্রয়োজন। এক বা একাধিক ধ্বনি মিলে যখন একটি অর্থবোধক একক তৈরি হয় তখন তাকে শব্দ বলে। এখন মৌখিক ভাবে উচ্চারিত শব্দকে লিখতে হলে ঐ ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছের জন্য নির্দিষ্ট অক্ষর বা বর্ণের সাহায্য নেওয়া হয়। সুতরাং শব্দের ধ্বনিমূর্তিকে যে অক্ষর সজ্জার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়, সেই বর্ণবিন্যাসকেই বানান বলে। অর্থাৎ বানান হল উচ্চারিত শব্দের লিখিত রূপের নির্দেশক এক নির্দিষ্ট বর্ণসজ্জা। বাংলা ভাষায় এই পারস্পরিক বর্ণসজ্জায় বর্ণক্রম সংস্থানের বিধি ব্যবস্থা সংক্রান্ত আলোচনার ইতিহাস এই অধ্যায়ে আলোচিত হবে। সেই সঙ্গে বাংলা বর্ণগুলির উচ্চারণ বৈচিত্র্য, তার সৃষ্ট উচ্চারণের বানান সমস্যা ও তাদের সমাধানের বিভিন্ন প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করা হবে।

১.৩ বাংলা বানানের ইতিহাস

বাংলা বানানের ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনার গোড়াতেই বলে নেওয়া প্রয়োজন প্রাচীন হাতে লেখা পুথির বানান বিষয়ক আলোচনারও একটি ধারা রয়েছে। অবশ্য এখানে কেবলমাত্র মুদ্রিত গ্রন্থের বানান সম্পর্কিত আলোচনার ইতিহাসই তুলে ধরা হবে। বাংলা ছাপার ক্ষেত্রে পৃথক অক্ষরের ছাঁচ তৈরি করে বর্ণসজ্জার প্রথম উদাহরণ পাওয়া যায় ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেডের লেখা 'A Grammar of the Bengal Language' গ্রন্থে। এই বইতে ব্যবহারের জন্য হালহেড ও চার্লস উইলকিন্সের তত্ত্বাবধানে পঞ্চানন কর্মকার প্রথম ছেনি কেটে, ঢালাই করে ধাতুর সাহায্যে মুদ্রণ উপযোগী স্বতন্ত্র বাংলা হরফ তৈরি করেছিলেন। এই হরফ সাজিয়েই বাংলা শব্দের বানান ছাপার অক্ষরে লেখা শুরু হয়েছিল। যদিও প্রথম যুগের ছাপা বইতেও বাংলা বানানের ক্ষেত্রে হাতে লেখা পুথির বানানের মতো অসাম্য লক্ষ করা যায়।

ঊনবিংশ শতকের শেষভাগ থেকেই বাংলা বানান সম্পর্কে সচেতন চিন্তাচর্চার গোড়াপত্তন লক্ষ করা যায়। বাংলা বানান সমস্যার মূলে আছে যে বাংলা বর্ণমালার বর্ণব্যবস্থা সে বিষয়ে প্রথম নজর দিয়েছিলেন হ্যালহেড তাঁর ব্যাকরণ গ্রন্থে। বাংলা বর্ণমালার বর্ণাধিক্য ও উচ্চারণ অনৈক্যের প্রতি লক্ষ রেখে তিনি বলেছিলেন "The great numbers of letters, the complex mode of combination and the difficulty of pronunciation are considerable impediments to the study of the Bengal languagee, and the carelessness and ignorance of the people have much aggravated the inconvenience by the universal inaccuracy of their writings:"[১] সেইসঙ্গে তিনি দুই 'ন' ও দুই 'ব'- এর উচ্চারণে পার্থক্য না থাকার বিষয়টিও উল্লেখ করেছিলেন। ১৮০১-এ প্রকাশিত উইলিয়ম কেরির বাংলা ব্যাকরণ 'A Grammar of the Bengalee Language' গ্রন্থেও হ্যালহেডের চিন্তার অনুসরণ দেখা যায়। কেরি অবশ্য বাংলা বানানের বিভিন্নতা দূর করে সমতা আনার চেষ্টা করেছেন। বাংলা বানানের সাম্য আনার জন্য তিনি সংস্কৃতের উপর নির্ভর করেছিলেন, অ-তৎসম শব্দের ক্ষেত্রেও তিনি সংস্কৃত বানান রীতি প্রয়োগ করেছিলেন। কেরির পর বাংলা ভাষায় বাঙালির লেখা প্রথম বাংলা ব্যাকরণ রামমোহন রায়ের গৌড়ীয় ব্যাকরণ প্রকাশিত হয় ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে। রামমোহনও তাঁর গ্রন্থে লিখছেন "গৌড়ীয়েরা সংস্কৃত ব্যাকরণানুসারে তাঁহাদের অক্ষর সকলকে ৩৪ ব্যঞ্জন এবং ১৬ স্বরে বিভক্ত করিয়াছেন, কিন্তু, ইহার মধ্যে অনেক অক্ষর গৌড়ীয় ভাষাতে উচ্চারণে আইসে না কেবল সংস্কৃত পদের ব্যবহার ভাষায় যখন করেন তখন ঐ সকল অক্ষরকে লিখিবার প্রয়োজন হয়।"[২] বাংলা বর্ণমালার এই অসঙ্গতি নিয়ে বহু অভিযোগ উত্থাপিত হলেও তা সমালোচনার স্তরেই আবদ্ধ ছিল। এ ব্যাপারে প্রথম কার্যকরী পদক্ষেপ নেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর বর্ণপরিচয় নামক প্রাথমিক শিশুশিক্ষার গ্রন্থে।

বিদ্যাসাগর তাঁর বর্ণপরিচয় গ্রন্থে বাংলা বর্ণমালায় তিনটি ক্ষেত্রে সংস্কার সাধন করেন। প্রথমত বিদ্যাসাগর 'দীর্ঘ ঋ' ও 'দীর্ঘ ঌ' কে বর্ণমালা থেকে বাদ দেন। দ্বিতীয়ত 'ড়', 'ঢ়', ও 'য়'-কে বর্ণমালায় যুক্ত করেন। তৃতীয়ত অনুস্বার এবং বিসর্গকে ব্যঞ্জন বর্ণ রূপে স্বীকৃতি দেন এবং চন্দ্রবিন্দুকে স্বতন্ত্র ব্যঞ্জন রূপে নির্দেশ করেন। এই বিদ্যাসাগরীয় বর্ণমালা রীতিই পরবর্তীকালে অনুসৃত হয়।

যদিও বিদ্যাসাগরীয় সংস্কারে সব সমস্যার সমাধান হল না। 'ঋ', 'ঌ' রয়েই গেল; 'ণ', 'ন', 'শ', 'ষ'এর সমস্যারও সমাধান হল না। ফলে প্রস্তাব ও পর্যালোচনা অব্যাহত রইল। বানানের প্রধান উপাদান যেহেতু বর্ণ সেহেতু বাংলা বর্ণমালা সংস্কারের আলোচনাই প্রাথমিকভাবে প্রাধান্য লাভ করেছে। উত্তরপাড়া বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের লিখিত ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে Calcutta Review পত্রিকায় প্রকাশিত 'Bengali Spoken and Written' শীর্ষক নিবন্ধটিই এই সংক্রান্ত প্রথম উদ্যোগ। এরপর ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত বঙ্গদর্শন পত্রিকার পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন সংখ্যায় তিন কিস্তিতে এক অজ্ঞাত লেখকের 'বাঙ্গালা বর্ণমালা সংস্কার' নামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটিতে বাংলা বর্ণের সংখ্যা হ্রাস সম্পর্কে লেখকের সুচিন্তিত মতামত প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা বর্ণমালার অসঙ্গতি নিয়ে একটি দীর্ঘ আলোচনা পাওয়া যায় ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে 'জন্মভূমি' মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাঙ্গালা ভাষা' নামক প্রবন্ধে। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে 'নব্যভারত' শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত অশ্বিনীকুমার দাসগুপ্তের 'বাঙ্গালা বর্ণমালার অসম্পূর্ণতা' প্রবন্ধে বাংলা বর্ণমালায় বিদেশী ভাষার ধ্বনিজ্ঞাপক বর্ণের অভাব সম্পর্কে উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে 'প্রবাসী' কার্তিক সংখ্যায় যোগেশচন্দ্র রায় তাঁর 'বাঙ্গালা অক্ষর' প্রবন্ধেও বাংলা বর্ণমালার অনাবশ্যক বর্ণ সম্পর্কে আলোচনা করেন। একই বছরে বঙ্গদর্শন পত্রিকায় ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কার্তিক সংখ্যায় 'পঞ্চস্বর' ও ফাল্গুন সংখ্যায় 'চতুর্দশ ব্যঞ্জন' প্রবন্ধ দুটিতে যথাক্রমে স্বরবর্ণের ও ব্যঞ্জন বর্ণের সংখ্যা হ্রাসের প্রস্তাব করেন।

অতঃপর বাংলা বানানের বর্ণ সংস্থান নিয়েও বিভিন্ন মতামতের প্রকাশ দেখা গেল। বানান সংক্রান্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতামতের সংকলিত রূপ ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁর শব্দতত্ত্ব গ্রন্থে প্রকাশিত হল; যেখানে বাংলা উচ্চারণ ও বাংলা বানান সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত মতামতের পরিচয় পাওয়া গেল। রবীন্দ্রনাথ উচ্চারণ অনুযায়ী বানানের পক্ষপাতিত্ব করে বিশেষণ ও ক্রিয়াপদের অন্তিম ধ্বনির উচ্চারণ ও-কারান্ত হলে তার বানানে ও-কার ব্যবহারের পক্ষে মত দেন। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে প্রবাসী আশ্বিন সংখ্যায় যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি তাঁর 'বাংলা শব্দের বানান' প্রবন্ধে বাংলা বানান বিভ্রান্তির বিভিন্ন দিক চিহ্নিত করেন। যোগেশচন্দ্র তাঁর আলোচনায় মূলত ধ্বনি ভিত্তিক বানানের পক্ষপাতিত্ব করেছেন। যোগেশচন্দ্রের এই প্রবন্ধের প্রত্যুত্তরে ঐ বছরেই প্রবাসী পত্রিকার অগ্রহায়ণ সংখ্যায় অনুকূলচন্দ্র বসুর 'বঙ্গভাষায় বানান সমস্যা' শীর্ষক প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে লেখক সংস্কৃত শব্দের মূল বানান বজায়

রেখে অপভ্রংশ শব্দ বা অন্য ভাষার শব্দের ধ্বনি অনুযায়ী বানানের পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। যোগেশচন্দ্র রায়ের প্রবন্ধের প্রতিক্রিয়ায় ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে সতীশচন্দ্র ঘোষ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় লেখেন 'বাঙ্গালা শব্দ তথা বানান ও লিখন সমস্যা' শীর্ষক প্রবন্ধটি। খাঁটি বাংলা শব্দের উচ্চারণ অনুযায়ী বানানের ক্ষেত্রে কোন্ স্থানের উচ্চারণকে মান্য ধরা হবে তা নির্ণয় করার জন্য সাহিত্য পরিষদের পক্ষ থেকে একটি মান্য বাংলা অভিধান প্রকাশের প্রস্তাব করেছেন সতীশচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধে। এই সংক্রান্ত অন্যান্য উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধের মধ্যে রয়েছে প্রবাসী-তে প্রকাশিত সারদাকান্ত সেনের 'বাঙ্গালা অক্ষর' (১৯১৪), বীরেশ্বর সেনের 'বাঙ্গালা ভাষা' (১৯১৫), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বাংলা বানান' (১৯১৬), যোগেশচন্দ্র রায়ের 'বঙ্গভাষায় অতিচার' (১৯১৬), রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 'বাংলা বানান' (১৯১৬), বিধুশেখর ভট্টাচার্যের 'বাঙ্‌লার বানান সমস্যা' (১৯১৬), বিজয়চন্দ্র মজুমদারের 'অক্ষরের আলোচনা' (১৯১৬), সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'বাঙ্গালা বানান সমস্যা' (১৯১৭), সবুজপত্র পত্রিকায় প্রকাশিত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বাংলার বেখাপ বর্ণমালা' (১৯১৭), ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত অবনীমোহন চক্রবর্তীর 'বাংলা ভাষার বর্ণ সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব' (১৯২১) ইত্যাদি।

বাংলা বানানের রীতিনীতি নিয়ে এযাবৎ সমস্ত চিন্তাচর্চাই ব্যক্তিগত স্তরে সীমাবদ্ধ ছিল। বাংলা বানান সংক্রান্ত নিয়মবিধি তৈরির প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ দেখা যায় ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর মুদ্রিত গ্রন্থের বানানে সমতা বিধানের জন্য প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে একটি সুনির্দিষ্ট বানানবিধি প্রস্তুত করার নির্দেশ দেন। সেই অনুসারে প্রবাসী পত্রিকার ১৩৩২ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ 'চলতি ভাষার বানান' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। প্রশান্তচন্দ্র প্রবন্ধে লেখেন- "কিছুদিন আগে রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থস্বত্ব যখন বিশ্বভারতীর হাতে আসে, তখন বাঙ্‌লা বানান বিশেষত চ'ল্‌তি ভাষার বানান-সম্বন্ধে একটি সাধারণ রীতি অবলম্বন কর্‌বার কথা হয়। সম্প্রতি অনেক আলোচনার পরে একটা খসড়া বানান-পদ্ধতি খাড়া করা হয়েছে।"[৩] সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের যৌথ প্রচেষ্টায় এই বানানবিধি তৈরি হয়েছিল। বাংলা বানানবিধি তৈরির পরবর্তী প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ হিসেবে উল্লেখ্য ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে বাংলা বানানের বিধিবদ্ধ নিয়ম সংকলনের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক একটি সমিতি গঠন। প্রমথনাথ চৌধুরী, বিধুশেখর ভট্টাচার্য, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, দুর্গামোহন ভট্টাচার্য, চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ প্রমুখ সদস্যদের নিয়ে গঠিত এই সমিতির সভাপতি ও সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে রাজশেখর বসু ও চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য। সমিতির আলোচনা মর্মে প্রস্তুত করা বাংলা বানানের নতুন পদ্ধতি সম্বলিত পুস্তিকার প্রথম সংকলন ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তিকা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই পণ্ডিত মহলে প্রবল বিতর্কের ঢেউ ওঠে। সেই সব

সমালোচনা ও মতানৈক্য পুনর্বিবেচনা করে ১৯৩৬-এর অক্টোবরে দ্বিতীয় সংস্করণ ও ১৯৩৭-এর জুন মাসে তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে একটি বানান সংস্কার সমিতি গঠন করেছিলেন, কিন্তু সমিতি তার কাজ সমাপ্ত করতে পারেনি। বর্তমান বাংলাদেশে ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে সৈয়দ আলী আহসানের নেতৃত্বে বানান সংস্কার সমিতি গঠিত হয়েছিল। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে মহম্মদ শহীদুল্লাহের উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পরিষদ বাংলা বানান সরলীকরণের প্রস্তাব গ্রহণ করে। যদিও মুহম্মদ এনামুল হক, মুহম্মদ আবদুল হাই ও মুনীর চৌধুরী ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে এই পদক্ষেপের বিরোধিতা করেন। ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে ঢাকা বাংলা একাডেমী বানানের সর্বজনগ্রাহ্য নিয়ম প্রণয়নের জন্য বিশেষজ্ঞ সমিতি গঠন করে। ঐ সমিতির পরামর্শ ক্রমে ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে বাংলা একাডেমী প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম প্রকাশিত হয়। বাংলা বানান বিধি প্রণয়নের সামাজিক প্রয়াস হিসেবে ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে আনন্দবাজার পত্রিকাগোষ্ঠীর একটি উদ্যোগ গ্রহণ উল্লেখযোগ্য। আনন্দবাজার প্রকাশনা সংস্থায় ব্যবহারের জন্য নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সম্পাদনায় 'বাংলা: কী লিখবেন, কেন লিখবেন' শীর্ষক একটি বানানবিধি প্রকাশিত হয়। বাংলা বানানের নিয়ম প্রবর্তনের সর্বশেষ সাংগঠনিক উদ্যোগ হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি প্রণীত 'আকাদেমি বানান অভিধান'-এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে। এখন অবধি এর পাঁচটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে এবং সর্বশেষ সংস্করণটি ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে।



অগ্রগতি-নির্ধারক প্রশ্ন

প্রশ্ন নং ১: নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দিন-

ক) ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড, উইলিম কেরী ও রামমোহন রায়ের লেখা ব্যাকরণগ্রন্থগুলির পরিচয় দিন।

.....

খ) বিদ্যাসাগরের বর্ণমালা সংস্কার সম্পর্কে আলোচনা করুন।

.....

গ) প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশের বাংলা বানান সংস্কার উদ্যোগ সম্পর্কে লিখুন।

.....



আসুন, জেনে নিই

"বস্তুতপক্ষে ভারতীয় বর্ণমালার মতো বৈজ্ঞানিক প্রথায় সজ্জিত বর্ণমালা পৃথিবীতে আর একটিও নেই। এতে শুধু যে স্বর আর ব্যঞ্জনে পার্থক্য করা হয়েছে তাই নয়, ব্যঞ্জনের বিন্যাসে উচ্চারণের অতি সূক্ষ্ম পার্থক্য বজায় রেখেও উচ্চারণ-স্থান অনুযায়ী সেগুলিকে (বর্গীয় ব্যঞ্জনকে) এইভাবে সাজানো হয়েছে- অল্পপ্রাণ অঘোষ, মহাপ্রাণ অঘোষ, অল্পপ্রাণ ঘোষবৎ, মহাপ্রাণ ঘোষবৎ এবং নাসিক্য। উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী (কণ্ঠ) ক, (তালু) চ, (মূর্ধা) ট, (দন্ত) ত, (ওষ্ঠ) প- এই পাঁচটি বর্গে ওই বর্গীয় ব্যঞ্জনগুলিকে সাজানো হয়েছে। অর্ধস্বর-অর্ধব্যঞ্জন 'য'র'ল' উষ্মব্যঞ্জন 'শ'ষ'স'-কে পরে দেওয়া হয়েছে এবং অপেক্ষাকৃত গৌণ বর্ণগুলিকে একেবারে শেষে রাখা হয়েছে। এ বৈজ্ঞানিক বিন্যাসের তুলনা নেই।"[৪]

১.৪ বাংলা বর্ণমালা, উচ্চারণকেন্দ্রিক নানা সমস্যা ও তার সমাধান সূত্র

বাংলা ভাষার শব্দগুলি লক্ষ করলে দেখা যায়, শব্দগুলি বিভিন্ন উৎস থেকে এসেছে। সংস্কৃত থেকে অপরিবর্তিত অবস্থায় যে শব্দগুলি এসেছে তাদেরকে বলে তৎসম শব্দ। যে সংস্কৃত শব্দগুলি প্রাকৃত ভাষার বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে পরিবর্তনের নিয়ম মেনে এসেছে তাদেরকে তদ্ভব শব্দ বলে। আবার কিছু সংস্কৃত শব্দ থেকে ঈষৎ বিকৃত হয়ে ভগ্ন তৎসম শব্দ রূপে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও অন্য প্রাদেশিক শব্দ, বিদেশি শব্দ বিভিন্ন রূপে বাংলা শব্দভাণ্ডারে যুক্ত হয়েছে। এখন সমস্ত অপরিবর্তিত সংস্কৃত শব্দকে তৎসম এবং তার বাইরে থাকা অন্য সব শব্দকে অ-তৎসম বলে ভাগ করা যায়। সেক্ষেত্রে দেখা যায় এই দুই ভাগের শব্দের বানান একই রীতিতে করা সমস্যাজনক। বাংলা বানানের মূল সমস্যা, বানান ব্যুৎপত্তিভিত্তিক হবে না বানান উচ্চারণ ভিত্তিক হবে সেই রীতি নির্ধারণ নিয়ে। বানান কেবলমাত্র উচ্চারণ ভিত্তিক হলে শব্দের পূর্বাপর পরিবর্তনের ঐতিহ্য লুপ্ত হবে আবার সমস্ত শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করে বানান স্থির করাও অসম্ভব, এমনকি শব্দের ব্যুৎপত্তি নিয়ে মতভেদও বর্তমান। তৎসম শব্দ 'লক্ষ্মী' বা 'সহ্য' শব্দকে কেবলমাত্র উচ্চারণ অনুসারে 'লোক্‌খি' বা 'শোজ্‌ঝো' লেখা যেমন অনুচিত তেমনি 'রাজ্ঞী' শব্দের পরিবর্তনের ইতিহাস বজায় রাখার জন্য 'রাণী' বা 'কার্য' থেকে এসেছে বলে 'কায' বানানও নিরর্থক কারণ 'ণ' ও 'ঈ' -এর উচ্চারণ প্রবণতা বাংলায় নেই এবং 'য' তার প্রকৃত উচ্চারণ হারিয়ে বাংলায় বর্গীয় 'জ' রূপে উচ্চারিত হয়। এই সমস্যার সমাধান হিসেবে বাংলায় ব্যবহৃত সংস্কৃত শব্দের বানান যথাসম্ভব অপরিবর্তিত রাখা ও সংস্কৃত নয় এমন শব্দের বানান উচ্চারণ অনুযায়ী করার উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

বাংলা বানানের কয়েকটি সমস্যা নিচে উল্লেখ করা হল—

১) পদান্ত ধ্বনির উচ্চারণ ব্যঞ্জনান্ত হলেও বানানে 'অ'-কারান্ত থাকে। যেমন গাছ, ফুল,

ইত্যাদি শব্দের বানান যথাক্রমে গাছ্ ফুল্ নয়।

২) পদের আদিতে 'অ'-ধ্বনি 'ও'-কারান্ত উচ্চারিত হলেও বানানে 'অ' থাকে। যেমন তরু, মরু, সরু বানান লেখা হলেও শব্দগুলির উচ্চারণ তোরু, মোরু, সোরু ইত্যাদি।

৩) ক্রিয়াপদে পদান্তে 'অ'-ধ্বনি 'ও'-কারান্ত উচ্চারিত হলেও বানানে 'অ' থাকে। যেমন বলল, করল, হল বানান লেখা হলেও শব্দগুলির উচ্চারণ আসলে বোললো, কোরলো, হোলো।

৪) বাংলায় 'এ' ধ্বনির দুটি উচ্চারণ যথাক্রমে —'এ' ও 'অ্যা'। যেমন 'দেশ' শব্দে 'এ'-র উচ্চারণ 'এ'-কারান্ত কিন্তু 'খেলা' শব্দে 'এ'-র উচ্চারণ 'অ্যা' (খ্যালা)। অথচ দুটিরই বানান এক।

৫) বিদেশি শব্দের লিপ্যন্তরে 'উ'-কার, 'ও'-কারের পর স্বরধ্বনি বা 'য়' দুইই ব্যবহার করা হয়। ফলে 'জানুয়ারি' ও 'জানুআরি' বানান বিভ্রান্ত করে।

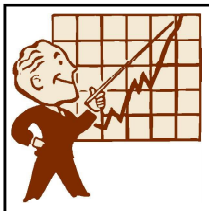
৬) 'ঋ'-এর উচ্চারণ বাংলায় 'রি'-এর মতো। 'কৃত' ও 'ক্রীত' শব্দদুটির উচ্চারণ এক, কিন্তু পৃথক বানানে পৃথক অর্থে দুটি ভিন্ন শব্দ।

৭) বাংলা উচ্চারণ 'ন'হলেও বানানে 'ণ' থাকে। 'মন' ও 'মণ' শব্দদুটিও উচ্চারণে এক, কিন্তু পৃথক বানানে পৃথক অর্থে দুটি ভিন্ন শব্দ।

৮) বাংলা উচ্চারণ 'শ' হলেও বানানে 'স' বা 'ষ' থাকে।

৯) 'দূরবিন' ও 'পূজারি' বানানে দূর ও পূজা বানানে 'উ'-কার না 'ঊ'-কার হবে কারণ শব্দের 'দূর' ও 'পূজা' অংশটি সংস্কৃত হলেও শব্দদুটি তৎসম নয়।

১০) উচ্চারণ অনুযায়ী বানানে আঞ্চলিক উচ্চারণ প্রবণতাজনিত সংকটের সম্ভাবনা থাকে।



অগ্রগতি-নির্ধারক প্রশ্ন

প্রশ্ন নং ২: নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দিন-

ক) বাংলা শব্দভাণ্ডারের শব্দগুলির উৎস সম্পর্কে আলোচনা করুন।

.....

খ) বাংলা বানান নির্ধারণের রীতি দুটি উল্লেখ করে বানানের সমস্যার বিষয়টি ব্যাখ্যা করুন।

.....

তথ্যসূত্র :

১) Nathaniel Brassey Halhed (1778); A Grammar of the Bengal Language, Hoogly in Bengal, p-3.

২) রামমোহন রায় (১৮৪৫); গৌড়ীয় ব্যাকরণ, ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি প্রেস, কলকাতা, পৃ- ৪-৫
৩) প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ (১৯২৫); 'চলতি ভাষার বানান', প্রবাসী, ১৩৩২ বঙ্গাব্দ, অগ্রহায়ণ সংখ্যা, কলিকাতা, পৃ-১৮২
৪) পবিত্র সরকার (২০১৯); ভাষা, দেশ, কাল, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা লি, কলকাতা, পৃ- ১৩২



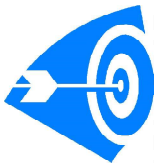
১.৫ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

- বাংলা ব্যাকরণ গ্রন্থগুলিতে বর্ণমালা ও বানানের সমস্যা পর্যালোচনা করা হয়েছে।
- বিদ্যাসাগরের বর্ণমালা সংস্কারের উদ্যোগ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।
- বাংলা বর্ণ ও বানানের সমস্যা ও সমাধান সম্পর্কে ব্যক্তিগত চিন্তাচর্চার উল্লেখ করা হয়েছে।
- বাংলা বানান সংস্কারের প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগগুলির বিবরণ দেওয়া হয়েছে।
- প্রতিবেশি দেশের বাংলা বানান সংস্কারের উদ্যোগগুলির পরিচয় দেওয়া হয়েছে।
- বাংলা বানান নির্ধারণের রীতি ও তার সমস্যা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।



১.৬ অতিরিক্ত পঠন

১) আচার্য, অধ্যাপক পি. (১৯৯৬); বাংলা বানান বিচিন্তা, ১ম-খণ্ড, কলকাতা : বিকাশ গ্রন্থ ভবন
২) আচার্য, অধ্যাপক পি. (১৯৯৬); বাংলা বানান বিচিন্তা, ২য় -খণ্ড, কলকাতা : বিকাশ গ্রন্থ ভবন
৩) ঘোষ, মণীন্দ্র কুমার (১৯৮৬); বাংলা বানান, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং,
৪) ভট্টাচার্য, রমেন (১৯৯১); বাংলা বানানের নিয়ম ও অনিয়ম, কলকাতা : সাহিত্য সংসদ
৫) ভট্টাচার্য, মিতালী (২০০৭); বাংলা বানান চিন্তার বিবর্তন, আগরতলা : পারুল প্রকাশনী
৬) সরকার, পবিত্র (১৯৮৭); বাংলা বানান সংস্কার: সমস্যা ও সম্ভাবনা, কলকাতা : চিরায়ত প্রকাশন
৭) সরকার, পবিত্র (১৯৯১); হাসতে হাসতে বানান, কলকাতা : শিশু সাহিত্য সংসদ
৮) সেনাপতি, দেব (১৯৮৮); বানানের ছড়া, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স



১.৭ অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্নের উত্তর সংকেত

১ নং প্রশ্নের উত্তর :

ক) বাংলা বানানের ইতিহাস..... উইলিয়াম কেরির বাংলা ব্যাকরণ... ইত্যাদি। বাংলা বানানের.. এভাবে উত্তর তৈরি করবেন।

খ) ১.৩ অংশের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের শেষাংশ দ্রষ্টব্য।

গ) ১.৩ অংশের পঞ্চম অনুচ্ছেদের শেষাংশ দ্রষ্টব্য।

২ নং প্রশ্নের উত্তর :

ক) ১.৪ অংশের প্রথম অনুচ্ছেদের প্রথমাংশ দ্রষ্টব্য।

খ) ১.৪ অংশের প্রথম অনুচ্ছেদের শেষাংশ দ্রষ্টব্য।



১.৮ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১) বাংলা বর্ণমালার সমস্যা ও বর্ণমালা সংস্কার সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২) বাংলা বর্ণ ও বানানের সমস্যা ও সমাধান সম্পর্কে ব্যক্তিগত স্তরে চিন্তাচর্চার একটি ঐতিহাসিক প্রতিবেদন রচনা করুন।

৩) বাংলা বানান সংস্কার সংক্রান্ত পশ্চিমবঙ্গের চারটি প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের পরিচয় দিন।

৪) বাংলা বানানের সমস্যাগুলি ব্যাখ্যা করুন।

অধ্যায়- : ২ বাংলা বানানের গঠন পর্যালোচনা

বিন্যাস ক্রম

২.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

২.২ পরিচিতি

২.৩ বাংলা বানান গঠনের রীতি পদ্ধতি

২.৩.১ সন্ধির নিয়মবিধি

২.৩.২ সমাসের নিয়মবিধি

২.৩.৩ প্রত্যয়ের নিয়মবিধি

২.৩.৪ অর্থকেন্দ্রিক বানানের পার্থক্য

২.৪ ণত্ববিধি-ষত্ববিধি

২.৪.১ ণত্ববিধি

২.৪.২ ষত্ববিধি

২.৫ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

২.৬ অতিরিক্ত পঠন

২.৭ অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্নের উত্তর সংকেত

২.৮ আদর্শ প্রশ্নাবলি

২.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই অধ্যায়টি পড়ে আপনি—

- বাংলা বানানের রূপ নির্ধারণের নিয়মবিধি সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- বানান শুদ্ধভাবে লেখার প্রচলিত রীতি-পদ্ধতি আয়ত্ত করতে পারবেন।
- সঠিক বানান লেখার জন্য ণত্ববিধি-ষত্ববিধির সূত্রগুলি শিখতে পারবেন।
- বানানের এই বিধিবিধানগুলি যথাযথভাবে অধ্যয়ন করলে ভবিষ্যতে বাংলা ভাষার যেকোনো রচনা সঠিক ও শুদ্ধ বানানে লিখতে পারবেন।

২.২ পরিচিতি

বানান বলতে যে বর্ণবিন্যাসকে বোঝায় সেই পারস্পরিক বর্ণসজ্জায় বর্ণক্রম সংস্থানের বিভিন্ন বিধিবদ্ধ নিয়ম রয়েছে। অক্ষর বিন্যাসের ক্রম নির্দেশক সেই প্রচলিত নিয়মগুলিই এই অধ্যায়ে আলোচিত হবে। এই নিয়মগুলি সাধারণত ভাষাতাত্ত্বিক ও ব্যাকরণগত বিধিবিধানের অন্তর্গত। পূর্ববর্তী অধ্যায়ের আলোচনা থেকে দেখা যায় বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত তৎসম শব্দের বানান যথাসম্ভব বজায় রাখার পক্ষে মত গৃহীত হয়েছে। এই

তৎসম শব্দের বানান গঠনের যে সমস্ত রীতিপদ্ধতি আছে সেগুলি ও বিশেষভাবে ণত্ববিধি ও ষত্ববিধি এই অধ্যায়ের মূল আলোচ্য বিষয়।

২.৩ বাংলা বানান গঠনের রীতিপদ্ধতি

তৎসম শব্দগঠন তথা বানান নির্ধারণের ক্ষেত্রে সন্ধিসূত্র, সমাসপ্রক্রিয়া ও প্রত্যয়বিধির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। স্বরধ্বনির সঙ্গে স্বরধ্বনির মিলনে স্বরসংগতির যে রূপ পাওয়া যায় তা গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে বানানে। আবার স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি এবং ব্যঞ্জনধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনির পারস্পরিক সংযোগে উদ্ভূত ধ্বনিরও উল্লেখযোগ্য প্রভাব বানানে দেখা যায়। সেই সঙ্গে বিসর্গসন্ধির ক্ষেত্রে বিসর্গের ধ্বনিগত পরিবর্তন, বিসর্গ বজায় থাকা বা বিসর্গলোপের নিয়মগুলির উপরেও বানান নির্ভর করে। এছাড়া দুটি শব্দ সংযুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠিত হলে সেই সমাসবদ্ধ শব্দের বানানও নিয়ম নির্দিষ্ট । দুটি শব্দ পৃথক পৃথক ব্যাসবাক্যে সমাসবদ্ধ হলে সমাসবদ্ধ শব্দটির বানান ও অর্থ পৃথক হয়। সেইসঙ্গে প্রত্যয় যোগেও বানানের পরিবর্তন হয়। সেকারণে সন্ধি, সমাস ও প্রত্যয় সংক্রান্ত বানান গঠনের রীতিপদ্ধতি বিশেষভাবে আলোচ্য। এছাড়া প্রায় সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দগুলির বানান পার্থক্যও লক্ষণীয়। এই জাতীয় শব্দজোড়গুলির একটি তালিকা এখানে দেওয়া হল।

২.৩.১ সন্ধির নিয়মবিধি

স্বরসন্ধির নিয়মগুলির জন্য নিম্নের তালিকাটি দ্রষ্টব্য

পরবর্ণ পূর্ববর্ণ	অ/আ	ই/ঈ	উ/ঊ	ঋ	এ/ঐ	ও/ঔ
অ/আ	আ	এ	ও	অর	ঐ	ঔ
ই/ঈ	য-ফলা+অ/ য-ফলা+আ	ঈ	য-ফলা+উ/ য-ফলা+ঊ		য-ফলা+এ/ য-ফলা+ঐ	য-ফলা+ও/ য-ফলা+ঔ
উ/ঊ	ব-ফলা+অ/ ব-ফলা+আ	ব-ফলা+ই/ ব-ফলা+ঈ	ঊ		ব-ফলা+এ/ ব-ফলা+ঐ	ব-ফলা+ও/ ব-ফলা+ঔ
ঋ	র-ফলা+অ/ র-ফলা+আ	র-ফলা+ই/ র-ফলা+ঈ	র-ফলা+উ/ র-ফলা+ঊ		র-ফলা+এ/ র-ফলা+ঐ	র-ফলা+ও/ র-ফলা+ঔ
এ	অয়্+অ/আ	অয়্+ই/ঈ				
ঐ	আয়্+অ/আ	আয়্+ ই/ঈ				
ও	অব্+অ/আ	অব্+ ই/ঈ				
ঔ	আব্+অ/আ	আব্+ ই/ঈ				

অর্থাৎ পূর্ববর্ণ অ/আ-এর সঙ্গে পরবর্ণ অ/আ যুক্ত হলে আ হবে। পূর্ববর্ণ অ/আ-এর সঙ্গে পরবর্ণ ই/ঈ যুক্ত হলে এ হবে। পূর্ববর্ণ অ/আ-এর সঙ্গে পরবর্ণ উ/ঊ যুক্ত হলে ও হবে। ইত্যাদি ক্রমে চলতে থাকবে।

অতঃপর স্বরধ্বনির সন্ধিকেন্দ্রিক কয়েকটি শুদ্ধ বানানের উদাহরণ দেখা যাক। যেমন-

১) অদ্য + অবধি = অদ্যাবধি (অ + অ = আ)

২) যোগী + ইন্দ্র = যোগীন্দ্র (যোগেন্দ্র নয়, কারণ যোগ + ইন্দ্র নয়।)

৩) অতি + অধিক = অত্যধিক (অত্যাধিক নয়, কারণ ই-কারের পর অ-কার থাকলে য-ফলা+অ-কার হবে, য-ফলা+ আ-কার নয়)

৪) উপরি + উক্ত = উপর্যুক্ত (উপরোক্ত নয়, কারণ ই-কারের পর উ-কার থাকলে য-ফলা + উ-কার হবে।)

এরকম স্বরধ্বনির সঙ্গে ব্যঞ্জনধ্বনির সন্ধিকেন্দ্রিক কয়েকটি শুদ্ধ বানানের উদাহরণ দেখা যাক। যেমন-

১) তরু + ছায়া = তরুচ্ছায়া (অর্থাৎ পূর্ববর্ণ স্বরধ্বনির সঙ্গে পরবর্ণ ছ যুক্ত হলে চ্ছ হবে।)

২) বাক্ + ঈশ্বরী = বাগীশ্বরী (বাগেশ্বরী নয়, কারণ পূর্বপদের শেষ বর্ণ ক, চ, ট, ত/ৎ, প, এবং পরপদের প্রথম বর্ণ স্বরধ্বনি হলে ক, চ, ট, ত/ৎ, প নিজস্ব বর্গের তৃতীয় বর্ণে পরিণত হবে এবং পরপদের স্বরবর্ণটি পূর্বপদে যুক্ত হবে।)

এরকম ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে ব্যঞ্জনধ্বনির সন্ধিকেন্দ্রিক কয়েকটি শুদ্ধ বানানের উদাহরণ দেখা যাক। যেমন-

১) সৎ + মার্গ = সন্মার্গ (অঘোষবর্ণ ক্, চ্, ট্, ত/ৎ, প্ এর পরে নাসিক্যধ্বনি থাকলে ক্, চ্, ট্,

২) ষট্ + মাস = ষন্মাস ত/ৎ, প্; ঘোষবর্ণ গ্, জ্, ড্, দ্, ব্- তে অথবা বিকল্পে ন্-এ পরিণত হয়)

৩) সম্ + ন্যাসী = সন্ন্যাসী (স্পর্শবর্ণ পরে থাকলে প্রথম পদের শেষে থাকা ম, পরবর্তী পদের শুরুতে

৪) সম্ + মান = সম্মান যে বর্গের ব্যঞ্জনধ্বনি থাকে সেই বর্গের নাসিক্যধ্বনিতে পরিণত হয়।)

৫) হৃদ্ + কম্প = হৃৎকম্প (বর্গের প্রথম, দ্বিতীয় বর্ণ ও স পরে থাকলে প্রথম পদের শেষে থাকা বর্গের

৬) তদ্ + সম = তৎসম তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণ প্রথম বর্ণে পরিণত হয়।

এরকম বিসর্গ সন্ধির কয়েকটি শুদ্ধ বানানের উদাহরণ দেখা যাক। যেমন—

১) সদ্যঃ + জাত = সদ্যোজাত (পূর্বপদের শেষে যদি অ-কার ও বিসর্গ থাকে এবং পরপদের প্রথম বর্ণ যদি বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ অথবা য, র, ল, ব, হ, হয় তবে উভয়ে মিলে ও-কার হয়। সেকারনেই মনোরম, সরোবর ইত্যাদি।)

২) মনঃ + যোগ = মনোযোগ

৩) পুরঃ + হিত = পুরোহিত

৪) ইতঃ + মধ্যে = ইতোমধ্যে (উপরের নিয়ম মেনেই।)

৫) ইতঃ + পূর্বে = ইতঃপূর্বে (পূর্বপদের শেষে যদি অ-কার ও বিসর্গ থাকে, কিন্তু পরপদের প্রথম বর্ণ যদি বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ অথবা য, র, ল, ব, হ, না হয়ে অন্য বর্ণ হয় তবে বিসর্গ বজায় থাকে।)

৬) ইতঃ + পর = ইতঃপর

৭) অতঃ + পর = অতঃপর

৮) অতঃ + এব = অতএব (আবার পূর্বপদের শেষে যদি অ-কার ও বিসর্গ থাকে, কিন্তু পরপদের প্রথম

৯) শিরঃ+উপরি = শির-উপরি বর্ণ যদি অ ব্যতীত অন্য স্বরধ্বনি হয় তবে বিসর্গ লোপ পায় ও সন্ধি হয় না।)

১০) দুঃ + অবস্থা = দুরবস্থা (অ-আ ভিন্ন স্বরধ্বনির পরস্থিত বিসর্গ-এর পরে যদি স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয়,

১১) নিঃ+আকার = নিরাকার চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ অথবা য, র, ল, ব, হ, থাকে তবে বিসর্গ র্ হয়। র্ পরবর্তী

১২) আশীঃ+বাদ = আশীর্বাদ স্বরে যুক্ত হয় নতুবা রেফ হিসেবে পরবর্তী ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত হয়।)

১৩) নিঃ + রব = নীরব (বিসর্গের পরে র-কার থাকলে বিসর্গ লোপ পায় ও পূর্বস্বর দীর্ঘ হয়।)

১৪) চক্ষুঃ + রোগ = চক্ষুরোগ (উপরের নিয়ম মেনেই।)

১৫) পুরঃ + কার = পুরস্কার (পরপদে ক, খ, প, ফ, থাকলে পূর্বপদের অ-কার ও আ-কারের পরস্থিত

১৬) তিরঃ + কার = তিরস্কার বিসর্গ স্-এ পরিণত হয় এবং অ-কার ও আ-কার ভিন্ন অন্য স্বরধ্বনির পরে

১৭) আবিঃ+কার =আবিষ্কার	থাকা বিসর্গ ষ-এ পরিণত হয়।)
১৮) চতুঃ + কোণ= চতুষ্কোণ	

২.৩.২ সমাসের নিয়মবিধি

১) মৃগীর শিশু- মৃগশিশু	(শিশু, শাবক, দুগ্ধ, ডিম্ব পরপদে থাকলে স্ত্রীলিঙ্গের পরিবর্তে সাধারণ রূপই
২) ছাগীর দুগ্ধ- ছাগদুগ্ধ	সমাসবদ্ধ পদে ব্যবহৃত হয়)
৩) অহঃ ও রাত্রি- অহোরাত্র	(দ্বন্দ্ব সমাসে অহন্ শব্দের পরপদে রাত্রি ও নিশা শব্দ অকারান্ত রাত্র ও নিশ হয়)
৪) অহঃ ও নিশা- অহর্নিশ	
৫) রাত্রির পূর্ব- পূর্বরাত্র	(রাত্রির প্রথমাংশ বোঝাতে বা রাত্রির মধ্যাংশ বোঝাতে সম্বন্ধ তৎপুরুষ সমাস
৬) রাত্রির মধ্য- মধ্যরাত্র	হবে এবং বানান হবে পূর্বরাত্র অথবা মধ্যরাত্র। অথচ কর্মধারয় সমাস হলে
৭) পূর্ব যে রাত্রি- পূর্বরাত্রি	গতরাত্রি বোঝাবে এবং বানান পূর্বরাত্রি হবে।)
৮) নাই দোষ যাহার- নির্দোষ	(বহুব্রীহি সমাসের সমাসবদ্ধ পদটি বিশেষণ পদ। সেকারণে সমাসবদ্ধ পদটির সঙ্গে ইন, বতু, মতু ইত্যাদি বিশেষণবোধক প্রত্যয় যোগ হয় না। বিশেষ্য পদ দোষ-এর সঙ্গে ইন যুক্ত হয়ে দোষী পদটি তৈরি হয়। অনুরূপ-অপরাধী- নিরপরাধী, ধনী- নির্ধন)
৯) মহৎ যে প্রাণ- মহাপ্রাণ	(কর্মধারয় সমাসে মহৎ যদি পরপদের বিশেষণ হয় তবে মহা হয়, অন্যথায়
১০) মহতের প্রাণ- মহৎপ্রাণ	ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসে মহৎই হয়। অনুরূপ- মহৎ যে আশয়- মহাশয়, কর্মধারয়। অথচ মহতের আশয়- মহদাশয়, ষষ্ঠী তৎপুরুষ।)

২.৩.৩ প্রত্যয়ের নিয়মবিধি

১) লক্ষ্য অথবা লক্ষণীয়	(লক্ষ্যণীয় নয়, কারণ ঈয় ও অণীয় প্রত্যয় একত্রে ব্যবহৃত হয় না। অনুরূপ- পূজ্য অথবা পূজনীয়, রম্য অথবা রমণীয়।)
২) দারিদ্র্য অথবা দরিদ্রতা	(দারিদ্র্যতা নয়, কারণ ইয়/ ষ্ণ্য ও তা প্রত্যয় একত্রে ব্যবহৃত হয় না। অনুরূপ-বৈশিষ্ট্য বা

বিশিষ্টতা, বৈচিত্র্য বা বিচিত্রতা, মাধুর্য বা মধুরতা, ঐক্য বা একতা, সামর্থ্য বা সমর্থতা।)

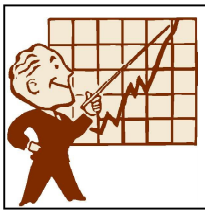
৩) কৃতী, কিন্তু কৃতিত্ব (কৃতী, উপকারী, ঈন প্রত্যয়ান্ত শব্দ। এর সঙ্গে যখন ত্ব ও তা প্রত্যয় যুক্ত হয়ে পদ গঠিত হলে ঈ-কার, ই-কারে পরিবর্তিত হবে। অনুরূপ- দায়ী- দায়িত্ব, স্থায়ী- স্থায়িত্ব, একাকী- একাকীত্ব, সহযোগী- সহযোগিতা, প্রতিযোগী- প্রতিযোগিতা, প্রতিদ্বন্দ্বী- প্রতিদ্বন্দ্বিতা।)

৪) উপকারী, কিন্তু উপকারিতা

২.৩.৪ অর্থকেন্দ্রিক বানানের পার্থক্য

১) অর্ঘ- মূল্য
২) অর্ঘ্য- উপহার
৩) অনু- পশ্চাৎ
৪) অণু- পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ
৫) আভাষ- ভূমিকা
৬) আভাস- ইঙ্গিত
৭) আহুতি- যজ্ঞের অগ্নিতে ঘৃত বা অন্যান্য সামগ্রী দান
৮) আহূতি- আহ্বান
৯) কুল- বংশ
১০) কূল- জলাশয়ের তট
১১) তির- শর
১২) তীর- জলাশয়ের তট
১৩) দিন- দিবস
১৪) দীন- দরিদ্র
১৫) দেশ- অঞ্চল
১৬) দ্বেষ- ঘৃণা
১৭) নাড়ী- শিরা
১৮) নারী- স্ত্রীলোক
১৯) নীড়- পাখির বাসা
২০) নীর- জল
২১) ফাল্গুনি- অর্জুন

২২) ফাল্গুনী- ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা
২৩) বাণ- শর
২৪) বান- বন্যা
২৫) লক্ষ- শত সহস্র
২৬) লক্ষ্য- উদ্দেশ্য
২৭) লক্ষণ- চিহ্ন
২৮) লক্ষ্মণ- রামের ভাই
২৯) শয্যা- বিছানা
৩০) সজ্জা- সাজ
৩১) শরণ- আশ্রয়
৩২) সরণ- গমন
৩৩) শংকর- শিব
৩৪) সংকর- মিশ্রিত
৩৫) শারদা- দুর্গা
৩৬) সারদা- সরস্বতী
৩৭) শুচি- পবিত্র
৩৮) সূচী- তালিকা
৩৯) শূর- বীর
৪০) সুর- দেবতা
৪১) শিকার- পশু হত্যা
৪২) স্বীকার- সম্মতিদান
৪৩) শ্রুতি- শ্রবণ
৪৪) স্রুতি- ক্ষরণ
৪৫) সর্গ- কাব্যের অধ্যায়
৪৬) স্বর্গ- দেবতাদের বাসভূমি
৪৭) সাক্ষর- অক্ষরজ্ঞান থাকা ব্যক্তি
৪৮) স্বাক্ষর- দস্তখত
৪৯) সুত- পুত্র
৫০) সূত- সারথি



অগ্রগতি-নির্ধারক প্রশ্ন

প্রশ্ন নং ১: নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দিন-

ক) বিসর্গ সন্ধিতে বিসর্গের ধ্বনিগত পরিবর্তন, বিসর্গ বজায় থাকা ও বিসর্গ লোপের নিয়মগুলি উদাহরণ সহ বিশ্লেষণ করুন।

.....

খ) তৎসম শব্দের বানানে প্রত্যয়কেন্দ্রিক নিয়মগুলি ব্যাখ্যা করুন।

.....

গ) ১০ জোড়া প্রায় সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দের বানান পার্থক্য আলোচনা করুন।

.....



আসুন, জেনে নিই

বাংলা ভাষায় 'ঙ' বা 'ঞ' দিয়ে শব্দ শুরু হয় না। শব্দের আদিতে 'ড' ও 'ঢ' বসে, কিন্তু, মধ্যে বা শেষে বসলে যথাক্রমে তাড়িতব্যঞ্জন 'ঙ্গ' ও 'ঞ্জ'-এ পরিণত হয়। আবার 'ঙ্গ' ও 'ঞ্জ' শব্দের আদিতে বসে না।

২.৪ ণত্ববিধি-ষত্ববিধি

তৎসম শব্দের বানানের ক্ষেত্রে ণত্ববিধি ও ষত্ববিধির নিয়মগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রধানত যেসব শব্দের বানানে 'ণ' ও 'ষ' হবে সেই সংক্রান্ত নিয়মগুলিই ণত্ববিধি ও ষত্ববিধির মূল আলোচ্য বিষয়। অবশ্য ণত্ববিধি ও ষত্ববিধির নিয়মগুলি কেবলমাত্র তৎসম শব্দের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে, তদ্ভব, অর্ধতৎসম, দেশি ও বিদেশি শব্দের বানানে পৃথক নিয়ম অনুসৃত হয়। এমনকি অ-তৎসম শব্দে মূর্ধণ্য বর্গের সঙ্গে হলেও 'ন'-ই হবে। (অ-তৎসম শব্দের বানানের নিয়মগুলি পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে প্রথমে ণত্ববিধি ও তারপর ষত্ববিধির নিয়মগুলি একে একে জেনে নেওয়া যাক।

২.৪.১. ণত্ববিধি

সংস্কৃতে কতকগুলি শব্দে স্বভাবত 'ণ' থাকে এবং কতকগুলি শব্দে সংস্কৃত উচ্চারণের নিয়ম অনুসারে 'ণ' হয়। মৌলিকভাবে 'ণ' থাকা সংস্কৃত শব্দগুলি সংখ্যায় অল্প। বাংলায় প্রচলিত এরূপ কয়েকটি শব্দ যেমন- অণু, কণা, কঙ্কণ, গুণ, গৌণ, নিপুণ, পণ, পণ্য, পুণ্য, ফণা, ফণী, বণিক, বাণ, বাণিজ্য, বাণী, বীণা, বেণী, বেণু, মণি, লবণ, লাবণ্য, শোণিত, স্থাণু ইত্যাদি।

উচ্চারণের যে সকল নিয়ম অনুসারে 'ণ' হয়েছে সেগুলি নিম্নরূপ-

১) ঋ, র, ষ-এর পরে 'ণ' হয়।

ক) স্বতন্ত্র ঋ-এর পরে 'ণ' হয় যেমন- ঋণ।

খ) ঋ যুক্ত ব্যঞ্জনে 'ণ' হয় যেমন- তৃণ, ঘৃণা।

২) র-এর পরে 'ণ' তিনভাবে হয়।

ক) স্বতন্ত্র র-এর পরে 'ণ' হয় যেমন-কারণ, সাধারণ, আহরণ।

খ) রেফ যুক্ত শব্দে 'ণ' হয় যেমন-পর্ণ, স্বর্ণ, বর্ণনা।

গ) র-ফলা শব্দে 'ণ' হয় যেমন-প্রাণ, প্রণয়, যন্ত্রণা।

৩) য-এর পরে 'ণ' তিনভাবে হয়।

ক) স্বতন্ত্র য-এর পরে 'ণ' হয় যেমন-ভাষণ, দূষণ, অন্বেষণ।

খ) ক + ষ = ক্ষ যুক্ত শব্দে 'ণ' হয় যেমন- ক্ষণ, লক্ষণ।

গ) য-এর সঙ্গে ণ যুক্ত হলে ষ্ণ হয় যেমন- 'বৈষ্ণব, কবোষ্ণ, উষ্ণীষ।

৪) ঋ, র, য-এর পরে স্বরবর্ণ অথবা ক-বর্গ (ক, খ, গ, ঘ, ঙ), প-বর্গ (প। ফ, ব, ভ, ম) এবং য্ ন, ব্, হ্ ধ্বনির ব্যবধান থাকে তবে 'ণ' হয়। যেমন পাষাণ, হরিণ, কৃপণ, শ্রাবণ, ভ্রমণ, গ্রহণ ইত্যাদি।

৫) কয়েকটি বিশেষ শব্দ ও উপসর্গের পরে 'ণ' হয়।

ক) উত্তর, পর, পার, চন্দ্র, নার, রাম ইত্যাদি শব্দের পর অয়ন বা আয়ন শব্দের দন্ত্য 'ন' মূর্ধণ্য 'ণ'-এ পরিণত হয়। যেমন- উত্তরায়ণ, নারায়ণ, চান্দ্রায়ণ, রামায়ণ ইত্যাদি।

খ) অগ্র শব্দ পরবর্তী নী ও হায়ন শব্দের দন্ত্য 'ন' মূর্ধণ্য 'ণ'-এ পরিণত হয়। যেমন-যেমন : অগ্রণী, অগ্রহায়ণ

গ) প্র, পরা, পরি, নির্ এই চার উপসর্গ ও অন্তর্ শব্দের পর নদ্, নম্, নশ্, নী, নুদ্, অন্ হন্ ধাতুর দন্ত্য 'ন' মূর্ধণ্য 'ণ'-এ পরিণত হয়। যেমন- 'প্রণাম, পরিণাম, প্রণষ্ট, প্রণীত, প্রহনণ ইত্যাদি।

ঘ) প্র, পরি উপসর্গের পরে নি উপসর্গ ণি হয়। যেমন নিধান কিন্তু প্রণিধান, নিপাত কিন্তু প্রণিপাত।

ছ) ট-বর্গের ব্যঞ্জনধ্বনি যথাক্রমে ট,ঠ,ড,ঢ,ণ-এর সঙ্গে নাসিক্য ব্যঞ্জন রূপে ণ যুক্ত হবে। যেমন-ঘণ্টা, কণ্টক, কণ্ঠ, লুণ্ঠন, দণ্ড, ভাণ্ড, ক্ষুণ্ণ ইত্যাদি।

২.৪.২ ষত্ববিধি

যে নিয়মের দ্বারা কোন্ কোন্ তৎসম শব্দে মূর্ধণ্য 'ষ' হবে জানা যায় তাকে ষত্ববিধি বলে। 'ণ'-এর মতই সংস্কৃতে কতকগুলি শব্দে স্বভাবত 'ষ' থাকে এবং কতকগুলি শব্দে সংস্কৃত উচ্চারণের নিয়ম অনুসারে 'ষ' হয়। মৌলিকভাবে 'ষ' থাকা বাংলায় প্রচলিত তৎসম শব্দগুলির মধ্যে রয়েছে- আষাঢ়, ঈষৎ, উষা, উষর, উষ্ম, ঔষধ, কোষ, কর্ষণ, গণ্ডুষ, গ্রীষ্ম, ঘর্ষণ, তুষার, পুরুষ, পুষ্প, পাষাণ, প্রদোষ, পৌষ, বিশেষ, বিশেষণ, বিষ, বর্ষণ, ভাষা, ভীষ্ম, ভূষণ, মহিষ, মুষিক, মেষ, শেষ, শ্লেষ, ষোড়শ, হর্ষ ইত্যাদি।

উচ্চারণের যে সকল নিয়ম অনুসারে 'ষ' হয়েছে সেগুলি নিম্নরূপ—

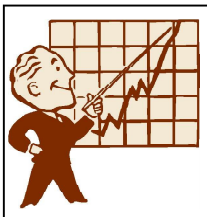
১) ঋ-কারের পরে 'ষ' হয়। যেমন- ঋষি, বৃষ, কৃষক, ঋষভ ইত্যাদি।

২) অ, আ ব্যতীত অন্যান্য স্বরধ্বনি এবং ক্ ও র্ ধ্বনির পরে প্রত্যয়ের দন্ত্য 'স' মূর্ধণ্য 'ষ'-তে পরিণত হয়। যেমন- ভবিষ্যৎ, জিগীষা, মুমূর্ষু, মুমুক্ষু, কল্যাণীয়েষু, (কিন্তু, কল্যানীয়াসু) ইত্যাদি। (সাৎ প্রত্যয়ের দন্ত্য 'স' মূর্ধণ্য ষ'-এ পরিণত হয় না, অগ্নিসাৎ, ধূলিসাৎ)।

৩) ই-কার ও উ-কারের পর কয়েকটি ধাতুর দন্ত্য 'স' মূর্ধণ্য 'ষ'-তে পরিণত হয়। যেমন- অভিষেক, অধিষ্ঠান, প্রতিষ্ঠিত, অনুষঙ্গ, অনুষ্ঠান, নিষিদ্ধ ইত্যাদি।

৪) সমাসে প্রথম পদের শেষে ই, উ, ঋ, ও ধ্বনিগুলি থাকলে পরপদের দন্ত্য 'স' মূর্ধণ্য 'ষ'-তে পরিণত হয়। যেমন- যুধি + স্থির = যুধিষ্ঠির, হরি + সেন = হরিষেণ, গো + স্থ = গোষ্ঠ ইত্যাদি।

৫) মূর্ধণ্য ধ্বনি ট, ঠ-এর সঙ্গে যুক্তব্যঞ্জনে ষ হবে। যেমন- স্পষ্ট, চেষ্টা, নিষ্ঠুর, ভূমিষ্ঠ ইত্যাদি।



অগ্রগতি-নির্ধারক প্রশ্ন

প্রশ্ন নং ২: নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দিন-

ক) বাংলা ভাষায় প্রচলিত মৌলিকভাবে 'ণ' ও 'ষ' থাকা কয়েকটি তৎসম শব্দের উদাহরণ দিন।

.....

খ) ট, ও ঠ, ধ্বনির সঙ্গে 'ণ' ও 'ষ' ধ্বনি যুক্ত চারটি শব্দের উদাহরণ দিন।

.....



আসুন, জেনে নিই

নিত্য ণ-থাকা কিছু তৎসম শব্দ নিয়ে নিচের ছড়াটি মনে রাখার চেষ্টা করুন।

কণা নিক্কণ ফণা চিক্কণ কণিকা গণিকা কাণ
উৎকুণ কণ মণি কঙ্কণ বাণ শাণ কল্যাণ
পিণাক কফোণি লাবণ্য ফণী বণিক নিপুণ পাণি
চাণক্য পণ মাণিক্য গণ বীণা বেণু বেণী বাণী
গুণ তূণ ঘুণ অণু মৎকুণ বাণিজ্য কিণ কোণ

পুণ্য গৌণ লবণ পণ্য ভণিতা শোণিত শোণ
স্থাণু শণ ভাণ আপণ বিপণি এণ—এই পঞ্চাশ
নিত্যসিদ্ধ ণ-কার এদের, বিধির বাহিরে বাস।
নিত্য ষ-থাকা কিছু তৎসম শব্দ নিয়ে নিচের ছড়াটি মনে রাখার চেষ্টা করুন।
ভাষা মাষা ষট্ কাষ্ঠ শষ্প আষাঢ়, কাষায় অথবা বাষ্প
কষিত কষায় অথবা ষণ্ড রে,
ষষ্ঠ যষ্ঠি কিবা অভিলাষ ষোড়শ পাষাণ ভাষ্য আভাষ
চিরকাল ষ মহাপাষণ্ড যে।



২.৫ অধ্যায়টি পাঠ আমরা করে কী শিখলাম

- সন্ধিযুক্ত, সমাসবদ্ধ, প্রত্যয়নিষ্পন্ন ও ভিন্ন অর্থকেন্দ্রিক কিন্তু প্রায় সমোচ্চারিত শব্দের শুদ্ধবানানের বিষয়টি পর্যালোচনা করা হয়েছে।
- ণত্ববিধির নিয়মগুলি বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
- ষত্ববিধির নিয়মগুলি ব্যাখ্যা করা হয়েছে।
- বাংলা ভাষায় প্রচলিত মৌলিকভাবে 'ণ' ও 'ষ' থাকা তৎসম শব্দগুলির বিবরণ দেওয়া হয়েছে।



২.৬ অতিরিক্ত পঠন

চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার (১৯৮৮); ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ, কলকাতা : রূপা অ্যান্ড কোম্পানী

চাকী, জ্যোতিভূষণ (১৯৯৬); বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স

চৌধুরী, কালীপদ (২০২১); বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা প্রসঙ্গ, কলকাতা : বাণী সংসদ পাবিলিশিং হাউস প্রা লি

দত্ত লিটন (২০২২); বাংলা ব্যাকরণের পাঠশালা-নিয়মে- অনিয়মে, কলকাতা : ন্যাশনাল বুক হাউস

সরকার, পবিত্র (১৯৯৪); পকেট বাংলা ব্যাকরণ, কলকাতা : আজকাল পাবলিশার্স লি:

২.৭ অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্নের উত্তর সংকেত

১ নং প্রশ্নের উত্তর :

ক) ২.৩.১ অংশে আলোচিত বিসর্গ সন্ধির ১ থেকে ১৮ নম্বর পর্যন্ত উদাহরণ ও নিয়ম দ্রষ্টব্য।

খ) ২.৩.৩ অংশের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

গ) ২.৩.৪ অংশে প্রদত্ত শব্দজোড়গুলি দ্রষ্টব্য।

২ নং প্রশ্নের উত্তর :

ক) ২.৪.১ অংশের প্রথম অনুচ্ছেদ ও ২.৪.২ অংশের প্রথম অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

খ) ২.৪.১ অংশের ৬ নম্বর সূত্র ও ২.৪.২ অংশের ৫ নম্বর সূত্র দ্রষ্টব্য।

২.৮ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১) শুদ্ধ বাংলা বানানের সন্ধিকেন্দ্রিক সূত্রগুলি ব্যাখ্যা করুন।

২) প্রত্যয় ও সমাস নির্ভর শুদ্ধ বাংলা বানান নির্ণয়ের বিষয়টি আলোচনা করুন।

৩) ণত্ববিধির সূত্রগুলি বিশ্লেষণ করুন।

৪) ষত্ববিধির সূত্রগুলি বিশ্লেষণ করুন।

অধ্যায় ৩ : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির বানানবিধি

বিন্যাস ক্রম

৩.১ জ্ঞাতব্য বিষয়
৩.২ পরিচিতি
৩.৩ আকাদেমি নির্দেশিত বাংলা বানানের সূত্রসমূহের পর্যালোচনা
৩.৪ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম
৩.৫ অতিরিক্ত পঠন
৩.৬ অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্নের উত্তর সংকেত
৩.৭ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৩.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই অধ্যায়টি পড়ে আপনি—

- শুদ্ধ বাংলা বানান লেখার নিয়মগুলি আয়ত্ত করতে পারবেন।
- আকাদেমি নির্দেশিত তৎসম শব্দের বানান সংক্রান্ত নীতিগুলি জানতে পারবেন।
- আকাদেমি নির্দেশিত অতৎসম শব্দের বানান সংক্রান্ত নীতিগুলি জানতে পারবেন।
- বিদেশি শব্দ বাংলা ধ্বনিতে লিপ্যন্তরিত করার নীতিগুলি শিখতে পারবেন।
- মান্য চলিত বাংলায় প্রচলিত বানান সংক্রান্ত বিভিন্ন বিভ্রান্তি ও অসংগতি দূর করতে পারবেন।

৩.২ পরিচিতি

পশ্চিমবঙ্গ তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের উদ্যোগে ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দের ১৪ই মে থেকে ১৯শে মে পর্যন্ত বাংলা বানান সংস্কার, বাংলা লিপি সংস্কার, বাংলা পরিভাষা রচনা, অভিধান-লৌকিক কোষ-উচ্চারণ কোষ প্রণয়ন ইত্যাদি বিষয়নিয়ে একটি আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনাচক্রে উপস্থাপিত প্রস্তাবগুলি বিবেচনা করে বানান সংস্কার উপসিমিতির সদস্যরা কয়েকটি সুপারিশ পেশ করেন এবং সেই সব সুপারিশ সাপেক্ষে অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, নির্মল দাশ ও পবিত্র সরকারের নেতৃত্বে একটি ভিত্তিপত্র প্রস্তুত হয়। ভিত্তিপত্রে বলা হল— "বাংলা বানান সংস্কার করতে গিয়ে দুই ধরনের প্রস্তাব বিভিন্ন সূত্রে উত্থাপিত হয়েছে। এক, সমস্ত বানান বাংলার নিজস্ব উচ্চারণ অনুযায়ী হবে। দুই, তৎসম, অর্ধতৎসম, তদ্ভব, ও বিদেশী অথবা সাধারণভাবে তৎসমও অ-তৎসম শব্দে ভাগ করে বিভিন্ন পর্যায়ের শব্দের জন্য বিভিন্ন বানান রীতি নির্ধারিত হবে। সমস্ত দিক বিচার করে, বিশেষত অর্থ গ্রহণের সুবিধার কথা চিন্তা করে, দ্বিতীয় প্রস্তাবকেই বাংলা বানান সংস্কার সংক্রান্ত এই ভিত্তিপত্রের মূল উপজীব্য হিসাবে

গ্রহণ করা হয়েছে।"[১] এই ভিত্তিপত্র বাংলা বিদ্যাচর্চায় নিযুক্ত বিভিন্ন পণ্ডিত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছে পাঠানো হল এবং তাঁদের থেকে পাওয়া মতামতের উপর ভিত্তি করে ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দের ৫ই নভেম্বর 'বাংলা বানানের সমতাবিধান এবং লিখনরীতি ও লিপির সরলীকরণ' শীর্ষক একটি সুপারিশপত্র প্রকাশিত হয়। পুনরায় সেই সুপারিশপত্র অবলম্বনে আকাদেমি বানান সমিতি বহু আলোচনামর্মে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সেই সিদ্ধান্তগুলিই ১৯৯৭-তে বাংলা বানানবিধি নামক পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হয়। এরপর ১৯৯৭-র জুনে দ্বিতীয় সংস্করণ, ডিসেম্বরে তৃতীয় সংস্করণ এবং ২০০১ খ্রিস্টাব্দে পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই পুস্তিকার তিনটি অংশের প্রথম অংশে লিপি সংক্রান্ত আলোচনা, দ্বিতীয় অংশে বানান সম্পর্কিত আলোচনা ও তৃতীয় অংশে লিখনরীতি সংশ্লিষ্ট আলোচনা করা হয়েছে। বাংলা আকাদেমি নির্দেশিত মূলত বানানবিধির অংশটিই এই অধ্যায়ে আলোচিত হবে।

৩.৩ আকাদেমি নির্দেশিত বাংলা বানানের সূত্রসমূহের পর্যালোচনা

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি নির্দেশিত বাংলা বানানের সূত্রগুলি মূলত তিন ভাগে বিন্যস্ত। প্রথম ভাগে তৎসম শব্দের বানানবিধি, দ্বিতীয় ভাগে অ-তৎসম শব্দের বানানবিধি ও তৃতীয় ভাগে বিদেশি শব্দের বানানবিধি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অতঃপর বানানবিধির সূত্রগুলি একে একে ব্যাখ্যা করা যাক।

ক) তৎসম শব্দের বানানবিধি

১) যে সকল সংস্কৃত শব্দ তৎসম শব্দ রূপে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয়ে আসছে সেই সব তৎসম শব্দে হ্রস্ব 'ই'বা 'ই'-কার, দীর্ঘ ঈ'বা 'ঈ-কার, হ্রস্ব 'উ'বা 'উ'-কার, দীর্ঘ 'ঊ'বা 'ঊ'-কার উভয় রূপই যদি প্রচলিত ও শুদ্ধ রূপে গৃহীত সেই সব শব্দে হ্রস্ব রূপটিই গ্রহণ করা বিধেয়। যেমন অঙ্গুরি, অঙ্গুলি, অবনি, আকুতি, -আবলি, উষসী, উষা, ক্ষৌণি, চিৎকার তুলিকা, ত্রুটি, দ্রোণি, ধমনি, ধরণি, ধূলি, নাড়ি, পঞ্জি, পদবি পল্লি, পুত্তলি, পেশি, বেণি, বেদি, ভেরি, রজনি, শ্রেণি, সরণি, সারণি, সুরভি, সূচি ইত্যাদি।

২) সংস্কৃত ইন্ প্রত্যয়ান্ত শব্দের কর্তৃকারকের একবচনের দীর্ঘ 'ঈ'-কার যুক্ত রূপটিই বাংলায় গৃহীত যেমন কৃতী গুণী, দায়ী, ধনী, মানী, সহযোগী, প্রতিদ্বন্দ্বী ইত্যাদি। সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে 'ত্ব', 'তা', প্রত্যয় যোগ হলে এই সব শব্দের দীর্ঘ 'ঈ', হ্রস্ব 'ই'-তে পরিণত হয়। বাংলায় ব্যবহারের ক্ষেত্রেও কৃতিত্ব, দায়িত্ব, সহযোগিতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ইত্যাদি বানানই হবে। লিঙ্গান্তরের (নী প্রত্যয়) ক্ষেত্রেও এই নিয়ম বজায় থাকবে, যেমন তেজস্বিনী, প্রতিযোগিনী ইত্যাদি।

সংস্কৃত নিয়মে সমাসবদ্ধ হলেও ইন্ প্রত্যয়ান্ত শব্দের দীর্ঘ 'ঈ', হ্রস্ব 'ই'-তে পরিণত

হয়। কিন্তু বাংলায় সমাসের ক্ষেত্রে দীর্ঘ 'ঈ' বজায় থাকবে যেমন প্রাণীবিদ্যা, মন্ত্রীপরিষদ ইত্যাদি।

৩) -তস্ বা-শস্ প্রত্যয়ান্ত সংস্কৃত শব্দের অন্ত বিসর্গ বাংলায় ব্যবহৃত হয় না। সে কারণে এ জাতীয় শব্দের বিসর্গহীন রূপ ব্যবহারের পক্ষেই মত দেওয়া হয়েছে। যেমন অন্তত, ক্রমশ, প্রথমত, প্রায়শ, ফলত, বস্তুত, সর্বত ইত্যাদি।

এই একই সূত্র মেনে দুটি বিসর্গান্ত শব্দের সন্ধি হলে দ্বিতীয় পদের অন্তবিসর্গ বর্জন করা হবে। যেমন ইতঃ + ততঃ = ইতস্তত, অহঃ + অহঃ = অহরহ, পুনঃ + পুনঃ = পুনঃপুন ইত্যাদি। তবে যে সকল শব্দে সংস্কৃত সন্ধির নিয়ম অনুসারে প্রথম পদান্তের বিসর্গ বজায় থাকে, সেগুলি বাংলাতেও রক্ষিত হবে। যেমন অতঃ + পর = অতঃপর, অধঃ + পাত = অধঃপাত, শিরঃ + পীড়া= শিরঃপীড়া ইত্যাদি।

মন, ছন্দ, ইত্যাদি শব্দকে বাংলা শব্দ ধরে নিয়ে সমাস করলে যেমন মনমাঝি, মনমেজাজ বা ছন্দগুরু, ছন্দমুক্তি ইত্যাদি চলতে পারে। চক্ষু শব্দটিকেও বাংলা শব্দ ধরে নিয়ে চক্ষুরোগ বানান বৈধ। দুঃস্থ, নিঃস্পৃহ, নিঃস্তব্ধ ইত্যাদি শব্দের ব্যাকরণ অনুমোদিত বিকল্প বিসর্গহীন রূপ সংস্কৃতে প্রচলিত। সেকারণে বাংলায়ও দুস্থ, নিস্পৃহ, নিস্তব্ধ ইত্যাদি বৈধ।

৪) বাংলায় প্রায় সর্বদাই সংস্কৃত অকারান্ত শব্দ ব্যঞ্জনান্ত উচ্চারণ হয়, সেকারণে আশিস, দিক, ধিক, বণিক, সম্পদ, সম্রাট ইত্যাদি জাতীয় শব্দে হস্ চিহ্ন বাহুল্যবোধে নিরর্থক। তবে সন্ধির নিয়মে হস চিহ্নের ফলে বর্ণ পরিবর্তন হতে পারে যেমন পৃথক্ + অন্ন = পৃথগন্ন। তদ্ধিত মতুপ ও বতুপ প্রত্যয়ের হসন্ত মান ও বান ও কৃৎ শানচ প্রত্যয়ের হস্ চিহ্নহীন মান নিয়ে বিভ্রান্তি থাকলেও সব ক্ষেত্রেই হস্ চিহ্ন বিহীন মান বা বান ব্যবহৃত হবে। যেমন তদ্ধিতের বুদ্ধিমান, শক্তিমান, জ্ঞানবান, ধনবান এবং কৃৎ প্রত্যয়ের বর্তমান, বিদ্যমান ইত্যাদি।

সংস্কৃত ব্যঞ্জনসন্ধি জাত কিছু শব্দে পূর্বপদের হস্ চিহ্ন রক্ষিত হবে। যেমন প্রাগ্‌জ্যোতিষ, বাগ্‌ধারা, ইত্যাদি।

৫) রেফের পর ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব সম্পূর্ণরূপে বর্জন করা হয়েছে। যেমন অর্ক, অর্চনা অর্জন, অর্ধ, কর্ম, পূর্ব ভট্টাচার্য ইত্যাদি। দ্বিত্ব বলতে সম ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব বোঝানো হয়েছে। অর্ঘ্য, মর্ত্য, হার্দ্য ইত্যাদি বানানে 'য'-ফলাকে স্বতন্ত্র ব্যঞ্জন রূপে গণ্য করা হবে।

৬) সংস্কৃত সন্ধির ক্ষেত্রে যেখানে পূর্বপদের শেষ বর্ণ 'ম্' সেখানে সন্ধিযুক্ত শব্দে 'ঙ' ও 'ং' দুইই শুদ্ধ। যেমন অলম্ + কার= অলঙ্কার বা অলংকার, অহম্ + কার = অহঙ্কার বা অহংকার, সম্ + গীত = সঙ্গীত বা সংগীত ইত্যাদি। অবশ্য 'ং' যেখানে সন্ধিজাত নয় সেখানে 'ং'-এর ব্যবহার অশুদ্ধ। যেমন অঙ্ক, অঙ্কুশ, আকাঙ্ক্ষা, আতঙ্ক, কঙ্কাল, ভঙ্গ, রঙ্গ, সঙ্গ ইত্যাদি।

৭) দারিদ্র্য, বৈচিত্র্য জাতীয় কিছু কিছু তৎসম শব্দে 'য'-ফলাহীন বিকল্প বানান দেখা

যায় যদিও, কিন্তু, মনিয়র উইলিয়মস কোনো কোনো 'য'-ফলাহীন বানানকে ভুল বলে নির্দেশ করেছেন। সেকারণে 'য'-ফলাহীন বিকল্প বানানের বদলে 'য'-ফলাযুক্ত বানানই গৃহীত হবে। যেমন চারিত্র্য, দারিদ্র্য, বৈচিত্র্য, বৈদগ্ধ্য, সৌহার্দ্য ইত্যাদি।

৮) কোনো কোনো তৎসম শব্দের বানানে 'শ-ষ' বা 'শ-স' দুটিই বৈধরূপে দেখা যায়। যেমন কোশ-কোষ, উশীর-উষীর, কিশলয়-কিসলয়, শায়ক-সায়ক ইত্যাদি। এক্ষেত্রে 'শ' সবক্ষেত্রেই গ্রহণীয়।

খ) অ-তৎসম শব্দের বানানবিধি

১) তদ্ভব, অর্ধতৎসম বা ভগ্নতৎসম, দেশি, বিদেশি, মিশ্র সহ সমস্ত অ-তৎসম শব্দে হ্রস্ব' ই' বা 'ই'-কার এবং হ্রস্ব 'উ' বা 'উ'-কার ব্যবহৃত হবে। যেমন বাড়ি, গাড়ি, কুমির, চাঁদনি, দিঘি, দিয়াশলাই, পশমি, পাখি, কাহিনি, পিরিতি, বাঁশি, সুপারি, হাতি, সেঁউতি, হিরে ইত্যাদি।

অ-তৎসম শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে 'নি' ব্যবহৃত হবে। যেমন গয়লানি, চাকরানি ইত্যাদি।

'ই'-কারান্ত প্রত্যয় ব্যবহৃত হবে— ভাষা (আরবি, ইংরাজি, হিন্দি, মৈথিলি); জীবিকা (ডাক্তারি, ব্যারিস্টারি, ওকালতি, জমিদারি, ডাকাতি, ফকিরি); জাতি, গোষ্ঠী, সম্প্রদায় (বাঙালি, বিহারি, পাঞ্জাবি, গুজরাতি, মারাঠি, জাপানি, ইরাকি, কাবুলি) ইত্যাদি বোঝাতে।

'ই' প্রত্যয়ান্ত অ-তৎসম, মিশ্র বা বিদেশি বিশেষণ শব্দে হ্রস্ব-'ই' কার হবে যেমন মরশুমি, সরকারি, তুঘলকি, খানদানি, জরুরি, দরকারি। আবার সাধারণ বিশেষ্য শব্দেও হ্রস্ব-ই কার হবে যেমন কেরামতি, কোরবানি, চালাকি, চালিয়াতি, জালিয়াতি, টিটকিরি, ডুগডুগি, পড়শি ইত্যাদি।

২) সর্বনাম, বিশেষণ, ক্রিয়া-বিশেষণ, ও যোজক হিসেবে ব্যবহার হলে 'কী' শব্দটি দীর্ঘ' ঈ'-কার দিয়ে লিখতে হবে। যেমন তুমি কী দেখেছ, কী আনন্দ, উফ কী খেলল, কী আর বলব ইত্যাদি।

বর্ণনামূলক উত্তরের জিজ্ঞাসাসূচক প্রশ্নে 'কী' হবে। যেমন তুমি কী খেয়েছ? (অর্থাৎ তুমি কী কী খেয়েছ?), 'ওরে কী শুনেছিস ঘুমের ঘোরে?' (অর্থাৎ ঘুমের ঘোরে কী কী শুনেছিস?) ইত্যাদি। কীভাবে, কীরকম, ইত্যাদি শব্দেও 'কী' হবে।

হ্যাঁ, না বাচক উত্তরের প্রশ্নসূচক বাক্যে 'কি' ব্যবহৃত হবে। যেমন তুমি কি যাবে? সে কি এসেছিল? ইত্যাদি।

৩) অ-তৎসম শব্দে সর্বদা হ্রস্ব 'উ'-কার ব্যবহৃত হবে। যেমন ধুলো, পুজো, চুন, সুতো, চুল, জুয়া, পুব, উনিশ ইত্যাদি। পূজারি বা ধূর্তামি জাতীয় দীর্ঘ 'ঊ'-কার যুক্ত তৎসম শব্দে বাংলা প্রত্যয় সন্নিবিষ্ট হলে মূল শব্দটির দীর্ঘ 'ঊ'-কার বজায় রাখার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু যদি শব্দটি অর্ধতৎসম রূপ গ্রহণ করে তবে হ্রস্ব 'উ'-কার হবে যেমন পুজুরি বা ধুর্তুমি।

৪) 'ও'-কারান্ত উচ্চারণযুক্ত বিশেষণ শব্দ কালো, ভালো, খাটো, ছোটো, বড়ো, ভালোবাসা; সংখ্যাশব্দ এগারো, বারো, তেরো, চোদ্দো, পনেরো, ষোলো ইত্যাদি শব্দ 'ও'-

কার দিয়ে লিখতে হবে। এত, কত, তত, যত শব্দে 'ও'-কার জরুরি নয়, কিন্তু সাদৃশ্য বোঝাতে মতো-তে 'ও'-কার হবে।

প্রশ্নবোধক সর্বনাম— কোন্, অনিশ্চয়সূচক সর্বনাম- কোনো এবং অনেকগুলির মধ্যে কয়েকটি বোঝাতে— কোনো কোনো ব্যবহৃত হবে। উপরন্তু বোঝাতে 'ও'-কার শব্দের সঙ্গে যোগ না করে লিখতে হবে। যেমন আজও, আরও, এখনও, তোমারও ইত্যাদি।

বর্তমান অনুজ্ঞায় ক্রিয়ায় 'ও'-কার ব্যবহৃত হয়। যেমন ভাবো, শোনো, পড়ো, বলো ইত্যাদি। আবার ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞাতেও ক্রিয়ায় 'ও'-কার ব্যবহৃত হয়। যেমন কোরো, ভেবো, শুনো, পোড়ো, বোলো ইত্যাদি। 'অ' সাধিত ধাতু থেকে উৎপন্ন ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য পদে 'নো' ব্যবহার করতে হবে। যেমন করানো, খাওয়ানো, চালানো, শোনানো, পাঠানো ইত্যাদি।

৫) অ-তৎসম শব্দে সাধারণভাবে 'ঐ' বা 'ঐ'-কার এবং 'ঔ' বা 'ঔ'-কার-এর পরিবর্তে অই এবং অউ ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন দই, বই, কই, বউ, মউ ইত্যাদি। তবে কৈফিয়ত, বৈঠক, তৈরি, চৌবাচ্চা, মৌমাছি, মৌরি, মৌলবি ইত্যাদি প্রচলিত ধরনেই লেখা হবে।

৬) উচ্চারণে সাধারণভাবে 'ঙ'-এর সঙ্গে 'গ' না থাকলে আঙুর, আঙুল, ভাঙা, রাঙা, লাঙল ইত্যাদি বানান হবে। তবে উচ্চারণে সাধারণভাবে 'ঙ'-এর সঙ্গে 'গ' থাকলে 'ঙ্গ' হবে। যেমন দাঙ্গা, হাঙ্গামা, লুঙ্গি, জঙ্গি ইত্যাদি।

৭) মূল শব্দটিকে স্মরণ করে কয়েকটি অর্ধতৎসম ও তদ্ভব শব্দে 'য' ব্যবহার করা হবে। যেমন যে, যেমন, যখন, যত, যন্তর, যাওয়া ইত্যাদি। অবশ্য প্রচলিত কিছু শব্দে 'জ' হবে। যেমন জাদু, জোগাড়, জোগান, জোড়া, জাঁতা, জোয়াল, জুঁই, জুতসই ইত্যাদি।

৮) অ-তৎসম শব্দের ক্ষেত্রে ণত্ববিধি প্রযোজ্য নয়। অ-তৎসম শব্দে ন ব্যবহৃত হবে যেমন সোনা, কান, পান, চুন, রানি, মানিক, চিরুনি ইত্যাদি। অ-তৎসম শব্দে মূর্ধণ্য বর্গের ধ্বনির সঙ্গেও 'ন'-এর সংযোগ গ্রাহ্য হবে। যেমন ঝান্ডা, ঠান্ডা, গন্ডার, লন্ঠন, লন্ডভন্ড ইত্যাদি।

৯) বাংলা ভাষার উচ্চারণ প্রবণতায় 'য'-ফলা ব্যঞ্জনদ্বিত্বের মতো উচ্চারিত হলেও 'য'-ফলা বজায় রাখা হয়েছে। যেমন জন্নে, পদ্দ, কাব্বি, দিব্বি, নস্‌সি ইত্যাদির পরিবর্তে জন্যে, পদ্য, কাব্যি, দিব্যি, নস্যি ইত্যাদি লেখা হবে।

১০) 'শ', 'ষ', 'স' বিশেষ নির্দেশ না থাকলে স্থানানুযায়ী তিনটিই ব্যবহৃত হবে। যেমন পিসি, মাসি, শাশুড়ি, মোষ, ষোলো ইত্যাদি।

১১) তদ্ভব শব্দ ক্ষিদে, ক্ষেত, ক্ষ্যাপা, ইত্যাদিতে খিদে, খেত, খ্যাপা অর্থাৎ 'ক্ষ'-এর বদলে 'খ' লেখাই সংগত।

গ) বিদেশি শব্দের বানানবিধি

১) বিদেশি শব্দে হ্রস্বস্বর ব্যবহৃত হবে। যেমন কমিটি, ডিগ্রি, ব্রিজ, সেক্রেটারি, ফ্রি, ক্রিম, স্ট্রিট ইত্যাদি।

২) বিদেশি শব্দে সর্বত্র 'ন' ব্যবহৃত হবে। যেমন কার্বন, ক্রেন, ট্রেন, ফার্ন, হর্ন, কার্নিশ ইত্যাদি।

৩) আরবি, ফারসি, তুর্কি শব্দে 'স' ব্যবহৃত হবে যেমন সাদা, সাবান, মুসলমান, ইসলাম, সাহেব, সুলতান ইত্যাদি।

অভ্যাসজনিত কারণে কিছু শব্দে 'শ' ব্যবহার কাম্য। যেমন পোশাক, বকশিশ বাদশাহি, বালিশ, মজলিশ, শিশমহল, হুঁশিয়ার ইত্যাদি।

কিছু ইংরেজি শব্দেও 'শ' ব্যবহৃত হবে। যেমন নোটিশ, পালিশ, মেশিন, পুলিশ, অ্যাশট্রে ইত্যাদি।

ইংরেজি 'S'-এর উচ্চারণ বজায় থাকলে বাংলা শব্দটি 'স' দিয়েই লেখা সংগত। যেমন নার্স, প্র্যাকটিস, পার্স, সুটকেস, মেস ইত্যাদি।

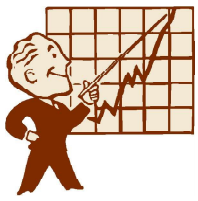
ইংরেজি 'St' বাংলা বানানে 'স্ট' রূপে লেখা হবে। যেমন খ্রিস্টান, পোস্টার, মাস্টার, স্টেশন, স্টোর ইত্যাদি।

৪) বিদেশি শব্দে 'ঋ' ধ্বনি ব্যবহার না করে 'র'-ফলা 'ই'-কার ব্যবহাৰ করা যথাযথ। যেমন ব্রিটিশ, খ্রিস্টাব্দ, ব্রিটেন, ক্রিকেট ইত্যাদি।

৫) বিদেশি শব্দে ব্যঞ্জনান্ত 'র' রেফ হিসেবে পরবর্তী ব্যঞ্জনের মাথায় বসাই বিধেয়। যেমন উর্দি, কার্তুজ, গির্জা, মার্কেট, সর্দার ইত্যাদি। তবে সমাসবদ্ধ, উপসর্গযুক্ত বা প্রত্যয়নিষ্পন্ন শব্দে 'র' বজায় রাখা হয়েছে। যেমন দরদাম, শোরগোল, কারসাজি, কারচুপি, হরতাল, গরমিল ইত্যাদি।

অতিরিক্ত

ব্যক্তিনাম ও পদবি আধুনিক বানানবিধি অনুযায়ী লেখা কাম্য, তবে ব্যক্তি নিজস্ব মতে লিখলে তা গ্রহণযোগ্য। বাঙালিদের পদবির ইংরেজি ধরনের বানানে 'ই'-কার ব্যবহৃত হবে যেমন চ্যাটার্জি, ব্যানার্জি, গাঙ্গুলি ইত্যাদি। বিদেশি নামের বাংলা বানানে 'ই' ব্যবহার করা কাম্য। প্রাচীন বা পরিচিত গ্রন্থনামের পুরোনো বানান মান্য ও অপরিবর্তনীয়। 'পথের পাঁচালী'-র বানান বদলে 'পথের পাঁচালি' লেখা অনুচিত। স্থাননামে নৈহাটী > নৈহাটি, দীঘা > দিঘা ইত্যাদি যে পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে সেগুলি ক্রমশ গ্রাহ্য।



অগ্রগতি-নির্ধারক প্রশ্ন

প্রশ্ন নং ১: নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দিন-

ক) বাংলায় প্রচলিত তৎসম ইন্ প্রত্যয়ান্ত শব্দের বানান বিধি ব্যাখ্যা করুন। (৮০ শব্দের মধ্যে)

.....

খ) তৎসম শব্দের রেফযুক্ত শব্দের বানানবিধি আলোচনা করুন। (৫০ শব্দের মধ্যে)

.....

গ) অ-তৎসম শব্দের বানানে 'ন'-এর ব্যবহারবিধি বিশ্লেষণ করুন। (১০০ শব্দের মধ্যে)

.....



আসুন, জেনে নিই

বানান ভুলের প্রধান কারণগুলির মধ্যে রয়েছে শব্দের ব্যুৎপত্তিগত বিবর্তন না জানা, শব্দের যথাযথ উচ্চারণ করার অক্ষমতা এবং প্রচলিত বানানবিধি সম্পর্কে অজ্ঞতা। শব্দের বানান শুদ্ধভাবে লিখতে হলে শব্দের বংশপরিচয় জানা, সঠিক উচ্চারণ আয়ত্ত করা, ব্যাকরণ ও প্রচলিত বানানবিধির জ্ঞান আহরণ করা এবং অভিধান দেখার অভ্যাস করা আবশ্যক।

তথ্যসূত্র :

১) মিতালী ভট্টাচার্য (২০০৭); বাংলা বানান চিন্তার বিবর্তন, পারুল প্রকাশনী, আগরতলা, পৃ-২৯১



৩.৪ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

- এই অধ্যায়ে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির বানানবিধি সূত্রাকারে পর্যালোচনা করা হয়েছে।
- তিন ভাগে বিভক্ত এই বানানের নিয়মগুলিতে তৎসম শব্দের বানানরীতি আলোচিত হয়েছে।
- অ-তৎসম শব্দের বানান ব্যবহারের রীতিনীতি বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
- বিদেশি শব্দের বাংলা বানানগত প্রয়োগ পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা হয়েছে।



৩.৫ অতিরিক্ত পঠন

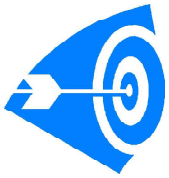
প্রসঙ্গ বাংলা ভাষা (১৯৯৩); সম্পাদিত সংকলন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি

চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ (সম্পা) (১৯৯২); বাংলা কী লিখবেন কেন লিখবেন : কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স

চাকী, জ্যোতিভূষণ (২০০২); শুদ্ধ লিখুন ভালো লিখুন, কলকাতা মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:

সরকার, পবিত্র ও অন্যান্য (২০০১); আকাদেমি বানান অভিধান, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি

সেন অরুণ (১৯৯৩); বানানের অভিধান, কলকাতা, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস প্রা: লি:



৩.৬ অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্নের উত্তর সংকেত

১ নং প্রশ্নের উত্তর :

ক) ক অংশের ২ নম্বর নিয়ম দ্রষ্টব্য।

খ) ক অংশের ৫ নম্বর নিয়ম দ্রষ্টব্য।

গ) খ অংশের ৮ নম্বর নিয়ম দ্রষ্টব্য।



৩.৭ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১) তৎসম শব্দের বানানের পাঁচটি মূলনীতি আলোচনা করুন।

২) অ-তৎসম শব্দে ‘ই’-কার, ‘উ;-কার, ‘ঐ’-কার এবং ‘ঐ’-কার সংক্রান্ত বানানেৰ নিয়মগুলি ব্যাখ্যা করুন।

৩) বাংলায় ব্যবহৃত বিদেশি শব্দের বানানবিধির পরিচয় দিন।

৪) তৎসম শব্দের বিসর্গ সংক্রান্ত বানানবিধি আলোচনা করুন।

৫) বাংলা অ-তৎসম শব্দে ‘ও’-কারের ব্যবহারবিধি বিশ্লেষণ করুন।

অধ্যায় ৪ : বাংলা ছন্দ পরিচয়

অধ্যায় বিন্যাস

৪.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

৪.২ পরিচিতি

৪.৩ ছন্দ: সংজ্ঞা

৪.৪ ছন্দ নির্নয়ের নানা অনুষঙ্গ

- ৪.৪.১ চরণ ও স্তবক
- ৪.৪.২ ছেদ ও যতি
- ৪.৪.৩ পর্ব ও পর্বাঙ্গ
- ৪.৪.৪ অক্ষর ও মাত্রা
- ৪.৪.৫ লয়

৪.৫ বাংলা ছন্দের ত্রিধারা

- ৪.৫.১ স্বরবৃত্ত ছন্দ
- ৪.৫.২ অক্ষরবৃত্ত ছন্দ
- ৪.৫.৩ মাত্রাবৃত্ত ছন্দ
- ৪.৫.৪ প্রত্ন মাত্রাবৃত্ত ছন্দ

৪.৬ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

৪.৭ অতিরিক্ত পঠন

৪.৮ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত

৪.৯ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৪.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই অধ্যায়টি অধ্যয়ন করে আপনি

- ছন্দ বলতে কী বোঝায় তা জানতে পারবেন।
- বাংলা ছন্দের নানা অনুষঙ্গ সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- বাংলা ছন্দের ত্রিধারা বলতে কী বোঝায় তা জানতে পারবেন।
- স্বরবৃত্ত, অক্ষরবৃত্ত এবং মাত্রাবৃত্ত ছন্দের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবহিত হবেন।

৪.২ পরিচিতি

বাক্যকে শ্রুতিমধুর করার জন্য ছন্দের ব্যবহার হয়। সেজন্য কীভাবে পদবিন্যাস

করতে হবে সেটাই এই অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। ছন্দ নির্ণয় করতে গেলে বাংলা ছন্দের নানা অনুষঙ্গ সম্পর্কে জানতে হয়। এই অধ্যায়ে সেই অনুষঙ্গগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। এবং বাংলা ছন্দের ত্রিধারা—

স্বরবৃত্ত, অক্ষরবৃত্ত এবং মাত্রাবৃত্ত ছন্দ বলতে কী বোঝায় এবং প্রত্যেক ছন্দের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পরিচিত হবেন।

৪.৩ ছন্দ: সংজ্ঞা

ছন্দ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে শুরুতেই জানা দরকার ছন্দ কাকে বলে। কবি সাহিত্যিকদের রচনায় ছন্দের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। শুধু পদ্য বা কাব্যে নয়, গদ্যেও ছন্দ থাকে। ছান্দসিক অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা ছন্দের মূলসূত্র' গ্রন্থে ছন্দের সংজ্ঞায় বলেছেন— "যেভাবে পদবিন্যাস করিলে বাক্য শ্রুতিমধুর হয় এবং মনে রসের সঞ্চার হয়, তাহাকে ছন্দ বলে।" অনেকের মতে এই পদবিন্যাস আসলে ধ্বনি বিন্যাস। আসলে যে ললিত বা সুমিত পদ স্থাপনায় বাক্যে রস সঞ্চার হয়, এবং তা সৌন্দর্য সম্পন্ন শ্রুতিমধুর হয় তাই ছন্দ। ব্যাপক অর্থে বলা যায় নৃত্য, গীত বা অন্যান্য সুকুমার কলায় যে বিশেষ রীতিতে উপকরণের সমাবেশ করা হয় এবং যার ফলে অর্থ নিরপেক্ষ শ্রুতিমধুর ধ্বনিতরঙ্গ সৃষ্টি হয় ও রসের সঞ্চার ঘটে তা-ই ছন্দ।



আসুন জেনে নেই

প্রবোধ চন্দ্র সেন — "সুনিয়ন্ত্রিত ও সুপরিমিত বাক্যবিন্যাসের নাম ছন্দ।"

হীরেন চট্টোপাধ্যায়— "সুনিয়ন্ত্রিত ধ্বনিবিন্যাসের দ্বারা সৃষ্ট নিয়মিত সময় অন্তর স্পন্দনযুক্ত, অর্থনিরপেক্ষ ও গতি-সৌন্দর্যসম্পন্ন শ্রুতিমধুর ভাষাভঙ্গিকে বলে ছন্দ।"

৪.৪ ছন্দ নির্ণয়ের নানা অনুষঙ্গ

ছন্দ নির্ণয়ের জন্য কিছু অনুষঙ্গের প্রয়োজন। এই অনুষঙ্গগুলি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকলে ছন্দ নির্ণয় সম্ভব নয়। যে অনুষঙ্গগুলি ছন্দ নির্ণয়ে সহায়ক তা নিম্নে দেওয়া হল—

১। চরণ ও স্তবক
২। ছেদ ও যতি
৩। পর্ব ও পর্বাঙ্গ
৪। অক্ষর ও মাত্রা
৫। লয়

উপরুক্ত অনুষঙ্গগুলি সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকলে ছন্দ নির্ণয় সম্ভব নয়। ছেদ ও যতি চিহ্নের সঠিক ব্যবহার করে, পঙ্‌ক্তিকে পর্বে বিভাজন করে, স্বরান্ত ও হলন্ত অক্ষর নির্ণয় করে সঠিক মাত্রা প্রয়োগ করতে পারলেই ছন্দ বিচার সম্ভব হয়।

৪.৪.১ চরণ ও স্তবক

পদ্যের এক একটি পঙ্‌ক্তিকে বলা হয় 'চরণ'। আরম্ভের পর বা কোনো পূর্ণযতির পর থেকে পরবর্তী পূর্ণ যতি পর্যন্ত ধ্বনিপ্রবাহকে বলা হয় 'চরণ'। যেমন—

"হৃদয় আজি মোর | কেমনে গেল খুলি।
জগৎ আসি সেথা | করিছে কোলাকুলি।"

উপর্যুক্ত কবিতাংশে দুটি পঙ্‌ক্তি বা চরণ রয়েছে। মনে রাখতে হবে একটি মাত্র পর্বে চরণ হয় না, তবে চরণে একটি থাকতে পারে। সাধারণত একটি পঙ্‌ক্তিতেই একটি চরণ থাকে তবে তার ব্যতিক্রমও রয়েছে। যেমন—

"চিরসুখী জন
ভ্রমে কি কখন
ব্যথিত বেদন
বুঝিতে পারে।"

এখানে চারটি পঙ্‌ক্তিতে একটি চরণ গঠিত হয়েছে।

স্তবক

সুশৃঙ্খল রীতিতে পরস্পর সংশ্লিষ্ট চরণ পর্যায়ের নাম স্তবক। বাংলায় পরস্পর সমান দুই চরণের মিত্রাক্ষর স্তবকের ব্যবহারই বেশি পাওয়া যায়। বর্তমানে ৩, ৪, ৫, ৬, ৮ চরণের স্তবক অনেক সময় দেখা যায়। সাধারণত যে সকল স্তবকের সাহায্যে একটি কবিতা রচিত হয়, সেই স্তবকগুলো সমান আকৃতির হয়ে থাকে; তবে এর ব্যতিক্রমও রয়েছে। সাধারণত চরণের সংখ্যা দিয়ে স্তববের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন—

ত্রিপদীবন্ধ, চতুষ্পদীবন্ধ/চতুষ্ক, পঞ্চক, ষটক প্রভৃতি।
উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বোঝানো যেতে পারে-

১। "হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি, ক
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি। ক
প্রভাত হল যেই কী জানি হল এ কী, খ
আকাশ পানে চাই কী জানি কারে দেখি। খ

এটিকে চতুষ্পদী স্তবক বলা যেতে পারে। স্তবকে অন্ত্যানুপ্রাস বা মিল দেখাতে

প্রতি চরণের পাশে ক, খ চিহ্ন ব্যবহার করা হয়।

২। "তুমি মোরে পার না বুঝিতে ? ক
প্রশান্ত বিষাদ ভবে দুটি আঁখি প্রশ্ন করে খ
অর্থ মোর চাহিছে খুঁজিতে, ক
চন্দ্রমা যেমন ভাবে স্থির নতমুখে গ
চেয়ে দেখ সমুদ্রের বুকে ।। গ

এখানে ১ম ও ৩য় মিল, ৪র্থ ও ৫ম মিল, দ্বিতীয় চরণে পর্বান্তিক মিল রয়েছে।



আসুন জেনে নেই

পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য বলেছেন—"কয়েকটি চরণ সুশৃঙ্খলভাবে সন্নিবিষ্ট হয়ে যখন একটি ভাব প্রবাহের পূতি সাধন করে, তখন তাকে 'স্তবক' বলা হয়।"



আসুন জেনে নেই

প্রবোধচন্দ্র সেন তাঁর ছন্দশাস্ত্রে 'চরণ' শব্দ ব্যবহার করেননি, তিনি 'পঙ্‌ক্তি' শব্দ ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেছেন-"আবৃত্তির আরম্ভ থেকে পূর্ণযতি পর্যন্ত পদ্যরচনার ধ্বনিপ্রবাহকে ছন্দ পরিভাষায় পঙ্‌ক্তি (verse) বলে।" তিনি ব্যাখ্যা করে বলেছেন, "লিখিত বা মুদ্রিত লিপির সারিকে বলি ছত্র। আর, পদ্য রচনায় পূর্ণযতির দ্বারা নির্দিষ্ট ধ্বনিপ্রবাহকে বলি পঙ্‌ক্তি। পদ্যের এক-একটি পঙ্‌ক্তিকে ভেঙে একাধিক ছত্রে সাজিয়ে লেখা যেতে পারে।"

৪.৪.২ ছেদ ও যতি

বাক্যের আংশিক বা সামগ্রিক অর্থ প্রকাশের জন্য ধ্বনিপ্রবাহের মধ্যে উচ্চারণ বিরাম বা বিরতি প্রযোজন তাকে বলে ছেদ বা ভাবযতি বা Sense pause, আবার ছন্দতরঙ্গ সৃষ্টির জন্য পদ্যে বা কবিতায় সুনির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে যে বিশ্রাম বা বিরতির প্রয়োজন ঘটে তাকে বলে শ্বাসযতি, ছন্দোযতি বা metrical Pause. ছন্দ আলোচনায় যতি বলতে ছন্দ যতিকেই বোঝায়। প্রবহমান ছন্দ ছাড়া সাধারণত বাক্যের শেষে পূর্ণযতি বা পূর্ণ বিশ্রাম যে ঘটে। বাক্যে যখন ছেদ পড়ে, তখন শ্বাসক্রিয়া একেবারে বন্ধ থাকে, কিন্তু যতিতে শ্বাসক্রিয়া চলতে থাকে, এমনকি ধ্বনি-প্রবাহও অবিচ্ছিন্ন থাকে। এর মধ্যেই জিহ্বা বিশ্রাম লাভ করে। এই সব বিরতিকেই দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলন ইত্যাদি দিয়ে বোঝানো হয়ে থাকে। ছেদ সবসময় অর্থনিয়ন্ত্রিত অর্থাৎ ছেদ এমন এক উচ্চারণ

বিরতি যা অর্থ প্রকাশ করবেই। অর্থ প্রকাশিত না হলে ছেদ হয় না। আমরা উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি পরিষ্কার বুঝিয়ে দিতে পারি যেমন- ওদিকে নোংরা-আবর্জনা ফেলবেন না, ফেললে শাস্তি হবে। এই বাক্যে "ফেলবেন না" পরে 'কর্মা' চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে। যদি 'কমা' চিহ্নটি 'ফেলবেন' শব্দের পরে বসত তাহলে অর্থ পালটে যেত। এই ছেদ অল্পকালের হলে তাকে বলে অর্ধছেদ এবং অপেক্ষাকৃত বেশি হলে তাকে বলে পূর্ণছেদ। 'ফেলবেন না'র পর যে 'কমা' তা আসলে অর্ধছেদ এবং 'শাস্তি হবে'র পর যে দাঁড়ি তা-ই পূর্ণচ্ছেদ।

শ্বাসযতি বা ছন্দোযতি অর্থনিরপেক্ষ ও নিয়মিত। ছন্দের দোলা সৃষ্টিতেই এর মূল্য। অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ের মতে, গদ্য মাধ্যমের বিরতিই ছেদ এবং পদ্য মাধ্যমের বিরতি যতি। তবে কবিতার ক্ষেত্রেও ছেদ বলা যেতে পারে। কবিতায় অর্থ অনুযায়ী যে অনিয়মিত বিরতি তা-ই ছেদ এবং কবিতায় অর্থনিরপেক্ষ যে বিরতি তা যতি। এই যতি স্বল্পকালের জন্য হলে অর্ধযতি এবং অপেক্ষাকৃত বেশি সময়ের হলে পূর্ণযতি। '*' চিহ্ন এবং '|' চিহ্ন দিয়ে বিষয়টি বোঝানো যেতে পারে—

সজল ঢল | আয়ত আখি * ।।
পিয়াল ফুল— | পরা মাখি * ।।

উপর্যুক্ত চরণ দুটিতে '*' চিহ্ন দিয়ে ছেদ বোঝানো হয়েছে এবং '|' চিহ্ন দিয়ে যতি বোঝানো হয়েছে।



আসুন জেনে নিই

লক্ষ করুন যে কবিতার চরণ বা পংক্তি শেষ হচ্ছে বা তার অর্থ শেষ হচ্ছে বলেই যে পূর্ণযতি পড়ছে বা পড়বে তা নয়, কারণ যতির সঙ্গে অর্থের কোনো সম্পর্ক নেই। ছন্দ অনুযায়ী থামাই আসলে যতি, ছন্দ অনুযায়ী বেশি থামাই পূর্ণযতি।

৪.৪.৩ পর্ব ও পর্বাঙ্গ

এক যতি থেকে পরবর্তী যতি পর্যন্ত চরণাংশকে বলা হয় পর্ব। যেমন—
বাঁশ বাগানের | মাথার উপর | চাঁদ উঠেছে | ওই

উপর্যুক্ত চরণটিতে তিনটি পূর্ণপর্ব এবং একটি অপূর্ণ পর্ব রয়েছে। "বাঁশ বাগানের" বাক্যাংশটি একটি পূর্ণ পর্ব এবং 'ওই' শব্দটি একটি অপূর্ণ পর্ব। প্রথম ৩টি পর্ব সম্পূর্ণ উচ্চারিত হওয়ার মতো শব্দ পেয়েছে কিন্তু শেষেরটি তা তাই সেটাকে অপূর্ণ পর্ব বলা হচ্ছে। ছন্দের মূল ভিত্তি যে ঐক্য তার পরিচয় পাওয়া যায় পর্বের ব্যবহারে। নিয়মিত দৈর্ঘ্যের পর্বের ব্যবহারেই উপর্যুক্ত চরণটির ছন্দ সৃষ্টি হয়েছে।

শেষের পর্বটি ছাড়া বাকি পর্বগুলি আসলে পরস্পর সমান। সমান বলেই ছন্দের ঐক্য বজায় থাকে।

এক একটি পর্বের গঠনে কিছু ক্ষুদ্র অঙ্গ উপাদান হিসেবে থাকে। এগুলিকে বলা হয় পর্বাঙ্গ। যেমন—

রাখাল গরুর পাল | নিয়ে যায় মাঠে

উপর্যুক্ত চরণে 'রাখাল গরুর পাল' পর্বে তিনটি অঙ্গ 'রাখাল', 'গরুর' এবং 'পাল'। ঠিক তেমনি 'নিয়ে যায় মাঠে' পর্বেরও তিনটি অঙ্গ 'নিয়ে', 'যায়' এবং 'মাঠে'। এই অঙ্গগুলিই এক একটি পর্বাঙ্গ। প্রত্যেক পর্বে সাধারণত দুটো বা তিনটি পর্বাঙ্গ থাকে। পর্ব যদি ফুল হয়, পর্বাঙ্গ সেই ফুলের এক একটি পাপড়ি। তবে সব পর্বাঙ্গ পরস্পর সমান নাও হতে পারে। 'রাখাল গরুর পাল' পর্বের মাত্রা স্যংখ্যা ৩ + ৩ + ২ আবার 'নিয়ে যায় মাঠে' পর্বের মাত্রা সংখ্যা ২ + ২ + ২।

৪.৪.৪ অক্ষর ও মাত্রা

বাংলা ছন্দ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল অক্ষর ও মাত্রা। কবিতার পঙক্তিতে যে পর্বগুলি থাকে তাতে অনেক শব্দ বা শব্দাংশ থাকে অর্থাৎ একটি পর্বে অনেক ধ্বনি থাকে। এই ধ্বনি কয়েকটি অক্ষর বা Syllable-এর সমষ্টি। বাগযন্ত্রের স্বল্পতম প্রয়াসে উৎপন্ন ধ্বনিই 'অক্ষর'। যেমন— 'করিল' শব্দটিতে অক্ষর আছে তিনটি—

ক+রি+ল, এখানে ধ্বনির সংখ্যা বিচার করলে দেখা যাবে শব্দটিতে ধ্বনির সংখ্যা ৬ : ক্+অ+র্+ই+ল্+অ। আবার 'সিদ্ধান্ত' শব্দটিতে অক্ষর আছে তিনটি—

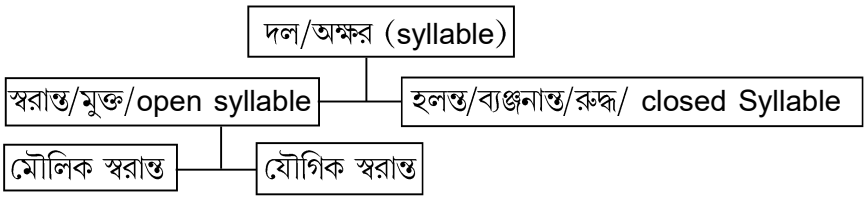
সিদ্+ধান্+ত। উচ্চারণ সাধ্য ধ্বনি ৩টি কারণ আমরা সেভাবেই উচ্চারণ করি। কিন্তু 'সিদ্ধান্ত' শব্দটিতে ধ্বনির সংখ্যা ৮ : স্ + ই + দ্ + ধ্ + আ + ন্ + ত্ + অ। 'সিদ্ধান্ত' শব্দটির 'দ্ধ'-কে একসাথে উচ্চারণ না করে ভেঙে উচ্চারণ করতে হয়। কারণ ছন্দের বিচার চোখে নয় কানে। সেভাবেই কিছু শব্দেবর উচ্চারণ সাধ্য ধ্বনি বিভাগ নিম্নে দেওয়া হল—

দুর্গা— দুর্ + গা
বন্ধন— বন্ + ধন্
ছন্দ— ছন্+দ
অক্ষর— অক্ + খর

উচ্চারণসাধ্য স্বল্পতম ধ্বনিই ইংরেজির Syllable, বাংলায় বলা যায় অক্ষর বা দল। এই অক্ষরকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়— স্বরান্ত এবং ব্যঞ্জনান্ত বা হলন্ত। যেসব অক্ষরের শেষে হসন্ত আছে সেগুলিকে বলে ব্যঞ্জনান্ত বা হলন্ত অক্ষর। ইংরেজিতে

একে বলে closed syllable. এই জাতীয় শব্দের শেষে ব্যঞ্জনধ্বনি থাকে। উপর্যুক্ত উদাহরণগুলির—

'দুর্', 'বন্', 'ধন্', 'ছন্', 'অক্', 'খর্' ইত্যাদি হলন্ত অক্ষর। যেসব অক্ষরের শেষে স্বর আছে অর্থাৎ অন্তে স্বরবর্ণ, সেগুলি open syllable সেগুলো স্বরান্ত অক্ষর। উপর্যুক্ত উদাহরণগুলির মধ্যে 'গা', 'দ' স্বরান্ত। এই স্ববান্ত অক্ষরকে আরও দুটি সূক্ষ্মভাগে ভাগ করা হয় মৌলিক স্বরান্ত এবং যৌগিক স্বরান্ত। 'জননী' শব্দের জ+ন+নী তিনটিই মৌলিক স্বরান্ত কারণ এতে একটি করে স্বর আছে শেষে। কিন্তু 'দৈব' শব্দে (দৈ+ব) দৈ-দ (ও+ই) রয়েছে। যে সব শব্দের অক্ষরে একাধিক স্বর থাকে তাদের যৌগিক স্বরান্ত অক্ষর বলে। এভাবে বিভাগটিকে সাজিয়ে দেওয়া যেতে পারে—



আরেকটি উদাহরণ দিয়ে 'অক্ষর' বোঝানো যেতে পারে। 'প্রাগৈতিহাসিক' শব্দে অক্ষর আছে—

(প্রা+গৈ + তি + হা + সিক্) ৫টি। এর মধ্যে হস্ চিহ্ন যুক্ত শব্দ একটি-সিক্ অর্থাৎ হলন্ত শব্দ হল 'সিক্'। বাকি 'প্রা' 'গৈ' 'তি' এবং 'হা' স্বরান্ত অক্ষর। এর মধ্যে 'গৈ' অক্ষর গ (অ+ই) একাধিক স্বর আছে, তাই 'গৈ' অক্ষরটি যৌগিক স্বরান্ত অক্ষর, বাকি তিনটি মৌলিক স্বরান্ত অক্ষর।

মনে রাখতে হবে, যদিও বাংলা বর্ণমালায় মাত্র 'ঐ' এবং 'ঔ' এই দুইটি যৌগিক স্বর দেখানো হয়, কিন্তু বাস্তবে বাংলায় বহু যৌগিক স্বরের ব্যবহার আছে। 'খাই' 'দাও' প্রভৃতি শব্দ একাক্ষর এবং যৌগিক স্বরান্ত। তেমনি মনে রাখতে হবে বাংলায়, মৌলিক স্বর মাত্রেই হ্রস্ব স্বর। 'ঈ', 'ঊ', 'আ', 'ও' এগুলো দীর্ঘস্বর হলেও হ্রস্ব উচ্চারিত হয়ে থাকে।

গঠনের দিক থেকে অক্ষরের মধ্যে স্বরই প্রধান। অক্ষরের মধ্যে স্বরের পরে যদি ব্যঞ্জনবর্ণ থাকে তবে অক্ষরের দৈর্ঘ্য বেড়ে যায়। উচ্চারণের ক্ষেত্রে মৌলিক স্বরান্ত এবং হলন্ত বা যৌগিক অক্ষরে কিছু পার্থক্য রয়েছে। একই লয়ে একটি মৌলিক স্বরান্ত ও একটি হলন্ত অক্ষর পড়লে দেখা যায়, হলন্ত অক্ষরের উচ্চারণে কিছু সময় বেশি লাগে। কিন্তু দ্রুত লয়ে হলন্ত অক্ষর পড়লে মধ্য লয়ের স্বরান্ত অক্ষরের সমান মনে হয়। একে বলে হ্রস্বীকরণ। তেমনি হলন্ত অক্ষরের দীর্ঘিকরণও বাংলায় চলে। বিলম্বিত অক্ষর মধ্য লয়ের স্বরান্ত অক্ষরের দ্বিগুণ হতে পারে।

মাত্রা

বাংলা ছন্দের ক্ষেত্রে মাত্রার মূল তাৎপর্য duration বা কাল পরিমাণ। ছন্দে কাল পরিমাণ বোধক একককেই মাত্রা বলা হয়। এক একটি অক্ষরের উচ্চারণে কী পরিমাণ সময় লাগে সেই অনুসারে মাত্রা স্থির করা হয়। তবে সর্বত্রই পরিমাণ অনুসারে মাত্রার হিসেব করা হয়, তা নয়। আসলে উচ্চারণের সময় বিভিন্ন অক্ষরের কাল পরিমাণ বিভিন্ন ধরনের হয়। ছন্দের ক্ষেত্রে মাত্রার হিসেবের সময় প্রতিটি অক্ষরের কাল পরিমানের, সূক্ষ্ম বিচার করা হয় না। সাধারণত হ্রস্ব বা এক মাত্রার এবং দীর্ঘ বা দুই মাত্রার— এই দুই শ্রেণির অক্ষর গণনা করা হয়। প্রতিটি মাত্রার। অর্থাৎ একটি হ্রস্ব স্বরান্ত অক্ষর উচ্চারণ করতে স্বাভাবিকভাবে যে সময় লাগে তাকে এক মাত্রা ধরা হয় আবার দীর্ঘ স্বরান্ত বা হলন্ত অক্ষরের ক্ষেত্রে দুই মাত্রা ধরা হয়। তবে কখনো কখনো তিন মাত্রার অক্ষরও পাওয়া যায়। কিন্তু সব হ্রস্ব বা দীর্ঘ অক্ষরের কাল পরিমাণ, যে এক কিংবা দীর্ঘস্বর মাত্রেই যে উচ্চারণে হ্রস্ব অক্ষরের দ্বিগুণ সময় লাগে তা নয়।

বাংলায় অক্ষরের অবস্থান এবং ছন্দের প্রকৃতি অনুসারে মাত্রা স্থির করতে হয়। মাত্রার দিক থেকে বাংলা উচ্চারণের রীতিও একেবারে বাঁধা ধরা নয়। তবে একথা বলা যায়, ছন্দের আদর্শ অনুসারেই অক্ষরের মাত্রা স্থির করতে হয়। সমস্ত মৌলিক স্বরান্ত অক্ষরই হ্রস্ব এবং তা একমাত্রিক বলে গণ্য হয়। যেমন—

। । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।
ডাকিছে দোয়েল | গাহিছে কোয়েল | তোমার কানন | সভাতে।
। । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।
মাঝখানে তুমি | দাঁড়ায়ে জননী | শরৎকালের | প্রভাতে।।

এখানে 'দাঁড়ায়ে জননী' পর্বটিতে ৬ টি স্বরান্ত অক্ষর আছে। সুতরাং এর মাত্রা সংখ্যা ৬। হলন্ত অক্ষর যদি শব্দের শেষে থাকে তবে সাধারণত তা দীর্ঘ হয়। উপর্যুক্ত দৃষ্টান্তটিতে 'শরৎকালের' পর্বটিতে 'রৎ' ও 'লের' অক্ষর দুটি অন্ত্যাক্ষর এবং দীর্ঘ। সুতরাং পর্বটিতে অক্ষর চারটি হলেও মাত্রাসংখ্যা ছয়। হলন্ত অক্ষর শব্দের ভিতরে থাকলে তা হ্রস্ব বা দীর্ঘ হতে পারে। যেমন-

। । ।। ।। ।। । । । । । । । । । । । । । । । । । ।
তারা সবে মিলে থাক | অরণ্যের স্পন্দিত পল্লবে | শ্রাবণ বর্ষণ।
। । ।। ।
যোগ দিক্ নির্ঝরের | মঞ্জীর-গুঞ্জন-কলরবে | উপল ঘর্ষণে।।

উপর্যুক্ত কবিতাংশে অনেক যুক্তাক্ষরের ব্যবহার আছে। শব্দের অন্ত্যে ছাড়াও শুরুতে বা মধ্যে হলন্ত অক্ষর আছে। কিন্তু সেগুলি হ্রস্ব উচ্চারিত হয়েছে। যেমন 'মঞ্জীর' শব্দের মধ্যে দুটি হলন্ত অক্ষর মন+জীর রয়েছে। 'মন' হ্রস্ব কিন্তু 'জীর' দীর্ঘ। 'গুঞ্জন'

শব্দেও গুণ+জন রয়েছে। এখানে 'গুণ' হ্রস্ব কিন্তু 'জন' দীর্ঘ। ফলে প্রতি চরণে বিভাগ হয়েছে ৮ + ১০ + ৬ মাত্রার। তবে স্থানবিশেষে মৌলিক দীর্ঘ স্বরান্ত অক্ষরও পাওয়া যায়। যেমন—

" হী হী শব্দে শ্র অটবী পুরিছে।"

এখানে আবেগসূচক শব্দ 'হী' দুই মাত্রিক।

৪.৪.৫ লয়

লয় হল গতি। অক্ষরের মাত্রাভেদ ঘটে উচ্চারণের গতির পার্থক্য অনুযায়ী। ছন্দো বাঁধা একই রকম দৈর্ঘ্যের চরণ একই গতিতে সব সময় পড়া যায় না। এর কারণ তাদের গতি বা লয় এক নয়। যেমন—

১। "বৃষ্টি পরে টাপুর টুপুর নদে এল বান।"

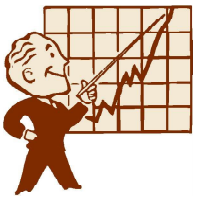
২। "মহাভারতের কথা অমৃত সমান।"

৩। "ভূতের মতন চেহারা যেমন নির্বোধ অতি ঘোর।"

প্রথম চরণটি ধীর গতিতে পড়লে ভালো শোনায় না। পড়তে হয় দ্রুত। দ্বিতীয় চরণটি একইভাবে দ্রুত বা বিলম্বিত লয়ে পড়লে ছন্দপতন ঘটে, পড়তে হয় ধীর লয়ে। আবার তৃতীয়, চরণটি পড়তে হয় বিলম্বিত লায়ে।

লয় তিন প্রকার দ্রুত, ধীর এবং বিলম্বিত।

দ্রুত লয়ের ছন্দে বারবার শ্বাসাঘাত পড়ে। ফলে একাধিক অতি দ্রুত গতির অক্ষরের ব্যবহার হয়, পর্বের দৈর্ঘ্যও হয় ক্ষুদ্রতম অর্থাৎ ৪ মাত্রার। ধীর লয়ের ক্ষেত্রে কবিতায় একটা গম্ভীর ডাক লক্ষিত হয়। ধীর লয়ের ছন্দে লঘু ও গুরু অক্ষরের ব্যবহারই হয়। আবার বিলম্বিত লয়ের চরণে একটানা মন্দ গতি থাকে। এই গতির পার্থক্য অনুসারেই অক্ষরের মাত্রাভেদ ঘটে। লঘু অক্ষরের উচ্চারণ হয় মধ্যগতিতে বা ধীর গতিতে। স্বরান্ত অক্ষর যখন দীর্ঘ উচ্চারিত হয় তখন তার গতি হয় বিলম্বিত।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন— ক

১। বাংলা ছন্দ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে অক্ষর ও মাত্রার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করুন। (১০০ শব্দের মধ্যে লিখুন)

২। বাংলা কবিতার ছন্দের অনুষঙ্গ ছেদ ও যতি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন। (৫০ শব্দের মধ্যে)

৪.৫ বাংলা ছন্দের ত্রিধারা

বাংলা অক্ষরের বা syllable-এর মাত্রা নির্দিষ্ট নয়, ছন্দের প্রয়োজনে তা পরিবর্তন

হয় অর্থাৎ হ্রস্বীকরণ বা দীর্ঘিকরণ ঘটে। চরণের পর্বগুলি উচ্চারণ করতে কতটুকু সময় লাগে তার উপর মাত্রা নির্ভর করে। ধ্বনিকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে উচ্চারণ করা হয় তাতে মুক্ত বা স্বরান্ত অক্ষর উচ্চারণ যতটুকু সময় লাগে তাতে মাত্রা ধরা হয় এক এবং রুদ্ধ বা ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর উচ্চারণ করতে যতটুকু সময় লাগে তাতে মাত্রা ধরা হয় দুই। কিন্তু এভাবেই যদি সব ছন্দ লেখা হত তাহলে কোনো বৈচিত্র্য থাকত না। আমরা দেখেছি চরণের কোনো পর্ব হয় বড়, কোনো পর্ব মাঝারি বা ছোট। পর্ব বড় হলে লয় ধীর হয় আবার ছোট হলে লয় হয় দ্রুত। এসবই ছন্দের বৈশিষ্ট্যের জন্য হয়। সেজন্যই মাত্রা বিচারে বাংলা ছন্দের ত্রিধারা গড়ে ওঠে-স্বরবৃত্ত, অক্ষরবৃত্ত এবং মাত্রাবৃত্ত। ছান্দসিকগণের মতে এই তিনটি ছন্দেই বাংলা কবিতা গড়ে ওঠে। যদিও এই ক্ষেত্রেও মতপার্থক্য রয়েছে। নিম্নে বাংলা ছন্দের এই ত্রিধারা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হল—

৪.৫.১ স্বরবৃত্ত ছন্দ

উৎপত্তির দিক থেকে বিচার করলে যাকে বলা যায়, 'দেশি' বা 'দেশজ' ছন্দ, ব্যবহারের দিক থেকে যাকে বলা যায় 'লৌকিক ছন্দ' তাকেই বলা হয় স্বরবৃত্ত ছন্দ। এই ছন্দটির প্রথম নামকরণ করে প্রবোধচন্দ্র সেন বলেছিলেন— "এ ছন্দ প্রতি চরণের অন্তর্গত অক্ষর সংখ্যার বা মাত্রাসংখ্যার ওপর নির্ভর না করে স্বর সংখ্যার ওপর নির্ভর করছে, সেহেতু এ ছন্দকে 'স্বরবৃত্ত' নাম দেওয়া সঙ্গত মনে করি।" স্বরবৃত্ত ছন্দের সংজ্ঞায় বলা যায়, যে ছন্দে পর্বের মাত্রাসংখ্যা তার স্বর সংখ্যার সমান, তাকে স্বরবৃত্ত ছন্দ বলে অর্থাৎ পর্বে কয়টি স্বরবর্ণ ব্যবহার হয়েছে তা গণনা করলেই যেখানে মাত্রার হিসেব পাওয়া যায় তাকে স্বরবৃত্ত ছন্দ বলে। অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় এই ছন্দকে বলেছেন 'শ্বাসাঘাত প্রধান দ্বন্দ'। 'শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দ' বলার কারণ এই ছন্দে প্রতিটি পর্বের শুরুর অক্ষরে প্রবল শ্বাসাঘাত পড়ে। এই ছন্দের একটি অতি প্রচলিত নাম 'ছড়ার ছন্দ' বা 'লৌকিক ছন্দ'।

স্বরবৃত্ত বা শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দের

- এই ছন্দে সাধারণত প্রতি চরণে ৩টি পূর্ণ পর্ব এবং একটি অপূর্ণ পর্ব থাকে। অবশ্য এর ব্যতিক্রমও লক্ষ করা যায়।
- প্রায় প্রত্যেক পর্বেই শুরুতে প্রবল শ্বাসাঘাত পড়ে। এই শ্বাসাঘাতের প্রভাবেই এই ছন্দের বিশেষ লক্ষণগুলি সৃষ্টি হয়। এজন্যই হয় একে শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দ বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে শ্বাসাঘাত থাকে বলেই যৌগিক স্বর হ্রস্ব বলে মনে হয়। শ্বাসাঘাতযুক্ত ছন্দের ছাঁচ বাঁধা থাকে বলেই এই ছন্দে একটি মূল শব্দ ভেঙে পর্বাঙ্গের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া যায়। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে—

।।। ।। ।।। ।।। ।।।।। ।।।
আমি যদি | জন্ম নিতেম | কালিদাসের | কালে। ৪+৪+৪+২
।।। ।। ।।। ।। ।।।।। ।।।
দৈবে হতেম | দশম রত্ন | নবরত্নের | মালে।। ৪+৪+৪+২

- উপর্যুক্ত কবিতাংশে ৪টি পূর্ণ ও একটি অপূর্ণ পর্ব রয়েছে প্রতি চরণে। প্রতি পর্বের শুরুতে শ্বাসাঘাত পড়েছে। এই শ্বাসাঘাতকে '/' চিহ্ন দিয়ে বোঝানো হয়েছে।
- এই ছন্দের প্রতিটি পর্বের মাত্রা সংখ্যা ৪ হয়ে থাকে। উপর্যুক্ত মাত্রা সংখ্যা যে ৪ তা দেখানো হয়েছে।
- এই ছন্দে স্বরান্ত ও হলন্ত অক্ষর, এক মাত্রা ধরা হয়। এছাড়াও হ্রস্ব, দীর্ঘ বা যৌগিক স্বরওর মাত্রা ধরা হয়।
- এই ছন্দে প্রতি পর্বে সুনির্দিষ্ট ৪ টি করে মাত্রা থাকে বলে দ্রুত যতিপাত ঘটে। ফলে এর চলন হয় দ্রুত। সেজন্য অনেক ছান্দসিক্ একে দ্রুত লয়ের ছন্দ বলেন।
- যৌগিক স্বরের ব্যাপারে স্বরবৃত্ত ছন্দে বিশেষ সতর্কতা প্রয়োজন। শুধু 'ঐ' বা 'ঔ' নয়, এর বাইরেও অনেক স্বর রয়েছে যেগুলো পৃথক বর্ণ দ্বারা লিখতে হয়। অনেক সময় ব্যঞ্জনবর্ণ 'য়' ব্যবহৃত হয়। যেমন—

ক) "বড়ো সাহেবের | মেয়ে গুলো | নাইতে নেমে | ছে" ৪+৪+৪+১

—এখানে নাইতে শব্দে 'নাই' একটি হলন্ত অক্ষর। তাই ১ মাত্রা ধরা হয়েছে।

আবার

খ) "কাঁপিয়ে পাখা | নীল পতাকা | ছুটল অলি | কুল।"

এই চরণে 'কাঁপিয়ে পাখা' ৫ মাত্রার মনে হতে পারে কিন্তু 'পিয়ে' আসলে একটি রুদ্ধ দল। তাই ১ মাত্রা।

স্বরবৃত্ত ছন্দের কিছু ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত

- যদিও এই ছন্দে পূর্ণ পর্বে ৪ টি অক্ষর এবং মাত্রা ৪ হয়ে থাকে কিন্তু কখনও কখনও মাত্রাসংখ্যা ৪-এর বেশি বা কমও হয়ে থাকে। তখন অক্ষর সংখ্যা বাড়িয়ে বা সম্প্রসারণ করে অথবা কমিয়ে বা সংকোচন করে মাত্রা সংখ্যা ৪ করতে হয়। যেমন—

ক) বৃষ্টি পড়ে | টাপুর টুপুর | নদে এল | বান ৪+৪+৪+১
শিব ঠাকুরের | বিয়ে হবে | তিন কন্যে | দান। ৪+৪+৩+১

- এখানে 'তিন কন্যে' পর্বের মাত্রা সংখ্যা ৩। দুটো রুদ্ধ অক্ষর থাকার জন্য

এই বিপত্তি হয়েছে। তখন সম্প্রসারণ বা বিশ্লিষ্ট উচ্চারণ করে মাত্রা সংখ্যা ৪ করতে হয়।

খ) যমুনাবতী | সরস্বতী | কাল যমুনার | বিয়ে। ৫+৪+৪+২

এখানে 'যমুনাবতী' পর্বে ৫ টি স্বরান্ত অক্ষর, মাত্রা সংখ্যাও ৫। স্বাভাবিক ভাবেই ছন্দের প্রয়োজনে সংকোচন পদ্ধতিতে বা সংশ্লিষ্ট উচ্চারণ করে পর্বটির মাত্রা সংখ্যা ৪ করতে হয়।

- এই ছন্দের সাধারণ নিয়মে ৩টি পূর্ণ ও একটি অপূর্ণ পর্ব থাকে প্রতি চরণে। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়। যেমন—

ক) পায়ের তলায় | নরম ঠেকল | কি ৪+৪+১

আস্তে একটু | চল না ঠাকুর | ঝি। ৪+৪+১

এখানে প্রতি চরণে পূর্ণ পর্ব ২ টি এবং ১ টি অপূর্ণ পর্ব।

আবার—

খ) যদি বর্ষে | মাঘের শেষ ৪+৩

ধন্য রাজার | পুণ্য দেশ। ৪+৩

এখানে ১ টি পূর্ণ ও ১ টি অপূর্ণ পর্ব রয়েছে।

৪.৫.২ অক্ষরবৃত্ত ছন্দ

অক্ষরবৃত্ত ছন্দ বোঝাতে বেশ কিছু পরিভাষিক শব্দ ব্যবহার করা হয়। যেমন—তানপ্রধান ছন্দ, মিশ্র কলাবৃত্ত ছন্দ, মিত্রবৃত্ত ছন্দ ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং বুদ্ধদেব বসু অবশ্য এই রীতির ছন্দ বোঝাতে 'পয়ার' শব্দটিই ব্যবহার করেছেন। চোখের দেখা বা দৃষ্টিগ্রাহ্য যুক্ত বা বিযুক্ত অক্ষরকে এক মাত্রা গণনা করে যে ছন্দের যাবতীয় বিশ্লেষণ সম্ভব সেই ছন্দকেই বলা হয় অক্ষবৃত্ত ছন্দ। যেমন- 'ছান্দসিক' শব্দে বর্ণ আছে ৮ টি (ছ+আ+ন+দ+অ+স+ই+ক) কিন্তু অক্ষর বা Syllable আছে ৩ টি (ছান, দ, সিক) কিন্তু দৃষ্টিগ্রাহ্য অক্ষর আছে ৪ টি (ছা, ন্দ, সি, ক)। সুতরাং এই শব্দের মাত্রা অক্ষরবৃত্ত ছন্দ অনুযায়ী ৪ হয়। এই ছন্দে যতগুলো দৃষ্টিগ্রাহ্য অক্ষর, মাত্রাসংখ্যাও ততই হয়ে থাকে। অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় এই ছন্দকে বলেছেন তানপ্রধান ছন্দ কারণ এই ছন্দে ধ্বনিপ্রবাহের মধ্যে একটা সুরের টান বা তান থাকে যা অনেক সময় অক্ষর বা ধ্বনিকে অতিক্রম করে যায়।

অক্ষরবৃত্ত বা তানপ্রধান ছন্দের বৈশিষ্ট্য

- এই ছন্দের প্রধান বৈশিষ্ট্য অক্ষর ও পর্বে সমতা। অর্থাৎ যতগুলি অক্ষর ততগুলি মাত্রা। যেমন-

"সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি । ৮+৬

সারাদিন আমি যেন। ভালো হয়ে চলি।।" ৮+৬

উপর্যুক্ত দৃষ্টান্তে প্রথম চরণে (৮+৬) মাত্রা, অক্ষর প্রথম পর্বে ৮ দ্বিতীয় পর্বে ৬।

দ্বিতীয় চরণে প্রথম পর্বে ৮ মাত্রা ও দ্বিতীয় পর্বে মাত্রা ৬। চরণ দুটিতে দৃশ্য অক্ষরও তাই।

- এই ছন্দে স্বরান্ত অক্ষর সর্বত্রই একমাত্রা। তবে হলন্ত অক্ষরের ক্ষেত্রে কিছু বিশেষ নিয়ম আছে। হলন্ত অক্ষর শব্দের প্রথমে এবং মধ্যে র মাত্রা। শব্দের শেষের হলন্ত অক্ষর ২ মাত্রা এবং একক হলন্ত অক্ষর ২ মাত্রা ধরা হয়। যেমন— 'দুর্দান্ত' শব্দটি অক্ষরবৃত্তে ৩ মাত্রা। দুর্দান্ত (দুর্+দান+ত), শুরু ও মধ্যের হলন্ত অক্ষর ১ মাত্রা, আবার দৃশ্য গ্রাহ্য অক্ষর (দু+র্দা+ন্ত) ৩ মাত্রাই হচ্ছে।
- অক্ষরবৃত্ত ছন্দের পর্বগুলি দীর্ঘ। এজন্য এই ছন্দের লয় ধীর।
- এই ছন্দে পূর্ণ পর্বের মাত্রা সংখ্যা কখনও বেজোড় সংখ্যক হয় না। সাধারণত ৬, ৮, ১০ মাত্রা হয়, কখনো ৪ মাত্রা হয়ে থাকে। তবে বেজোড় মাত্রাযুক্ত পর্ব মধ্যযুগের কাব্যে কখনও পাওয়া যায়।
- অক্ষরবৃত্তে ছন্দে সর্বদাই একটা সুরের টান অনুভব করা যায়। এজন্য এই ছন্দকে তানপ্রধান ছন্দ বলে।
- এই ছন্দের সুরের টানের জন্যই এর গঠনে ঠাসা-বুনুনি নেই, অনেক ফাঁক-ফোকর থেকে যায়। ফলে একটা নির্দিষ্ট মাত্রার মধ্যে যতখুশি ধ্বনির প্রবেশ সম্ভব। রবীন্দ্রনাথ একেই বলেছেন পয়ারের স্থিতিস্থাপকতা গুণ বা 'পয়ারের শোষণ শক্তি'।
- এই ছন্দের লয় ধীর বলে এখনও ক্ষীপ্র গতি বা আরাম বা বিলাসের ভাব সৃষ্টি হয় না বরং একটা সংযত, গম্ভীর ভাব সৃষ্টি হয়।
- এই ছন্দের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল দুই বা দুইয়ের গুণিতক যে কোনো সংখ্যক মাত্রার পরে ছেদ বসানো যায়। যেমন—

  "বিশেষণে সবিশেষ | কহিবারে পারি।
  জান তো * স্বামীর নাম | নাহি ধরে নারী।।"

  এখানে অন্বয় অনুযায়ী দ্বিতীয় চরণের প্রথম তিন অক্ষর অর্থাৎ 'জান তো'র পরে ছেদ চিহ্ন (*) বসানো যায়।
- এই ছন্দের অন্বয় রীতি গদ্যসুলভ বলে গদ্যভাষার সাথে এর পার্থক্য কম। এই ভাষায় প্রবহমানতা বজায় রাখা অপেক্ষাকৃত সহজ তাই 'অমিত্রাক্ষর ছন্দ' বা অন্যান্য বিচিত্র ছন্দোবন্ধ এই ছন্দে রচিত হয়েছে।



আসুন জেনে নিই

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন যে পয়ারের (৮+৬) = ১৪ মাত্রা বজায় রেখেই যুক্তাক্ষরহীন পয়ারকে যুক্তাক্ষর বহুল পয়ারে পরিবর্তিত করা যায়। এত যুক্তাক্ষর থাকা সত্ত্বেও মাত্রার হেরফের হয় না। একেই তিনি বলেছেন পয়ারের শোষণ শক্তি। যেমান— "দুর্দান্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ | দুঃসাধ্য সিদ্ধান্ত" (৮+৬) চরণটিতে মাত্রা রয়েছে ১৪ টি, অক্ষর ১৪ টি কিন্তু ব্যঞ্জনধ্বনি আছে ২৩ টি এবং স্বরধ্বনি ১৪ টি। অন্য কোনো ছন্দেই ১৪ মাত্রার মধ্যে এত ধ্বনির ব্যবহার সম্ভব নয়।

অক্ষরবৃত্ত ছন্দের রূপকল্প বৈচিত্র্য

- পয়ার-অক্ষরবৃত্ত ছন্দের একটি অতি প্রচলিত নাম বা পয়ার জাতীয় ছন্দ বা অনেকে একে পয়ার বলে থাকেন। ১৪ মাত্রার চরণ হয়ে থাকে। প্রতি চরণে দুটি পর্ব থাকে— ৮ এবং ৬। যেমন—

  মহাভারতের কথা | অমৃত সমান। ৮+৬
  কাশীরাম দাস কহে | শোনে পুণ্যবান।। ৮+৬

- লঘু পয়ার — ৮+৬ বিন্যাস। যেমন—

  শাশুড়ি ননদী নাই | নাই তোর সতা। ৮+৬

- তরল পয়ার— চতুর্থ ও অষ্টম অক্ষরে মিল। যেমন—

  সিংহগ্রীব | বন্ধুজীব | অধরের তুল। ৪+৪+৬

- মালধাপ পয়ার-চতুর্থ, অষ্টম ও দ্বাদশ অক্ষরে মিল। যেমন—

  ঠুকে তাল | আঁখি লাল | কি করাল | মূর্তি। ৪+৪+৪+২

- দীর্ঘ পয়ার— ৮+৮= ১৬ মাত্রার চরণ থাকে। যেমন—

  ঘনঘটা দরশনে | যত সুখী হয় শিখী। ৮+৮

- মহাপয়ার— ৮+ ১০ মাত্রার চরণ থাকে। যেমন—

  একথা জানিতে তুমি | ভারত ঈশ্বর সাজাহান। ৮+ ১০

- লঘু ত্রিপদী-প্রথম চরণে দুটি ৬ মাত্রার পর্ব, দ্বিতীয় চরণে একটি ৮ মাত্রার পর্ব-এই নিয়ে তিন পর্বের চরণ থাকে। যেমন—

  "সভাজন শুন জামাতার গুণ ৬+৬
  বয়সে বাপের বড়।" ৮

- দীর্ঘ ত্রিপদী—প্রথম চরণে দুটি ৮ মাত্রার পর্ব, দ্বিতীয় চরণে একটি ১০ মাত্রার পর্ব-এই নিয়ে তিন পর্বের চরণ। যেমন—

  যশোর নগর ধাম | প্রতাপ আদিত্য নাম | ৮+৮
  মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ ১০

- লঘু ত্রিপদী— প্রথম চরণে দুইটি পর্ব সাধারণত ছয় মাত্রার হয়। দ্বিতীয় চরণে দুইটি পর্ব—
- একটি পূর্ণ পর্ব সাধারণত ছয় মাত্রার ও একটি অপূর্ণ পর্ব থাকে। যেমন—

  চিরসুখী জন | ভ্রমে কি কখন ৬+৬

  ব্যথিত বেদন | বুঝিতে পারে। ৬+৫
- দীর্ঘ চৌপদী— (৮+৮+৮+৮) মাত্রার পর্ব বিন্যাস। পূর্ণ পর্ব ৮ মাত্রা, অপূর্ণ পর্ব ৬ বা ৫ মাত্রার যেমন—

  তরিবারে পরিমাণ | হর রূপে হরিনাম। ৮+৮

  হরি ভজি পূর্ণ কাম | কমলজ রে।। ৮+৬
- একাবলী— প্রতি চরণে ১১ মাত্রা থাকে। পূর্ণ পর্ব ৬ মাত্রার বা ৮ মাত্রার। যেমন—

  নেয়াতি সেয়াতি | বরুণা সাঁই ৬+৫

  বেউড় বাঁশের | অবধি নাই।। ৬+৫
- প্রবহমান পয়ার বা অমিত্রাক্ষর ছন্দ— ১৪ অক্ষর সম্বলিত চরণ। যেমন—

  সম্মুখ সমরে পড়ি | বীর চূড়ামণি ৮+৬

  বীরবাহু চলি যবে | গেলা যমপুরে ৮+৬

প্রবহমান পয়ার মিত্রাক্ষরও হতে পারে। যেমন- 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী। এছাড়াও রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত বলাকার ছন্দ বা মুক্তক ছন্দও অক্ষরবৃত্তের আধারে রচিত।

৪.৫.৩ মাত্রাবৃত্ত ছন্দ

উৎপত্তির দিক থেকে বিচারে যে ছন্দকে বলা যায় তৎসম বা অর্ধতৎসম ছন্দ, যে ছন্দে প্রাচীন সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছন্দের বেশ কিছু লক্ষণ বর্তমান তাকে বলে মাত্রাবৃত্ত ছন্দ। এই ছন্দের সংখ্যায় বলা চলে, যে জাতীয় ছন্দে যে কোনো হলন্ত বা ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর ২ মাত্রা ধরা হয় এবং যার চলন বিলম্বিত তাকে বলা হয় মাত্রাবৃত্ত ছন্দ। ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেন এর মতে ধ্বনির পরিমাণ বা quantity র উপর ভিত্তি করে যে ছন্দ রচিত হয় তাকে বলে মাত্রাবৃত্ত ছন্দ। মাত্রাসংখ্যা স্থির রাখাই ধ্বনির পরিমাণ স্থির রাখার উপায়। এই জাতীয় ছন্দে অক্ষরের উচ্চারণগত ধ্বনির পরিমাণই প্রধান বলে একে ধ্বনিপ্রধান ছন্দ বলেছেন ছান্দসিক অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়।

মাত্রাবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধান ছন্দের বৈশিষ্ট্য

- এই ছন্দে যে কোনো হলন্ত অক্ষরই দ্বিমাত্রিক বা ২ মাত্রার। সেই অক্ষর

শব্দের আদিতে, মধ্যে বা অন্ত্যে-যেখানেই থাকুক না কেন। যেমন—

। । । । ।। ।। ।।।।। ।।।।

এ নহে মুখর | বন মর্মর | গুঞ্জিত ৬+৬+৪

। । । । ।। । । । । ।। । । ।

এ যে অজাগর | গরজে সাগর | ফুলিছে। ৬+৬+৩

- যে কোনো হলন্ত অক্ষর ২ মাত্রা হওয়ায় এই ছন্দে অক্ষরের তুলনায় মাত্রা সংখ্যা বেশি হয়।
- এই ছন্দের পর্বগুলি অপেক্ষাকৃত ছোটো হয়। পর্বের মাত্রা সংখ্যা সাধারণত ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। যেমন—

।। ।। ।। ।। ।। ।। ।।।

৪ মাত্রার পর্ব— ছিপ খান | তিন দাঁড় | তিন জন | মাল্লা। ৪+৪+৪+৩

।।।।। ।।। ।। ।। । ।। ।। । ।।

৫ মাত্রার পর্ব— নন্দপুর | চন্দ্র বিনা | বৃন্দাবন | অন্ধকার। ৫+৫+৫+৫

৬ মাত্রার পর্ব— দুর্গম গিরি | কান্তার মরু | দুস্তর পারা | বার ৬+৬+৬+২

৭ মাত্রার পর্ব— ছিলাম নিশিদিন | আশাহীন প্রবাসী। ৭+৭ ইত্যাদি।

- এই ছন্দে উচ্চারিত অক্ষরের ধ্বনি পরিমাণই প্রধান। তবে স্বরধ্বনির প্রাধান্য এতে নেই। প্রত্যেক স্পষ্ট উচ্চারিত ধ্বনিরই এই ক্ষেত্রে হিসেব রাখতে হয়। এজন্য যৌগিক অক্ষরের দীর্ঘিকরণের একটা প্রবৃত্তি এই ছন্দে রয়েছে।
- এই ছন্দের লয় বিলম্বিত। এজন্য এই ছন্দ অপেক্ষাকৃত দুর্বল। বেশি মাত্রার পর্ব এই ছন্দে ব্যবহার করা যায় না।
- এই ছন্দে দীর্ঘিকরণের বাহুল্য আছে বলে হ্রস্ব ও দীর্ঘের সমাবেশে এতে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা যায়।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন— খ

১) অক্ষরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্ত ছন্দের পার্থক্য উপযুক্ত দৃষ্টান্ত সহকারে বুঝিয়ে দিন। (১০০ শব্দের মধ্যে লিখুন)

২) স্বরবৃত্ত ছন্দের বৈশিষ্ট্য লিখুন । (১০০ শব্দের মধ্যে লিখুন)

৪.৫.৪ প্রত্নমাত্রাবৃত্ত বা প্রাচীন ধ্বনিপ্রধান ছন্দ

প্রত্নমাত্রাবৃত্ত বা প্রাচীন ধ্বনিপ্রধান ছন্দ ধ্বনিপ্রধান বা মাত্রাবৃত্তেরই রকমফের মাত্র। সাধারণত মাত্রাবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধান ছন্দে ধ্বনির প্রাধান্য তানপ্রধান বা শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দ অপেক্ষা অনেক বেশি। প্রত্নমাত্রাবৃত্তে ধ্বনিকে অনেক বেশি

স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। উৎপত্তির দিক থেকে একে প্রায় 'তৎসম' বলা চলে। প্রত্নমাত্রাবৃত্তে হলন্ত অক্ষর সর্বত্র ২ মাত্রা। যৌগিক স্বর এবং দীর্ঘস্বর অধিকাংশ ক্ষেত্রে ২ মাত্রা হয়। অনেক সময় হলন্ত অক্ষরকে বিশ্লিষ্ট করে দুটি স্বরান্ত অক্ষরের মতো উচ্চারণ করা হয় এবং ২ মাত্রা ধরা হয়। যেমন—

কাআ | তরুবর | পঞ্চবি | ডাল ৪+৪+৪+৩

চঞ্চল | চীএ | পইঠো | কাল। ৪+৪+৪+৩

উপর্যুক্ত কবিতাংশে আ, ঈ, এ, ও-এই চারটি দীর্ঘস্বর আছে। বিশ্লিষ্ট উচ্চারণের জন্য এদের ২ মাত্রা ধরা হয়েছে এবং পর্বের মাত্রাসমতা রক্ষিত হয়েছে। কিন্তু নিম্নোক্ত পদ কিন্তু দীর্ঘস্বর সর্বত্র ২ মাত্রা হয়নি—

আলিএ কালিএ | বাট রুন্ধেলা ৮+৮

তা দেখি কাহ্ন | বিমনা ভইলা। ৮+৮

এখানে 'আলিএ'-র 'আ' 'কালিএ'র 'কা' এবং 'রুন্ধেলা'র 'ন্ধে' ২ মাত্রা হয়নি আরেকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

নীরদ নয়নে | নীর ঘন সিঞ্চনে ৮+৮

পুলক মুকুল অব | লম্ব। ৮+৩

প্রথম চরণে 'নীরদ'—এর 'নী' এবং 'নয়ন'-এর 'নে' দুই মাত্রা হয়েছে কিন্তু 'নীর' —এর 'নী' হয়নি। এটা ছন্দের প্রয়োজনেই ঘটেছে। 'সিঞ্চনের' 'নে'ও একমাত্রা হয়েছে।



৪.৬ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

- যে ললিত বা সুমিত পদস্থাপনায় বাক্যে রসের সঞ্চার হয় এবং তা সৌন্দর্যসম্পন্ন হয় তা-ই ছন্দ।
- ছন্দ নির্ণয়ের জন্য কিছু অনুষঙ্গ সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রয়োজন। যেমন— চরণ, স্তবক, ছেদ যতি, পর্ব, পর্বাঙ্গ, লয় এবং অক্ষর ও মাত্রা।
- বাংলা কবিতার চরণকে ছেদ বা যতি অনুযায়ী পর্বে ভাগ করে সেই পর্বের অক্ষর নির্ণয় করে তাতে মাত্রা দান করলেই ছন্দ নির্ণয় সম্ভব। সেই ক্ষেত্রে স্বরান্ত ও হলন্ত অক্ষরের গুরুত্ব অপরিসীম।
- বাংলা ছন্দের তিনটি ধারা-স্বরবৃত্ত, অক্ষরবৃত্ত এবং মাত্রাবৃত্ত।
- স্বরবৃত্ত ছন্দকে লৌকিক ছন্দ, ছড়ার ছন্দও বলা হয়।
- স্বরবৃত্ত ছন্দের অন্যতম বৈশিষ্ট্য শ্বাসাঘাত। পর্বের আদিতে প্রবল শ্বাসাঘাতের জন্য

এর লয় দ্রুত। এই শ্বাসাঘাতের জন্য একে শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দও বলে।

- অক্ষরবৃত্ত ছন্দের আরেক নাম পয়ার।
- অক্ষরবৃত্ত ছন্দের প্রধান বৈশিষ্ট্য যতগুলি দৃশ্য অক্ষর ততগুলি মাত্রা এবং এর ধ্বনিপ্রবাহে একটা সুরের তান থাকে। সেজন্য একে তানপ্রধান ছন্দও বলে।
- মাত্রাবৃত্ত ছন্দে যে কোনো হলন্ত অক্ষরকে ২ মাত্রা ধরা হয়। এই ছন্দে ধ্বনির পরিমাণই প্রধান বলে একে ধ্বনিপ্রধান ছন্দও বলা হয়।



৪.৭ অতিরিক্ত পঠন

কামিল্যা, অধ্যাপক মিহির চৌধুরী (২০১০); বাংলা ছন্দ : রূপ ও রীতি; কলকাতা : গ্রন্থতীর্থ

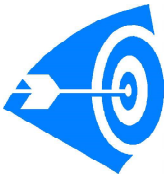
চট্টোপাধ্যায়, হীরেন (২০০২); ছন্দের ক্লাস; কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ

ভট্টাচার্য, পরেশচন্দ্র (২০০৪); ছন্দ মীমাংসা ও অলংকার সমীক্ষা; কলকাতা : জয়দূর্গা প্রা: লি

মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅমূল্যধন (১৯৫৭); বাংলা ছন্দের মূলসূত্র; কলকাতা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

সেন, নীলরতন (১৯৮০); আধুনিক বাংলা ছন্দ; কলকাতা : দে'জ

সেন, প্রবোধচন্দ্র (২০২০); নূতন ছন্দ-পরিক্রমা, কলকাতা : দে'জ



৪.৮ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত 'ক'

১। বাংলা ছন্দ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, হল অক্ষর ও মাত্রা
(৪ নং অধ্যায়ের ৪.৪.৪ অংশ দ্রষ্টব্য)

২। বাক্যের আংশিক বা সামগ্রিক অর্থ প্রকাশের জন্য ধ্বনিপ্রবাহের মধ্যে যে উচ্চারণ বিরাম বা বিরতি প্রয়োজন তাকে বলে হচ্ছে।... (৪ নং অধ্যায়ের, ৪.৪.২ অংশ দ্রষ্টব্য)

অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর সংকেত 'খ'

১। অক্ষরবৃত্ত ছন্দ বোঝাতে বেশ কিছু পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করা হয়।...
(৪ নং অধ্যায়ের ৪.৫.২ এবং. ৪.৫.৩ অংশ দ্রষ্টব্য)

২। উৎপত্তির দিক থেকে বিচার করলে যাকে বলা যায় 'দেশি' বা 'দেশজ' ছন্দ, ব্যবহারের দিক থেকে যাকে বলা যায় 'লৌকিক' ছন্দ তাকেই বলা হয় স্বরবৃত্ত ছন্দ।...
(৮.৪ নং অধ্যায়ের ৪.৫.১ অংশ দ্রষ্টব্য)



৪.৯ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দ কাকে বলে? উদাহরণসহ এই ছন্দের বৈশিষ্ট্য সমূহ আলোচনা করুন।

২। বাংলা ছন্দের আলোচনায় যতি কাকে বলা হয়? ছেদ ও যতি'র সম্পর্ক ও পার্থক্য আলোচনা করুন।

৩। "বাংলা পদ্যের ছন্দোরীতিগুলি অক্ষর এবং মাত্রার পারস্পরিক পরিমাণগত সম্পর্কের উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে।"—উদাহরণ দিয়ে মন্তব্যটি বুঝিয়ে দিন।

৪। শ্বাসাঘাত প্রধান ও ধ্বনিপ্রধান ছন্দের মধ্যে উদাহরণসহ একটি তুলনামূলক আলোচনা প্রস্তুত করুন।

৫। ধ্বনিপ্রধান ছন্দের প্রাচীন ও আধুনিক রীতির মধ্যে পার্থক্য উদাহরণ দ্বারা বুঝিয়ে দিন।

৬। অক্ষরবৃত্ত ছন্দ কাকে বলে? উদাহরণসহ এই ছন্দের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

৭। অক্ষরবৃত্ত ছন্দ এবং মাত্রাবৃত্ত ছন্দের পার্থক্য উদাহরণ সহযোগে বুঝিয়ে দিন।

৮। ধ্বনিপ্রধান ছন্দ বলতে কী বোঝায়? উদাহরণসহ এই ছন্দের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

অধ্যায় ৫ : বাংলা ছন্দ নির্ণয়

অধ্যায় বিন্যাস

৫.১ জ্ঞাতব্য বিষয়
৫.২ পরিচিতি
৫.৩ নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুয়ায়ী ছন্দ নির্ণয়
৫.৩.১ মাত্রা প্রদানের পদ্ধতি ও সমস্যা
৫.৪ ছন্দোলিপি
৫.৫ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম
৫.৬ অতিরিক্ত পঠন
৫.৭ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত
৫.৮ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৫.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই অধ্যায় পাঠ করে আপনি—

- ছন্দ নির্ণয়ের পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- বিভিন্ন বাংলা কবিতার দৃষ্টান্ত সহযোগে মাত্রা প্রদান ও পর্ব ভাগ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।
- ছন্দোলিপি কাকে বলে সে সম্পর্কে আপনারা পরিচিত হবেন।
- ছন্দোলিপি প্রস্তুত করতে শিখবেন।

৫.২ পরিচিতি

ছন্দ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ছন্দ বোধ থাকাটা জরুরি। ছন্দ যেহেতু শোনার উপর নির্ভর করে তাই যে কোনো কবিতা থেমে থেমে পড়ে তার পর্ব ভাগ করতে হয়। ছন্দ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে প্রথম জানা জরুরি অক্ষর কাকে বলে। স্বরান্ত ও হলন্ত অক্ষর নির্ণয় করে তাতে মাত্রা দিতে হয়। কোনো পর্বে যদি সব স্বরান্ত অক্ষর থাকে তাহলে সেই পর্বের মাত্রাসংখ্যা অনুযায়ী বাকি পর্বগুলির মাত্রার সমতা আনতে হয়। যদি দেখা যায় কোনো পর্বের মাত্রা সংখ্যার চেয়ে অক্ষর সংখ্যা কম, তাবে সাধারণত তা মাত্রাবৃত্ত ছন্দের নিদর্শন বলে ধরা হয়। আবার যদি যতগুলো দৃশ্য অক্ষর ততগুলো মাত্রা হয় এবং পদান্ত হলন্ত ও একক হলন্ত অক্ষরে ২ মাত্রা দিনেই তা সম্ভব হয় তবে নিশ্চিত ভাবেই তা অক্ষরবৃত্ত ছন্দের নিদর্শন। আবার স্বরান্ত অক্ষর যুক্ত পর্বে যতগুলো মাত্রা হয়, অন্য কোনো পর্বের অক্ষর সংখ্যা বেশি কিন্তু মাত্রা পূর্ববর্তী স্বরান্ত অক্ষরযুক্ত পর্বের সমান হয় তবে নিশ্চিত ভাবে তা স্বরবৃত্ত ছন্দের নিদর্শন হয়ে থাকে।

৫.৩ নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুযায়ী ছন্দ নির্ণয়

ছন্দ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সবচাইতে প্রথমে দরকার যিনি নির্ণয় করছেন তার ছন্দবোধ। ছন্দ আসলে চোখে দেখার ব্যাপার নয়, এটা কানে শোনার ব্যাপার। যাদের ছন্দবোধ আছে তাদের ছন্দ নির্ণয়ে ততটা অসুবিধে হয় না কিন্তু যাদের নেই তাদের কিছু কৌশল বা পদ্ধতি অবশ্যই মেনে চলতে হবে।

প্রথমেই 'অক্ষর' সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা আবশ্যক। অক্ষর বানান দেখে নয় উচ্চারণ অনুযায়ী স্থির করতে হবে। স্বরান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর নির্ণয় করে নিতে হবে প্রথমেই। বাংলায় অনেক শব্দ আছে যা হস্ যুক্ত নয়। যেমন— জল, ফুল, হায়, খায়, ঘাস ইত্যাদি। অথচ এই শব্দগুলিও ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর কারণ এই জাতীয় শব্দ-গুলির উচ্চারণে হসন্ত আছে। স্বরবৃত্ত, অক্ষরবৃত্ত এবং মাত্রাবৃত্ত ছন্দ সম্পর্কে আলোচনায় আমরা বাংলা এই তিন রীতির ছন্দের অক্ষর সম্পর্কে আলোচনা করেছি এবং তার মাত্রা নিয়েও আলোচনা করেছি। ছন্দ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে মাত্রা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। তিন রীতির ছন্দেই মুক্ত অক্ষর ১ মাত্রা ধরা হয়। তবে হলন্ত বা ব্যঞ্জনান্ত অক্ষরের ক্ষেত্রে মাত্রা ভিন্ন ভিন্ন হয়। স্বরবৃত্ত ছন্দে স্বরান্ত এবং ব্যঞ্জনান্ত নির্বিশেষে ১ মাত্রা কিন্তু অক্ষরবৃত্তে পদান্ত এবং একক হলন্ত অক্ষর দুইমাত্রা ধরা হয় আবার মাত্রাবৃত্তে অক্ষরই ২ মাত্রা ধরা হয়।

পর্বের ব্যাপারে তেমন কোনো বাঁধাধরা নিয়ম নেই। প্রতি চরণের পর্ব সংখ্যা সমান নাও হতে পারে। সাধারণত চরণের শেষ পর্বটি অপূর্ণ থাকে। কখনও কোনো চরণের শুরুতে একটি অতিপর্ব থাকে। পর্বের সমতা ছন্দ রচনার অন্যতম শর্ত। প্রত্যেক পূর্ণ পর্বের মাত্রা সংখ্যা সমান হতেই হবে, প্রবহমান ছন্দ ছাড়া। অপূর্ণ পর্বের ক্ষেত্রে কোনো বাধ্যতামূলক নিয়ম নেই। ছন্দ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এই ছোটো ছোটো কিন্তু মূল্যবান বিষয়গুলি মনে রাখতে হবে।

যে কবিতার ছন্দ নির্ণয় করতে হবে, সেই কবিতাটির ভাব বুঝতে হবে এবং সেই ক্ষেত্রে কবিতাটি থেমে থেমে পড়তে হবে। ঠিক স্থানে থামাটা জরুরি। কবিতা পাঠের সময় যতি স্থাপন কোথায় হয়েছে তা মাথায় রেখে থামতে হয় তাতেই পর্ব নির্ধারণ করা সম্ভব। যতি সময়সীমা মেনেই চলে। নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানেই পর্ব বিভাগ হয়ে থাকে। যতিচিহ্ন যথাস্থানে না থাকলে ছন্দ নির্ণয়ে সমস্যা দেখা দেয়। যেমন—

"বসিয়া প্রভাত | কালে সেতারার | দুর্গভালে..." ৬+৬+৪

এখানে ৬ মাত্রা বা ৬ অক্ষরকে যতি চিহ্ন হিসেবে ভাগ করা হয়েছে কিন্তু শ্রুতিমধুর হচ্ছে না, কোথায় যেন ছন্দপতন ঘটছে। এর কারণ যদিও চিহ্ন ঠিক জায়গায় বসেনি তাই পর্ব ভাগ ঠিক হয়নি। এটা হবে নিম্নরূপ

"বসিয়া প্রভাতকালে | সেতারার দুর্গভালে..." ৮+৮

এবার শুনতে ঠিক মনে হচ্ছে, আর কোনো খটকা থাকছে না।

কবিতার প্রতি পর্বের গোড়াতেই একটা ঝোঁক পড়ে যেটা বাংলা ছন্দের

বৈশিষ্ট্য। যদিও কখনও কখনও কবিরা ঝোঁক থেকে শুরু না করে ঝোঁকের পর থেকে শুরু করেন। ছন্দ নির্ণয়ের জন্য তালি দিয়ে পড়া অত্যন্ত জরুরি। লয় বজায় রেখে নির্দিষ্ট সময় অন্তর হাতে তালি দিয়ে কবিতা পড়লে পর্ব ভাগ করতে সুবিধে হয়। কিন্তু অনেকে তাল থেকে শুরু করেন না, হীরেন চট্টোপাধ্যায় একে বলেছেন 'ফাঁক থেকে শুরু করা'। যেমন—

ভরা থাক | স্মৃতি সুধায় ৩+৪
বিদায়ের | পাত্রখানি। ৩+৪

প্রথম পর্ব ৩ মাত্রার, দ্বিতীয় পর্ব ৪ মাত্রার। অপূর্ণ পর্ব কখনও প্রথমে থাকতে পারে না। আর প্রথম পর্বে ঝোঁক দিয়ে পড়তেও অস্বস্তি হয়। যদি প্রথম পর্বের পূর্বে একটি অক্ষর থাকত তাহলে সুবিধে হত। হীরেন চট্টোপাধ্যায় উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন কীভাবে অক্ষর, যোগ করলে ছন্দ মিলে যায়—

থাক ভরা থাক | স্মৃতি সুধায় ৪+৪
আজ বিদায়ের | পাত্রখানি। ৪+৪

ছন্দ সুন্দর মিলে যায় যদি অক্ষর যোগ হয়। কিন্তু কবিগুরু ছন্দ ভুল করেননি। তিনি আসলে ঝোঁক থেকে শুরু না করে ফাঁক থেকে শুরু করেছেন। এতে বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়েছে ছন্দে। বাংলায় এরকম অনেক কবিতা রয়েছে যা ফাঁক থকে শুরু হয়েছে।

ছন্দ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে পর্ব ভাগ করে প্রথমে স্বরান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর বের করে নিতে হবে। তারপর লক্ষ করতে হবে কোনো পর্বে শুধু স্বরান্ত অক্ষর আছে কী না। সবসময়, সব কবিতায় না হলেও কোনো কোনো কবিতার চরণে, কোনো পর্বে শুধুই স্বরান্ত অক্ষর পাওয়া যায়। তিন রীতির ছন্দের ক্ষেত্রেই যেহেতু ছন্দের স্বরান্ত অক্ষর ১ মাত্রা, সুতরাং মাত্রা দিয়ে পর্বটির মোট মাত্রা সংখ্যা জেনে নিতে হবে। পূর্ণ পর্বের মাত্রা সংখ্যা সব ক্ষেত্রেই সমান হবে। সুতরাং সেই পর্ব অনুযায়ী বাকি পর্বগুলির মাত্রা স্থির করতে হবে। যদি দেখা যায়, কোনো পর্বে মাত্রা সংখ্যার চেয়ে অক্ষর সংখ্যা কম তখন ধরে নিতে হবে, ছন্দ হবে মাত্রাবৃত্ত কারণ ওই পর্বে নিশ্চিত কোনো না কোনো হলন্ত অক্ষর থাকবেই, আর ওই হলন্ত অক্ষরে ২ পূর্বোক্ত অক্ষরের মাত্রা সংখ্যার সঙ্গে তা সমান হবে।

যদি দেখা যায় সব পর্বের মাত্রা সংখ্যা, ওই সব স্বরান্ত অক্ষর থাকা পর্বের মাত্রা সংখ্যার সমান, তবে বুঝে নিতে হবে কবিতাটি অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। কেবলমাত্র পদান্ত স্থির হলন্ত অক্ষর এবং একক হলন্ত অক্ষরকে দুই মাত্রা দিলেই প্রত্যেক পর্বের মাত্রা সংখ্যা হবে।

যদি দেখা যায় ওই স্বরান্ত অক্ষর যুক্ত পর্বে যতগুলি মাত্রা, অন্য কোনো পর্বের অক্ষর সংখ্যা ওই মাত্রা সংখ্যার চেয়ে বেশি, তাহলে ধরে নিতে হবে কবিতাটি স্বরবৃত্ত ছন্দে রচিত। কারণ স্বরবৃত্ত ছন্দে প্রতিটি পর্বের মাত্রা সংখ্যা ৪। স্বরান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত বা হলন্ত অক্ষর নির্বিশেষে ১ মাত্রা দিলেই পর্বগুলির মাত্রা সংখ্যা সমান হবে। তবে ব্যতিক্রম আছে। স্বরবৃত্ত ছন্দে কখনও কোনো পর্বের মাত্রা সংখ্যা ৩ বা ৫ হতে পারে। পর্ব ঠিক করে তাই অক্ষর হিসেবে এই ভাবে মাত্রা নির্ণয় করতে হয়। অতিপর্ব যদি থাকে তবে তার মাত্রা সংখ্যা কম

হবে এবং তা পূর্ণ পর্বের মাত্রা সমতার ক্ষেত্রে অতিপর্ব গণ্য হবে না।

মাত্রা প্রদানের পদ্ধতি ও সমস্যা

১। "পথ বেঁধে দিল | বন্ধনহীন | গ্রন্থি ৬+৬+৩
আমরা দুজন | চলতি হাওয়ার | পন্থী।" ৬+৬+৩

এখানে কোনো স্বরান্ত অক্ষর সম্বলিত পর্ব নেই। যতি বা বিরাম অনুযায়ী পর্ব ভাগ করলে প্রথম পর্বে একক রুদ্ধ অক্ষরের অর্থাৎ 'পথ' ১ মাত্রা ধরলে পর্বটির মাত্রা সংখ্যা ৫ হয়, সুতরাং এটি স্বরবৃত্ত ছন্দ নয়। আবার 'পথ' ২ মাত্রা ধরলে পর্বটির মাত্রা সংখ্যা হয় ৬। সেক্ষেত্রে পর্ব সমতা আনার জন্য পরবর্তী 'বন্ধনহীন' পর্বে শুরুর হলন্ত অক্ষরে ২ মাত্রা দিতে হয়। সুতরাং সেটি অক্ষরবৃত্ত ছন্দের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী হয় না। তাছাড়া প্রথম চরণের প্রথম পর্বের দৃশ্য অক্ষর ৬ কিন্তু দ্বিতীয় পর্বের দৃশ্য অক্ষর ৫। সুতরাং সেটি অক্ষরবৃত্তের নিয়ম নয়। তাই এটি অক্ষরবৃত্ত ছন্দে নয়, মাত্রাবৃত্তে রচিত।

২। "আকাশ জুড়ে | ঢল নেমেছে | সূয্যি চলে | ছে ৪+৪+৪+১
চাঁচর চুলে | জলের গুড়ি | মুক্তো ফলে | ছে।" ৪+৪+৪+১

এখানে অক্ষরবৃত্ত ছন্দের নিয়মানুসারে অন্ত্য হলন্ত অক্ষর ২ মাত্রা ধরলে 'আকাশ জুড়ে' পর্বটির মাত্রা সংখ্যা হয় ৫ কিন্তু 'সূয্যি চলেছে' পর্বের মাত্রা সংখ্যা হয় ৪। বেজোড় সংখ্যা মাত্রা হওয়ার জন্য প্রথমেই ধরে নিতে হবে এটি অক্ষরবৃত্তের নিয়মানুযায়ী মাত্রা দিলে চরণ দুটির মাত্রা হয় ৫+৫+৫+১ হিসেবে। স্বাভাবিক ভাবেই মনে হতে পারে এটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। কিন্তু কবিতাটি ভাব গম্ভীর নয় আর এখানে অক্ষর সংখ্যা মাত্রা অপেক্ষা বেশি। সুতরাং এটি মাত্রাবৃত্তে নয়, স্বরবৃত্তে রচিত।

৩। "বর্ষার | নির্ঝর | অঙ্কিত | কায় ৪+৪+৪+২
দুই তীরে | গিরিমালা | কতদূর যায়।" ৪+৪+৪+২

এখানে 'গিরিমালা' পর্বটিতে সব স্বরান্ত অক্ষর রয়েছে সুতরাং পর্বটির মাত্রা সংখ্যা ৪। এবার বাকি পর্বগুলি যখন ৪ মাত্রার হবে তখন পর্ব সমতা রক্ষিত হবে। 'বর্ষার' ও 'নির্ঝর' পর্ব দুটিতে দুটো করে হলন্ত অক্ষর। স্বরবৃত্ত ছন্দের নিয়মানুযায়ী হলন্ত অক্ষরে ১ মাত্রা দিলে পর্ব দুটির মাত্রা সংখ্যা দাঁড়ায় ২। তাহলে বুঝে নিতে হবে যে এটি স্বরবৃত্ত ছন্দে রচিত নয়। যদি অন্ত্য হলন্ত অক্ষরে ২ মাত্রা দেওয়া হয় তাহলে পর্ব দুটির মাত্রা সংখ্যা হয় ৩। বেজোড় সংখ্যক মাত্রা অক্ষরবৃত্তে চলে না আর অক্ষরবৃত্তে পূর্ণ পর্বের মাত্রা সংখ্যা ৩ হয় না। সুতরাং সব হলন্ত অক্ষরে ২ মাত্রা দিলেই একমাত্র পর্ব সমতা রক্ষিত হবে। সুতরাং বুঝে নিতে হবে এটি মাত্রাবৃত্তে রচিত।

৪। "হৃদয়ক মৃগমদ | গীমক হার ৮+৭
দেহক সরবস | গেহক সার।" ৮+৭

এখানে প্রথম চরণের দুটি পূর্ণ পর্বের সব অক্ষরই স্বরান্ত। কিন্তু অক্ষরের সংখ্যায় সমতা নেই, একটিতে ৮ টি মাত্রা। পরের পর্বটি সাধারণ নিয়মে ৫ টি মাত্রা। দ্বিতীয় চরণের

প্রথম পর্বে ৭ মাত্রা ও পরের পর্বে ৫ মাত্রা। কোনো ছন্দের নিয়মেই যখন এটাকে বিশ্লেষণ করা যায় না তখন শরণাপন্ন হতে হয় প্রত্ন মাত্রাবৃত্ত ছন্দের। দীর্ঘস্বরে ২ মাত্রা দিলেই দুটি চরণের প্রথম পর্বের মাত্রা সংখ্যা দাঁড়ায় ৬ এবং পরের পর্বের মাত্রা সংখ্যা হয় ৭।

৫। "গোষ্ঠে যবে সন্ধ্যা নামে | শ্রান্ত দেহে স্বর্ণাঞ্চল টানি। ৮+১০
তুমি কোনো গৃহ প্রান্তে | নাহি জ্বাল সন্ধ্যা দীপ-খানি।।" ৮+১০

এই ক্ষেত্রে যদি 'গোষ্ঠে যবে' পর্বের দুটি হলন্ত অক্ষরে ২ মাত্রা দেওয়া হয় তাহলে পর্বটির মাত্রা সংখ্যা হয় ১০ এবং 'শ্রান্ত দেহে' পর্বটিতেও মাত্রা সংখ্যা দাঁড়ায় ১১ কিন্তু পরবর্তী চরণে একই ভাবে শুরুর হলন্ত অক্ষরে ২ মাত্রা দিলে পর্বটির মাত্রা সংখ্যা দাঁড়ায় ৯ এবং পরবর্তী পর্বের মাত্রা সংখ্যা হয় ১১। পর্বের মাত্রা সমতা এতে রক্ষিত হয় না। তাছাড়া কবিতাংশটিতে একটা সুরের তানও অনুভব করা যায়। লক্ষ করলে দেখা যায় প্রতি চরণেই যতগুলো দৃশ্য অক্ষর রয়েছে ততগুলোই মাত্রা হয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে এটি অক্ষরবৃত্তের রূপকল্প মহাপয়ারে রচিত।



আসুন জেনে নেই

অতিপর্ব— কখনও কখনও কোনো বাড়তি শব্দ চরণের শুরুতে কবিরা লেখেন এবং কবিতার ঝোঁকটা সেই শব্দের পর থেকে শুরু হয়। এই জাতীয় শব্দকে অতিপর্ব বলা হয়। ছন্দের সৌন্দর্যবৃদ্ধিতে অতিপর্বের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। অতিপর্বে ছন্দের কোনো নিয়ম থাকে না। অতিপর্বকে ছন্দ নির্ণয়ের থেকে বাদ রাখা যায়। যেমন—

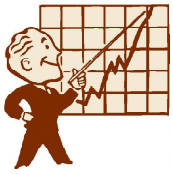
"আমি নিশি নিশি কত | রচিব শয়ন | ৬+৬
আকুল নয়নরে। ৭
কত নিতি নিতি বনে | করিব যতনে | ৬+৬
কুসুম চয়নরে।" ৭

এখানে 'আমি' বা 'কত' শব্দ দুটি ছন্দের অন্তর্ভুক্ত নয়। এটি ৬ মাত্রার ধ্বনিপ্রধান ছন্দে লেখা। 'আমি' বা 'কত' শব্দ দুটিকে ছন্দের পর্বে প্রবেশ করালে পর্বভাগ হবে নিম্নরূপ—

"আমি নিশি নিশি কত | রচিব শয়ন | ৬+৫+৩
কুসুম চয়নরে।" ৭

কত নিতি নিতি বনে | করিব যতনে | ৬+৫+৩
আকুল নয়নরে। ৭

কিন্তু ৬, ৫, ৩, ৭ এভাবে পর্ব হয় না। এতে ছন্দ পতন ঘটে। এক্ষেত্রে 'আমি' এবং 'কত' আসলে অতিপর্ব, যা ছন্দের অন্তর্ভুক্ত নয়।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন 'ক'

১। ছন্দ নির্ণয়ে পর্ববিভাগ মাত্রা প্রদানের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করুন। (১০০ শব্দের মধ্যে লিখুন)

৫.৪ ছন্দোলিপি

ছন্দোলিপি করা মানে ছন্দ ঠিক আছে কী না তা বিচার করে দেখা। কবিতার ছন্দ যদি ঠিক থাকে তাহলে নিয়মিত সময়ের পর ঝোঁক আসবেই। সেই ঝোঁক অনুযায়ী কবিতাটিকে ভাগ করে নিতে হয়। কবিতার লক্ষ বুঝে নিতে গেলে কবিতার ভাগ বোঝা জরুরি। গুরু গম্ভীর না কি হালকা চালের কবিতা, তা বুঝে নিলে লয় বুঝতে অসুবিধে হয় না। যে সমস্ত কবিতার চরণে একটা ধীর লয় বা ঘুমিয়ে পড়া ভাব অনুভব করা যায় তা অবশ্যই তানপ্রধান রীতির ছন্দ। যেমন—

"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি | সে আমার নয় ৮+৬
অসংখ্য বন্ধন মাঝে | মহানন্দময় ৮+৬
লভিব যুক্তির স্বাদ।" ৮

এটি তানপ্রধান রীতিতে লেখা হয়েছে। যদি হলন্ত অক্ষর মাত্রেই ২ মাত্রা প্রদান করা হত তাহলে পর্বের মাত্রা হত প্রথম চরণে ১০+৬ এবং দ্বিতীয় চরণে ১০+৭ এবং শেষ চরণে ৯। সুতরাং মাত্রা সমতা রক্ষিত হত না। আবার—

"আমি যদি | জন্ম নিতেম | কালিদাসের | কালে ৪+৪+৪+২
দৈবে হতেম | দশম রত্ন | নবরত্নের | মালে।" ৪+৪+৪+২

প্রথম চরণের প্রথম পর্বটিতে সম্পূর্ণ স্বরান্ত অক্ষর আছে এবং মাত্রা সংখ্যা ৪। সেই অনুযায়ী প্রত্যেকটি পর্বের মাত্রা ৪ নির্ধারণ করা হয়েছে। হলন্ত বা স্বরান্ত অক্ষর নির্বিশেষে ১ মাত্রা দেওয়া হয়েছে। এটি বেশি ঝোঁক থাকা, শ্বাসাঘাত থাকা চরণ। সুতরাং এটি স্বরবৃত্ত ছন্দে লেখা হয়েছে। কিন্তু

"হে মোর চিত্ত | পুণ্যতীর্থে | জাগোরে ধীরে। ৬+৬+৫
এই ভারতের | মহামানবের | সাগর তীরে।।"৬+৬+৫

এই ক্ষেত্রে প্রতিটি পর্বের সব হলন্ত অক্ষরেই ২ মাত্রা প্রদান করা হয়েছে। এবং বেশি ঝোঁক থাকলেও এটি বিলম্বিত লয়ের ছন্দ যা কানে শুনলেই বোঝা যায়।

মনে রাখতে হবে অক্ষরের মাত্রা না বসিয়ে প্রথমে ঝোঁক অনুযায়ী পর্ব ভাগ করে দেখে নিতে হবে কী ভাবে মাত্রা বসালে পূর্ণ পর্বের মাত্রা সংখ্যা সমান হবে। যেমন— রুদ্ধদ্বার শব্দের আক্ষরিক উচ্চারণ— রুদ ধ দ্বার অর্থাৎ তিনটি অক্ষর যার দুটো হলন্ত অক্ষর।

রুদ্ধদ্বার — ৪ মাত্রা ধরলে অক্ষরবৃত্ত ছন্দ

রুদ্ধদ্বার — ৫ মাত্রা ধরলে মাত্রাবৃত্ত ছন্দ

রুদ্ধদ্বার — ৩ মাত্রা ধরলে স্বরবৃত্ত ছন্দ

অনেকে হলন্ত অক্ষর এবং স্বরান্ত অক্ষরে চিহ্ন দিয়ে স্পষ্ট করার কথা বলেছেন। সেই ক্ষেত্রে হলন্ত অক্ষরের চিহ্ন '-' এবং স্বরান্ত অক্ষরে 'U' ব্যবহার করেছেন। চিহ্ন ব্যবহার করলে মাত্রা প্রদানে সুবিধে হয়। যেমন—

"সন্ধ্যাবেলার | খুশিটুকু | সকালবেলার | কাঁদা ৪+৪+৪+২

রইল হোথায় | নীরব হয়ে | কাদায় হল | কাদা।" ৪+৪+৪+২

ছন্দোলিপি প্রস্তুত করতে গেলে কিছু নিয়ম মেনে চলতে হয়—

- যতি অনুযায়ী পর্ব ভাগ দ্বারা এবং অক্ষরের মাথায় সঠিক মাত্রা বসানো।
- প্রতি পঙ্‌ক্তিতে কটা পূর্ণ পর্ব ও অপূর্ণ পর্ব আছে তা বলা।
- পূর্ণ পর্বের মাত্রা সংখ্যা বলা
- অপূর্ণ পর্বের মাত্রা সংখ্যা বলা
- মাত্রা অনুযায়ী পর্ব বিন্যাসের ছক জানানো
- লয়ের উল্লেখ দ্বারা
- ছন্দের রীতি জানানো
- স্তবক থাকলে, কটা তা জানানো
- ব্যতিক্রম থাকলে উল্লেখ, না থাকলে তা জানানো

উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বোঝানো যেতে পারে—

১। "কৃষ্ণকলি | আমি তারেই | বলি ৪+৪+২

কালো তারে | বলে গাঁয়ের | লোক।।" ৪+৪+১

ক. প্রতি চরণে দুটি পূর্ণ পর্ব এবং ১ টি অপূর্ণ পর্ব আছে

খ. পূর্ণ পর্বের মাত্রা সংখ্যা ৪

গ. অপূর্ণ পর্বের মাত্রা সংখ্যা ২ এবং ১

ঘ. মাত্রা অনুযায়ী পর্ব বিন্যাস— ৪+৪+২

৪+৪+১

ঙ. লয়- দ্রুত

চ. রীতি — স্বরবৃত্ত বা শ্বাসাঘাত প্রধান

ছ. স্তবক — ১ টি

জ. ব্যতিক্রম নেই

২। "সোনার জলে | দাগ পড়ে না | খোলে না কেউ | পাতা ৪+৪+৪+২

আস্বাদিত | মধু যেমন | যূথী অনাঘ্রাতা।" ৪+৪+৪+২

ক. প্রতি চরণে তিনটি পূর্ণ পর্ব এবং ১ টি অপূর্ণ পর্ব আছে

খ. পূর্ণ পর্বের মাত্রা সংখ্যা ৪

গ. অপূর্ণ পর্বের মাত্রা সংখ্যা ২

ঘ. মাত্রা অনুযায়ী পর্ব বিন্যাস— ৪+৪+৪+২
৪+৪+৪+২

ঙ. লয়- দ্রুত

চ. রীতি — স্বরবৃত্ত

ছ. স্তবক — ১ টি

জ. ব্যতিক্রম নেই

লক্ষণীয় অনাঘ্রাতা শব্দটিকে ঝোঁক অনুযায়ী বিশ্লিষ্ট করে পর্ব ভাগ করা হয়েছে।

৫.২ ছন্দোলিপি : তিন রীতির ছন্দে

ছন্দোলিপি কীভাবে প্রস্তুত করতে হয় তা ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এবারে তিন রীতির ছন্দ থেকে ছন্দোলিপি তৈরি করে দেখানো হবে। শুধু স্বরবৃত্ত, অক্ষরবৃত্ত বা মাত্রাবৃত্ত ছন্দ থেকে নয়, কিছু সদ্য ছন্দের দৃষ্টান্ত দিয়ে ছন্দোলিপি প্রস্তুত করা হবে। সেখানে ব্যতিক্রম থাকবে, সেই ব্যতিক্রমের ক্ষেত্রে ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে ব্যাখ্যা করে বোঝানো হবে।

স্বরবৃত্ত ছন্দের দৃষ্টান্ত

১। ঘৃণা করুন | যে লোক ঢাকে ৪+৪
শুধুই বল | ছি ছি ৪+২
আবার তুমি | কেন তাকে ৪+৪
ডাকলে মিছি | মিছি ৪+২

২। দ্যাখো দ্যাখো | আজকে যেন | শ্রাবণ পূর্ণিমায় ৪+৪+৪+১
সোনার বালা | আটকে আছে | নীল আকাশের | গায় ৪+৪+৪+১

ক. প্রথম ও তৃতীয় চরণে ৩ টি করে পূর্ণ পর্ব এবং ১ টি অপূর্ণ পর্ব আছে।

খ. পূর্ণ পর্বের মাত্রা সংখ্যা ৪

গ. অপূর্ণ পর্বের মাত্রা সংখ্যা ১

ঘ. মাত্রা অনুযায়ী পর্ব বিন্যাস— ৪+৪+৪+১
৪+৪+৪+১

ঙ. লয় — দ্রুত

চ. রীতি — স্বরবৃত্ত

ছ. স্তবক — ১টি

জ. ব্যতিক্রম নেই

৩। নিম খাওয়ালে | তিত বলে | কথায় করে | ছলো ৪+৪+৪+২
মিঠার লোভে | তিত মুখে | সারা দিনটা | গেল।। ৪+৪+৪+২

ক. দুটি চরণেই ৩ টি করে পূর্ণ পর্ব এবং ১ টি অপূর্ণ পর্ব আছে।
খ. পূর্ণ পর্বের মাত্রা সংখ্যা ৪
গ. অপূর্ণ পর্বের মাত্রা সংখ্যা ২
ঘ. মাত্রা অনুযায়ী পর্ব বিন্যাস— ৪+৪+৪+২
৪+৪+৪+২
ঙ. লয় — দ্রুত
চ. রীতি — স্বরবৃত্ত
ছ. স্তবক — ১টি
জ. ব্যতিক্রম নেই

অক্ষরবৃত্ত ছন্দের দৃষ্টান্ত

১। সুখের শিশির কাল | সুখে পূর্ণ ধরা ৮+৬
এত ভঙ্গ বঙ্গ দেশ | তবু রঙ্গ ভরা। ৮+৬

ক. প্রত্যেক চরণে ১ টি করে পূর্ণ ও ১ টি অপূর্ণ পর্ব আছে।
খ. পূর্ণ পর্বের মাত্রা সংখ্যা ৮
গ. অপূর্ণ পর্বের মাত্রা সংখ্যা ৬
ঘ. মাত্রা অনুযায়ী পর্ব বিন্যাস— ৮+৬
৮+৬
ঙ. লয় — ধীর
চ. রীতি — অক্ষরবৃত্ত (পয়ার)
ছ. স্তবক — ১টি
জ. ব্যতিক্রম নেই

২। ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিল | ঈশ্বরী পাটনী। ৮+৬
একা দেখি কুলবধু | কে বট আপনি।। ৮+৬

ক. প্রত্যেক চরণে ১ টি করে পূর্ণ ও ১ টি অপূর্ণ পর্ব আছে।
খ. পূর্ণ পর্বের মাত্রা সংখ্যা ৮
গ. অপূর্ণ পর্বের মাত্রা সংখ্যা ৬
ঘ. মাত্রা অনুযায়ী পর্ব বিন্যাস— ৮+৬
৮+৬
ঙ. লয় — ধীর
চ. রীতি — অক্ষরবৃত্ত (পয়ার)

ছ. স্তবক — ১টি

জ. ব্যতিক্রম নেই

৩। শীর্ণ শান্ত সাধু তব | পুত্রদের ধরে। ৮+৬
দাও সবে গৃহ ছাড়া | লক্ষ্মীছাড়া করে।। ৮+৬

ক. প্রত্যেক চরণে ১ টি করে পূর্ণ ও ১ টি অপূর্ণ পর্ব আছে।

খ. পূর্ণ পর্বের মাত্রা সংখ্যা ৮

গ. অপূর্ণ পর্বের মাত্রা সংখ্যা ৬

ঘ. মাত্রা অনুযায়ী পর্ব বিন্যাস-- ৮+৬
৮+৬

ঙ. লয় — ধীর

চ. রীতি — অক্ষরবৃত্ত (পয়ার)

ছ. স্তবক — একটি

জ. ব্যতিক্রম নেই

৪। পৃথিবীর সব ঘুঘু | ডাকিতেছে হিজলের বনে ৮+১০
পৃথিবীর সব রূপ | লেগে আছে ঘাসে ৮+৬
পৃথিবীর সব প্রেম | আমাদের দুজনার মনে। ৮+১০

ক. প্রথম ও তৃতীয় চরণে ২ টি করে পূর্ণ পর্ব, দ্বিতীয় চরণে ১ টি পূর্ণ ও ১ টি অপূর্ণ পর্ব আছে।

খ. পূর্ণ পর্বের মাত্রা সংখ্যা ৮ ও ১০

গ. অপূর্ণ পর্বের মাত্রা সংখ্যা ৬

ঘ. মাত্রা অনুযায়ী পর্ব বিন্যাস-- ৮+১০
৮+৬
৮+১০

ঙ. লয় — ধীর

চ. রীতি — অক্ষরবৃত্ত (মহাপয়ার)

ছ. স্তবক — একটি

জ. ব্যতিক্রম নেই

মাত্রাবৃত্ত ছন্দের দৃষ্টান্ত

১। **চতুর্মাত্রিক**

খ্যাতি আছে | সুন্দরী | বলে তার ৪+৪+৪
ত্রুটি ঘটে নুন দিতে ঝোলে তার। ৪+৪+৪
চিনি কম | পড়ে বটে | পায়সে ৪+৪+৩
স্বামী তবু | মুখ বুজে | খায় সে। ৪+৪+৩

ক. প্রথম ও দ্বিতীয় চরণে ১ টি পূর্ণ পর্ব, তৃতীয় ও চতুর্থ চরণে ১ টি পূর্ণ ও ১ টি অপূর্ণ পর্ব আছে।

খ. পূর্ণ পর্বের মাত্রা সংখ্যা ৪

গ. অপূর্ণ পর্বের মাত্রা সংখ্যা ৩

ঘ. মাত্রা অনুযায়ী পর্ব বিন্যাস-- ৪+৪+৪
৪+৪+৪
৪+৪+৩
৪+৪+৩

ঙ. লয় — বিলম্বিত

চ. রীতি — মাত্রাবৃত্ত

ছ. স্তবক — একটি

জ. ব্যতিক্রম নেই

২। **পঞ্চমাত্রিক**

দুপুর গেল | বিকেল হল | সারা ৫+৫+২
গোপনে ফোটে | একটি দুটি | তারা ৫+৫+২

ক. প্রথম ও দ্বিতীয় চরণে ২ টি পূর্ণ পর্ব ও ১ টি অপূর্ণ পর্ব আছে।

খ. পূর্ণ পর্বের মাত্রা সংখ্যা ৫

গ. অপূর্ণ পর্বের মাত্রা সংখ্যা ২

ঘ. মাত্রা অনুযায়ী পর্ব বিন্যাস— ৫+৫+২
৫+৫+২

ঙ. লয় — বিলম্বিত

চ. রীতি — মাত্রাবৃত্ত

ছ. স্তবক — একটি

জ. ব্যতিক্রম নেই

৩। **ষষ্ঠমাত্রিক**

কথা হয়েছিল | সাদা তিন বুড়ি ৬+৬
সাবেক কালের | প্রথায়। ৬+৩
সব দিক এত | চুপচাপ কেন ৬+৬
সেই ছেলে গুলো | কোথায়। ৬+৩

ক. প্রথম ও তৃতীয় চরণে ২ টি করে পূর্ণ পর্ব, দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণে ১ টি পূর্ণ ও ১ টি অপূর্ণ পর্ব আছে।

খ. পূর্ণ পর্বের মাত্রা সংখ্যা ৬

গ. অপূর্ণ পর্বের মাত্রা সংখ্যা ৩

ঘ. মাত্রা অনুযায়ী পর্ব বিন্যাস-- ৬+৬
৬+৩
৬+৬
৬+৩

ঙ. লয় — বিলম্বিত

চ. রীতি — মাত্রাবৃত্ত

ছ. স্তবক — একটি

জ. ব্যতিক্রম নেই

৪। **সপ্তমাত্রিক**

বেলা যে পড়ে এল | জলকে চল ৭+৫
পুরানো সেই সুরে | কে যেন ডাকে দূরে ৭+৭
কোথা সে ছায়াসখী | কোথা সে জল। ৭+৫

ক. প্রথম ও তৃতীয় চরণে ১ টি পূর্ণ ও ১ টি অপূর্ণ পর্ব, দ্বিতীয় চরণে ২ টি পূর্ণ পর্ব আছে।

খ. পূর্ণ পর্বের মাত্রা সংখ্যা ৭

গ. অপূর্ণ পর্বের মাত্রা সংখ্যা ৫

ঘ. মাত্রা অনুযায়ী পর্ব বিন্যাস-- ৭+৫
৭+৭
৭+৫

ঙ. লয় — বিলম্বিত

চ. রীতি — মাত্রাবৃত্ত

ছ. স্তবক — একটি

জ. ব্যতিক্রম নেই

৫। **অষ্টমাত্রিক**

প্রিয় ফুল খেলবার | দিন নয় অদ্য ৮+৭
ধ্বংসের মুখোমুখি | আমরা ৮+৩
চোখে আর স্বপ্নের | নেই নীল মদ্য ৮+৭
কাঠ ফাটা রোদ সেকে | চামড়া। ৮+৩

ক. প্রথম ও তৃতীয় চরণে ২ টি করে পূর্ণ পর্ব, দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণে ১ টি পূর্ণ ও ১ টি অপূর্ণ পর্ব আছে।

খ. পূর্ণ পর্বের মাত্রা সংখ্যা ৮ ও ৭

গ. অপূর্ণ পর্বের মাত্রা সংখ্যা ৩

ঘ. মাত্রা অনুযায়ী পর্ব বিন্যাস— ৮+৭
৮+৩
৮+৭
৮+৩

ঙ. লয় — বিলম্বিত
চ. রীতি — মাত্রাবৃত্ত
ছ. স্তবক — একটি
জ. ব্যতিক্রম নেই

* উপর্যুক্ত কবিতাংশটিকে নিম্নরূপেও পর্ব বিভাজন করা যায়—

প্রিয় ফুল | খেলবার | দিন নয় | অদ্য ৪+৪+৪+৩
ধ্বংসের | মুখোমুখি | আমরা ৪+৪+৩
চোখে আর | স্বপ্নের | নেই নীল | মদ্য ৪+৪+৪+৩
কাঠ ফাটা | রোদ সেকে | চামড়া। ৪+৪+৩

চার মাত্রার পর্ব বিভাজন দেখে ও চলন দেখে এটাকে স্বরবৃত্ত বলে ভুল করার সম্ভাবনা থেকে যায় কিন্তু হলন্ত অক্ষরে ২ মাত্রা দিয়ে পর্বের মাত্রা ৪ হয়েছে এবং পর্ব সমতা রক্ষিত হয়েছে এটা মনে রাখতে হবে।

৬। জনগণ মন অধি | নায়ক জয়হে ৮+৮
ভারত ভাগ্য বি | ধাতা ৮+৩
পঞ্জাব সিন্ধু | গুজরাট মারাঠা ৮+৮
দ্রাবিড় উৎকল | বঙ্গ। ৮+৩

প্রথম পদ্ধতি

ক. প্রথম ও তৃতীয় চরণে ২ টি করে পূর্ণ পর্ব, দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণে ১ টি পূর্ণ ও ১ টি অপূর্ণ পর্ব আছে।
খ. পূর্ণ পর্বের মাত্রা সংখ্যা ৮
গ. অপূর্ণ পর্বের মাত্রা সংখ্যা ৩
ঘ. মাত্রা অনুযায়ী পর্ব বিন্যাস— ৮+৮
৮+৩
৮+৮
৮+৩

ঙ. লয় — বিলম্বিত
চ. রীতি — মাত্রাবৃত্ত
ছ. স্তবক — একটি
জ. ব্যতিক্রম নেই। অনেকটা প্রাচীন মাত্রাবৃত্ত বা প্রত্ন মহাবৃত্তের নিয়মানুসারে ছন্দের পর্বে মাত্রা সমতা আনার জন্য দীর্ঘ স্বরে স্থানবিশেষে ২ মাত্রা ধরা হয়েছে।

দ্বিতীয় পদ্ধতি— এভাবেও ছন্দোলিপি প্রস্তুত করা যায়—

ক. পর্ব — অষ্টমাত্রিক

খ. চরণ — দ্বিপর্বিক

গ. স্তবক — সমপদী

ঘ. রীতি — মাত্রাবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধান

ঙ. লয় — বিলম্বিত



আসুন জেনে নিই

ছন্দোলিপিতে কীভাবে লিখতে হয় তা ড. অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় একটু ভিন্ন ভাবে দেখিয়েছেন। দৃষ্টান্ত দিয়ে তাঁর লেখার পদ্ধতি নিম্নে দেওয়া হল—

১। দিনের শেষে | ঘুমের দেশে | ঘোমটা পরা | ঐ ছায়া ৪+৪+৪+৩

ভুলালরে | ভুলাল মোর | প্রাণ ৪+৪+১

ক. পর্ব — চতুর্মাত্রিক (চারটি মাত্রার)

খ. চরণ — চতুষ্পর্বিক ও ত্রিপর্বিক (চার পর্ব ও তিন পর্ব)

গ. স্তবক — অসমপদী ২ চরণ

ঘ. রীতি — স্বরবৃত্ত বা শ্বাসাঘাত প্রধান

ঙ. লয় — দ্রুত

২। বিপুলা এ পৃথিবীর | কতটুকু জানি ৮+৬

দেশে দেশে কতনা ন | গর রাজধানী। ৮+৬

ক. পর্ব — ৮ ও ৬ মাত্রার পূর্ণ পর্ব

খ. চরণ — দুই পর্বের

গ. স্তবক — ২ চরণ

ঘ. রীতি — অক্ষরবৃত্ত বা তান প্রধান

ঙ. লয় — ধীর

৩। নন্দলাল তো | একদা একটা | করিল ভীষণ পণ। ৬+৬+৬+২

স্বদেশের তরে | যা করেই হোক | রাখিবেই সে জী | বন।। ৬+৬+৬+২

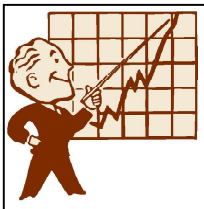
ক. পর্ব — ষাণ্মাত্রিক

খ. চরণ — চতুষ্পর্বিক

গ. স্তবক — সমপদী ২ চরণ

ঘ. রীতি — মাত্রাবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধান প্রধান

ঙ. লয় — বিলম্বিত



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন 'খ'

১। ছন্দোলিপি প্রস্তুত করুন—

জনগণ মন অধিনায়ক জয়হে
ভারত ভাগ্যবিধাতা
পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা
দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ।



৫.৫ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

- ছন্দ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে স্বরান্ত ও হলন্ত অক্ষর সম্পর্কে ধারণা থাকতেই হবে।
- যে শব্দের শেষে স্বর থাকে তা-ই স্বরান্ত এবং সেই অক্ষরকে ১ মাত্রা ধরা হয়।
- যে শব্দের শেষে ব্যঞ্জনবর্ণ বা হস্ যুক্ত শব্দ থাকে তাই ব্যঞ্জনান্ত শব্দ। অনেক সময় হস্ যুক্ত শব্দ উচ্চারণের ক্ষেত্রে থাকে। তিন রীতির ছন্দ অনুযায়ী হলন্ত অক্ষরে মাত্রা প্রদান করা হয়।
- কবিতা থেমে থেমে পাঠ করে যতি চিহ্ন অনুযায়ী পর্ব ভাগ করতে হয়।
- যদি কোনো পর্বে সব স্বরান্ত অক্ষর থাকে, সেই পর্বের মাত্রা সংখ্যার সাথে বাকি পর্বের মাত্রা সমান করে নিলেই ছন্দ নির্ণয় সম্ভব।
- অতিপর্ব থাকলে তাকে পর্বের ভিতর না ধরে পর্ব ভাগ করলে ছন্দ নির্ণয়ে সুবিধে হয়।
- পর্বের মাত্রা সংখ্যা যদি জোড় সংখ্যক হয় এবং সুরের তান থাকে তবে তা অবশ্যই তানপ্রধান ছন্দ।
- পর্বের মাত্রা সংখ্যা যদি বেজোড় সংখ্যক হয় তবে তা অবশ্যই মাত্রাবৃত্ত ছন্দ। তবে মাত্রাবৃত্তে জোড় সংখ্যক পর্বও থাকে সে ক্ষেত্রে হলন্ত অক্ষরের মাত্রা ধরে বিচার করতে হয়।
- ছন্দোলিপি অর্থাৎ ছন্দ ঠিক আছে কী না তা দেখা। সেটা ছন্দোলিপি প্রস্তুত করে বোঝা যায়।



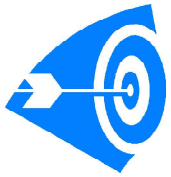
৫.৬ অতিরিক্ত পঠন

কামিল্যা, অধ্যাপক মিহির চৌধুরী (২০১০); বাংলা ছন্দ : রূপ ও রীতি; কলকাতা : গ্রন্থতীর্থ
চট্টোপাধ্যায়, হীরেন (২০০২); ছন্দের ক্লাস; কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ
ভট্টাচার্য, পরেশচন্দ্র (২০০৪); ছন্দ মীমাংসা ও অলংকার সমীক্ষা; কলকাতা : জয়দুর্গা প্রা: লি:

মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅমূল্যধন (১৯৫৭); বাংলা ছন্দের মূলসূত্র; কলকাতা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

সেন, নীলরতন (১৯৮০); আধুনিক বাংলা ছন্দ; কলকাতা : দে'জ

সেন, প্রবোধচন্দ্র (২০২০); নূতন ছন্দ-পরিক্রমা; কলকাতা : দে'জ



৫.৭ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত

(ক) ১। ছন্দ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সবচাইতে প্রথমে দরকার যিনি নির্ণয় করছেন তার ছন্দবোধ। ছন্দ আসলে চোখে দেখা ব্যাপার নয়,... (৫ নং অধ্যায়ের ৫.১ অংশ দ্রষ্টব্য)

(খ) "জনগণ মন অধিনায়ক জয়হে
ভারত ভাগ্যবিধাতা
পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা
দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ।" (৫ নং অধ্যায়ের ৫.২ অংশ দ্রষ্টব্য)



৫.৮ আদর্শ প্রশ্নবলি

১। তিন জাতীয় ছন্দ দৃষ্টান্ত দিয়ে বাংলা ছন্দ বৈচিত্র্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে মাত্রা ও পর্বের ভুমিকা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২। ধ্বনিপ্রধান ছন্দের মাত্রা বিচার পদ্ধতি সম্পর্কে লিখুন।

৩। স্বরবৃত্ত ছন্দের মাত্রা বিচার পদ্ধতির পার্থক্য উদাহরণ সহযোগে আলোচনা করুন।

৪। ছন্দোলিপি প্রস্তুত করুন :

ক. কাক কালো কোকিল কালো কালো ফিঙের বেশ
তাহার অধিক কালো কন্যে তোমার চিকন কেশ।

খ. দূর হৈতে ফুল্লরা বীরের পাল্য সাড়া।
সম্ভ্রমে বসিতে দিল হরিণের ছড়া।।

গ. মনে রেখো বড় মাপে করা চাই আয়োজন।
কলেবর খাটো নয় তিন মন প্রায় ওজন।।

ঘ. বল বল বল সবে
শত বীণা বেণু রবে
ভারত আবার জগৎ সভায়
শ্রেষ্ঠ আসন লবে।

অধ্যায় ৬ : বাংলা অলংকার পরিচয়-১

অধ্যায় বিন্যাস

৬.১ জ্ঞাতব্য বিষয়
৬.২ পরিচিতি
৬.৩ বাংলা অলংকারের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য
৬.৪ অলংকারের প্রকারভেদ
৬.৫ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত
৬.৬ অধ্যায়টি পাঠ করে কী শিখলাম
৬.৭ অতিরিক্ত পঠন
৬.৮ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৬.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই অধ্যায়টি পড়ে আপনি—

- বাংলা অলংকারের প্রকারভেদ সম্পর্কে জানবেন।
- অলংকার প্রয়োগে বাংলা কবিতায় কীভাবে সৌন্দর্য সৃষ্টি হয় তা জানবেন।
- বিভিন্ন প্রকার অলংকারের উদাহরণসহ পরিচয় জানবেন।

৬.২ পরিচিতি

অলংকার বলতে বোঝায় ভূষণ বা গহনা যা পরিধান করলে মানবদেহে সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ অলংকার সৌন্দর্যবর্ধক। ঠিক তেমনি কাব্যদেহে যা সৌন্দর্যবৃদ্ধি করে তাকে বলে অলংকার। বাক্যে কতটুকু অলংকার প্রয়োগ করলে তা কাব্য হবে বা শুধু অলংকার প্রয়োগেই কি বাক্য কাব্য হয়ে ওঠে সে নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেছেন আলংকারিকগণ। বামন 'কাব্যংগ্রহ্যমলংকারাৎ' বলার পরও 'সৌন্দর্যমলংকারঃ' বলে তাঁর বাক্য শেষ করেছেন। অর্থাৎ তাঁর মতে সৌন্দর্য সৃষ্টিই অলংকারের মূল কথা। এই অলংকার সহজাত। যেহেতু শব্দ ও অর্থ কাব্যদেহ গঠন করে তাই এই অঙ্গদুটিকে সাজসজ্জায় সজ্জিত করাই অলংকার। সেদিক থেকে অলংকারকে তাই দুভাগে ভাগ করা হয়—শব্দালংকার ও অর্থালংকার। শব্দালংকারে শব্দের প্রাধান্য, শব্দকে পরিবর্তিত করা যায় না। অর্থালংকারে শব্দের অর্থের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সেখানে শব্দের সমার্থক অন্য শব্দ বসালেও অলংকার বিনষ্ট হয় না।

৬.৩ বাংলা অলংকারের সংজ্ঞা

অলংকার শব্দের আভিধানিক অর্থ (অলম্-কৃ(করা)+ঘঞ+ণ) আভরণ বা ভূষণ,

অর্থাৎ যা দিয়ে মানব দেহকে সাজ সজ্জায় সজ্জিত করা হয়। ঠিক একইভাবে কাব্য দেহকে সাজিয়ে তোলা যায় অলংকার ব্যবহার করে। তবে ইংরেজিতে figure of speech বা Rhetoric শব্দটি যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, বাংলায় অলংকার বলতে ততটুকুই বোঝায় অর্থাৎ অনুপ্রাস, উপমা, শ্লেষ আদি অলংকারের আলোচনাই বোঝায়। আচার্য দণ্ডীও তাঁর 'কাব্যাদর্শ' গ্রন্থে বলেছেন-'কাব্যশোভাকরান্ ধর্মানলঙ্কারান্ প্রচক্ষতে'। অর্থাৎ কাব্যের শোভাকর ধর্মকেই অলংকার বলা হয়। বোঝা যাচ্ছে অনুপ্রাস, উপমাদি অলংকার তাঁর উদ্দীষ্ট নয়, কাব্যের গুণ, রীতি, বৃত্তি আদি যাবতীয় সৌন্দর্য সম্পাদক উপাদানই তার উদ্দিষ্ট। এই সৌন্দর্য সৃষ্টির জন্য কবিকে দোষ বর্জন করে, গুণকে গ্রহণ করতে হয়। সেজন্য বলা হয়েছে—"স খলু অলঙ্কারঃ দোষহনাৎ গুণালঙ্কারাবাদানাৎ চ সম্পাদ্যঃ কবে"। তবে সাধারণ অর্থে কাব্যে শোভাবর্ধনকারী বস্তুই অলংকার বা কাব্যদেহের শোভাকর ধর্মই অলংকার।



অসুন জেনে নিই

১। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় অলংকারের সংজ্ঞায় বলেছেন— "যে গুণ দ্বারা ভাষার শক্তিবর্ধন ও সৌন্দর্য সম্পাদন হয়, তাকে অলংকার বলে।"

২। ড. শুদ্ধস্বত্ব বসুর মতে, "অলংকার শব্দের একটা ব্যাপক অর্থ আছে যার দ্বারা রস, রীতি ধ্বনি, গুণ, ক্রিয়া, অনুপ্রাস, উপমা, বিরোধ, বক্রোক্তি প্রভৃতিকে বোঝায়, কারণ কাব্যসৌন্দর্য বলতে এগুলোকে অবশ্যই ধরতে হবে।"

কোন গুণে একটি বাক্য কাব্য হয়ে ওঠে তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। আলংকারিকগণ কাব্যের এক একটি ধর্মের উপর জোর দিয়েছেন। তবে যে গুণটির কথা মোটামুটিভাবে সব আলংকারিকগণ মেনে নিয়েছেন তা হল রস। 'রসাত্মকং কাব্যম্' — অর্থাৎ রসাত্মক বাক্যই কাব্য। কাব্যের রসের স্থান সর্বোচ্চ। কিন্তু অন্যান্য ধর্মগুলিকে অস্বীকার করা যায় না। যেমন— রীতি। অনেকে রীতি বা style-এর উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কেউ ধ্বনির উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁদের মতে কাব্যের আত্মা ধ্বনি। অপর মত হল কাব্যের আত্মা বক্রোক্তি। কিন্তু দেহাত্মবাদী আলংকারিকদের মতে কাব্যের আত্মা অলংকার। অর্থাৎ অলংকার ছাড়া কাব্য হতে পারে না। অঙ্গের সাজ-সজ্জা অলংকার রূপে পরিগণিত হলেও আচার্য বামন এত স্থূল অর্থে অলংকার শব্দটিকে ব্যবহার করেননি। তিনি মূল দেহের লাবণ্যের প্রসঙ্গে অলংকার শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এই লাবণ্যই নারী দেহের মতো কাব্যদেহেও সৌন্দর্য সঞ্চার করে।

অলংকার শব্দটির অর্থ ভূষণ বা গহনার দ্বারা দেহের শোভাবর্ধন শুধু নয় কাব্যদেহের অর্থ-সামর্থ্য বৃদ্ধি করাও অলংকারের কাজ। কাব্যদেহে ঔচিত্য অনুসারে অলংকার প্রয়োগ করলে তা সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। রমণী দেহে অলংকার আরোপ করলে তা সরিয়ে নেওয়া যায়

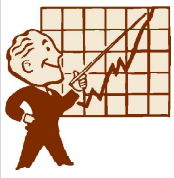
কিন্তু কাব্যদেহে অলংকার দিলে তা বিচ্ছিন্ন করা চলে না। শুধু সহজাত নয় কাব্যের অলংকার হবে সহজ ও স্বাভাবিক এবং আনন্দবর্ধনের মতানুসারে 'অপৃথগযত্ননির্বর্ত্য'। জোর করে যে অলংকার প্রয়োগ করা হয় তাতে কাব্যের রসভঙ্গ হয়।

উদাহরণ দিয়ে বিষয়টিকে বোঝানো যেতে পারে। আমরা যখন বলি 'জবা ফুটে আছে', তখন বুঝতে পারি এখানে জবা ফুল ফুটে থাকার কথা বলা হয়েছে কিন্তু এই বাক্যটিকেই যদি আমরা এভাবে লিখি— 'রক্তের মতো রাঙা জবা ফুটে আছে' তাহলে 'রক্তের মতো রাঙা' অংশটি যখন 'জবা ফুটে আছে' অংশের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল তখন বাক্যের অর্থটি পরিবর্তিত হল এবং বাক্যটিকে আরও সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তুলল। 'রক্তের মতো রাঙা' অংশটি দিয়ে বাক্যটিকে সাজানো হয়েছে। এভাবেই যার দ্বারা কোনো বাক্য বা পদ্যের চরণকে সাজানো বা অলংকৃত করা হয় তাকেই বলে কাব্যালংকার। আবার,

"মধুহীন করুন না গো তব মনঃ কোকনদে।"

এই চরণ 'মধু' শব্দের দুটো অর্থ আছে। প্রথম অর্থে 'মউ' বা 'মধু' বোঝানো হয়েছে, দ্বিতীয় অর্থে 'মধু' বলতে মাইকেল মধুসূদন দত্তকে বোঝানো হয়েছে। তাহলে চরণটির অর্থ দাঁড়াচ্ছে— (১) তোমার মনপদ্ম থেকে মধুকে বাদ দিয়ো না। (২) কবি মধুসূদন দত্তকে বিদ্যাদেবী যেন ভুলে না যান। তাঁর মনঃ কোকনদে স্থান দেন। এভাবে মধু শব্দ প্রয়োগের মধ্য দিয়ে চরণটিতে সৌন্দর্য সৃষ্টি করা হয়েছে। 'রক্তের মতো রাঙা' বাক্যটিতে অর্থের উপর জোর দেওয়া হয়েছে কিন্তু দ্বিতীয় উদাহরণে 'মধু' শব্দের উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

এই শব্দ ও অর্থই কাব্যদেহ নির্মাণ করে। সুতরাং বলা চলে কাব্যদেহের অঙ্গ শব্দ ও অর্থকে সাজ-সজ্জায় সজ্জিত করার নামই অলংকার। শব্দ ও অর্থকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠে, সুতরাং অলংকার উভয়ের উপর ক্রিয়াশীল। অলংকারের সাহায্যে ভাষা একদিকে যেমন দৈহিক দিক থেকে শোভন সুন্দর হয়ে ওঠে, অন্যদিকে তেমনি ভাষার শক্তি ও অর্থসামর্থ্য বৃদ্ধি পায় এবং ভাষার মধ্যে কল্পনার ক্রিয়াও পরিস্ফুট হয়। তবে মনে রাখতে হবে শব্দ ও অর্থ দ্বারা বাক্যের বহিরঙ্গকেই অলংকৃত করা চলে। একেই বলা হয় বাচ্যালংকার। বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে যে অলংকারের কথা বলা হয় তা বাচ্যালংকারেই সীমাবদ্ধ। অলংকার শাস্ত্রে যে রসধ্বনির কথা বলা হয়েছে তা বাচ্যার্থকে অতিক্রম করে ব্যঞ্জিত অর্থকে প্রকাশ করে।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

১। কাব্যে সৌন্দর্য সৃষ্টিকে অলংকারের মূল উদ্দেশ্য বলা যায় কী? (১০০ শব্দের মধ্যে লিখুন)

৬.৪ অলংকারের প্রকারভেদ

রসাত্মক বাক্যই কাব্য। এই বাক্যের দুটি রূপ-একটি তার বর্ণিল দেহ এবং অন্যটি তার অর্থময় রূপ। প্রথমটির আবেদন যদি হয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তবে অন্যটির আবেদন আমাদের বোধের জগতে। ড. অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ের মতে এই শব্দ ও অর্থের মধ্যে "একটি concrete, অপরটি abstract" শব্দ বা দেহকে ধ্বনির মাধ্যমে উপলব্ধি করতে হয়। সৌন্দর্য অনুযায়ী অলংকারকে অনেক আলংকারিক তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন-বহিরঙ্গ অলংকার, অন্তরঙ্গ অলংকার এবং মিত্র অলংকার। তবে একথা তাঁরা স্বীকার করেছেন যে প্রচলিত রীতিতে এই বিভাগ বর্জিত হয়েছে। বর্তমানে শব্দ ও অর্থের ভিত্তিতে তাই অলংকারকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে—শব্দালংকার ও অর্থালংকার।

শব্দালংকার

শব্দালংকার আসলে ধ্বনির অলংকার। অর্থবহ ধ্বনি সমষ্টিকে বলা হয় শব্দ। শব্দের অন্তর্গত ধ্বনিকে আশ্রয় করে বা শব্দের বারংবার আবৃত্তিতে যে ধ্বনি ঝংকার ওঠে, তাকে আশ্রয় করে শব্দালংকার সৃষ্টি হয়; এবং যা শ্রুতি সৌকর্য বিষয়ক তাকেই বলা হয় শব্দালংকার। এই ধ্বনি আবার কখনও পদধ্বনি, কখনও বর্ণধ্বনি, আবার কখনও বাক্যধ্বনি। এই অলংকারটি একান্তভাবেই শব্দের ধ্বনি সুষমার উপর নির্ভরশীল বলে শব্দের পরিবর্তন এ সইতে পারে না। যেমন "বাঘের বিক্রমসম মাঘের হিমানী"— বাক্যে প্রথম দুটি শব্দের আদিতে 'ব' ধ্বনি আছে এবং বাকি শব্দগুলিতে 'ম' ধ্বনি আছে। 'বাঘের' ও 'মাঘের' শব্দে 'আঘের' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে বলেই এক শ্রুতিসুখকর প্রতিক্রিয়া মনে তৈরি হয়। একেই অলংকার বলে। এখানে 'মাঘের' শব্দের পরিবর্তে যদি 'শীতের' শব্দ ব্যবহার করা হত তাহলে অর্থের দিক থেকে হয়তো তেমন কোনো পার্থক্য হত না কিন্তু সৌন্দর্য নষ্ট হত অর্থাৎ অলংকারটি নষ্ট হয়ে যেত। কারণ উদাহরণে যে ধ্বনির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে তা বর্ণধ্বনি। ঠিক একইভাবে "ভারত ভারতখ্যাত আপনার গুণে"— পদটির পরিবর্তে যদি "ভারত জগৎখ্যাত আপনার গুণে" লেখা হয় তবে ভারতচন্দ্রের খ্যাতি ভারত ছাড়িয়ে সারা বিশ্বে হয়তো ছড়িয়ে পড়বে কিন্তু শ্রুতিসুখকর অলংকারটি বিনষ্ট হবে। কারণ এই ক্ষেত্রে যে ধ্বনির ব্যবহার হয়েছে তা পদধ্বনি। এর মাধুর্যই 'ভারত' শব্দের দু'বার ব্যবহারে লুকিয়ে আছে। আবার "তনু দেহটি সাজাব তব আমার আভরণে" বাক্যে 'তনু' এবং 'দেহ' শব্দের অর্থ এক কিন্তু এখানে 'তনু' শব্দটি 'দেহ' অর্থে ব্যবহৃত হয়নি, 'ছিপছিপে' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, তাতে সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়েছে। শব্দটিকে অর্থ ঠিক রেখে পাল্টে দিলে সেই সৌন্দর্য থাকত না, অলংকারটি বিনষ্ট হত। কারণ শব্দালংকার শব্দের পরিবর্তন সহ্য করতে পারেনা।

শব্দালংকারের সংখ্যা খুব বেশি নয়-অনুপ্রাস, যমক, বক্রোক্তি, শব্দশ্লেষ এবং পুনরুক্তবদাভাস। এদের মধ্যে বাংলা কবিতায় অনুপ্রাসের ব্যবহার সর্বাধিক। তারপর বক্রোক্তি এবং শ্লেষ-এর ব্যবহার দেখা যায়। তৃতীয় স্থান যমকের এবং সর্বশেষে রয়েছে

পুনরুক্তবদাভাস। বাংলা কবিতায় এর ব্যবহার অপেক্ষাকৃত কম। এই প্রত্যেকটি অলংকারেই শব্দের প্রাধান্য।

প্রত্যেক প্রকারের শব্দালংকার থেকে একটি করে উদাহরণ দিয়ে শব্দালংকারে শব্দের প্রাধান্য দেখানো যেতে পারে।

যেমন— "কুলায়ে কাঁপিছে কাতর কপোত" — এখানে চারবার 'ক' ধ্বনি আবৃত্ত হয়ে সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে। এই বর্ণটিকে সরিয়ে দিলে অলংকারটি বিনষ্ট হত। তাই বলা যায় অনুপ্রাসে বর্ণধ্বনির ব্যবহার হয়। একইভাবে "অপরূপ রূপ কেশবে" বাক্যটির অলংকার নির্ভর করছে 'কেশবে' শব্দটিতে। শব্দটিকে ভাঙলে দুটি শব্দ পাওয়া যায়— 'কে' এবং 'শবে' অর্থাৎ 'কেশবে' এবং 'কে শবে' দুভাবে এর দুটো অর্থ পাওয়া যায়। একটির অর্থ 'অপরূপ রূপ শ্রীকৃষ্ণের', আরেকটির অর্থ 'মৃতদেহের উপর এই অপরূ রূপ মূর্তি কার' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ এবং মা কালীর কথা এখানে বলা হয়েছে। এখন 'শব' শব্দটির স্থানে যদি 'মৃতদেহ' শব্দ বসানো হয় তখন সে অলংকারটি বিনষ্ট হয়। এখানে শব্দধ্বনির ব্যবহার হয়েছে। আবার—

"কান্তার আমোদপূর্ণ কান্ত সহকারে।
কান্তার আমোদপূর্ণ কান্ত সহকারে।।"

প্রথম চরণে-'কান্তার'-বনভূমি, 'আমোদপূর্ণ'-সৌরভে পরিপূর্ণ, 'কান্ত'-বসন্তকাল এবং 'সহকারে'-সমাগমে।

দ্বিতীয় চরণে-'কান্তার'-দয়িতার, 'আমোদপূর্ণ'-আনন্দে পরিপূর্ণ, 'কান্ত'-প্রেমাস্পদ এবং 'সহকারে'-সঙ্গে।

অর্থাৎ প্রথম চরণের অর্থ হল— "বনভূমি বসন্ত সমাগমে সৌরভময় হয়েছে" এবং দ্বিতীয় চরণের অর্থ হল— "দয়িতা প্রেমাস্পদের সঙ্গে থেকে আনন্দে পরিপূর্ণ হয়েছেন"। শব্দগুলিকে পরিবর্তিত করলে কবিতাংশটির সৌন্দর্য বিনষ্ট হত এবং অলংকার হত না। এই উদাহরণে বাক্য ধ্বনি-র ব্যবহার হয়েছে। কারণ এটি সর্বযমকের উদাহরণ।

অর্থালংকার

যে অলংকার একান্তভাবে অর্থের উপর নির্ভরশীল তাকে বলে অর্থালংকার। অর্থালংকারে অলংকার স্রষ্টা শব্দ বা শব্দাবলিকে অর্থ অক্ষুণ্ণ রেখে অনায়াসে পরিবর্তিত করতে পারেন কারণ তাতে অলংকার নষ্ট হয় না। শব্দালংকারের আবেদন শ্রুতির কাছে কিন্তু অর্থালংকারের আবেদন বুদ্ধির কাছে। শব্দটির প্রকৃত অর্থটি না বুঝলে অলংকারত্ব পরিস্ফুট হয় না। উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বোঝানো যেতে পারে—

"অনন্ত আকাশে
অনিমেষ জেগে থাকে নিদ্রাতন্দ্রাহত
শূন্যশয্যা মৃতপুত্র জননীর মতো।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বসুন্ধরা' কবিতার উপর্যুক্ত চরণ কয়টিতে পুত্রহারা জননীর শূন্য শয্যায় নিদ্রাহীন প্রহর কাটানোর সঙ্গে কবির মানস ভ্রমণে বরফ আচ্ছাদিত স্থান, দীর্ঘরাত, শব্দসংগীতবিহীন দিনের একটা তুলনা করা হয়েছে। যেখানে উপমেয় অনুপস্থিত, শুধু উপমান রয়েছে। এখন যদি কিছু শব্দের সমার্থক শব্দ বসিয়ে দেওয়া যায় এবং নিম্নরূপে লেখা যায়—

"অসীম গগনে
নির্নিমেষ বসে আছে নিদ্রাতন্দ্রহত
শূন্যশয্যা পুত্রহারা প্রসূতির মতো।"

তবে তাতে অলংকারের আবেদন ক্ষুণ্ণ হয় না। কিন্তু শব্দালংকারের ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়।

অর্থালংকারের ব্যাপকতা অনেক বেশি কারণ শব্দার্থ বিচিত্র। তবুও শ্রেণিগত লক্ষণ বিচার করে মোটামুটি পাঁচটি শ্রেণি পাওয়া যায়।

শ্রেণি পাঁচটির লক্ষণাত্মক নাম—

ক) সাদৃশ্যমূলক অলংকার,
খ) বিরোধমূলক অলংকার,
গ) শৃঙ্খলামূলক অলংকার,
ঘ) ন্যায়মূলক অলংকার এবং
ঙ) গূঢ়ার্থপ্রতীতিমূলক অলংকার।

প্রত্যেক শ্রেণিতেই বেশ কিছু অলংকার রয়েছে। যেমন—

ক) সাদৃশ্যমূলক অলংকারে রয়েছে— উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, অপহ্নুতি, সন্দেহ, নিশ্চয়, ভ্রান্তিমান, ব্যতিরেক, প্রতীপ, সমাসোক্তি, অতিশয়োক্তি, উল্লেখ, দীপক, দৃষ্টান্ত, নিদর্শনা, স্মরণ, সামান্য, সহোক্তি ইত্যাদি।

খ) বিরোধমূলক অলংকারে রয়েছে— বিরোধাভাস, বিভাবনা, বিশেষোক্তি, অসঙ্গতি, বিষম, বিচিত্র, অধিক, ব্যাঘাত ইত্যাদি।

গ) শৃঙ্খলামূলক অলংকারে রয়েছে— কারণমালা, একাবলী, সার, মালাদীপক ইত্যাদি।

ঘ) ন্যায়মূলক অলংকারে রয়েছে—অর্থাপত্তি, কাব্যলিঙ্গ, অনুমান, পর্যায়, পরিবৃত্তি, সমুচ্চয়, পরিসংখ্যা, উত্তর, সমাধি, সামান্য এবং তদগুণ।

ঙ) গূঢ়ার্থপ্রতীতিমূলক অলংকারে রয়েছে— অর্থান্তরন্যাস, অপ্রস্তুত প্রশংসা, আক্ষেপ, ব্যাজস্তুতি, পর্যায়োক্তি, পরিকর, স্বভাবোক্তি, ভাবিক এবং উদাত্ত।

সাদৃশ্যমূলক অলংকার

সাদৃশ্য বলতে দুই বিসদৃশ বস্তুর সাদৃশ্য বা similarity-কে বোঝায়। আকারে বা

প্রকারে ভিন্ন হলেও কবি সেই বিজাতীয় বস্তুর মধ্যেও এমন ধর্ম আবিষ্কার করেন যা বস্তুদুটিকে সাম্যসূত্রে বেঁধে দেয়। দুটি বস্তুর মধ্যে বৈসাদৃশ্য যত বেশি হয়, অলংকার ততই সৌন্দর্যময় হয়। চোখের সঙ্গে চোখের তুলনায় কখনও অলংকার হয় না কারণ একই জাতীয় বলে তারা বৈচিত্র্যহীন। চোখের সঙ্গে পদ্মপলাশের বা অন্য কোনো বস্তুর যাদের ধর্মের সঙ্গে চোখের ধর্মের মিল খুঁজে পাওয়া যায়, তবেই অলংকার সৃষ্টি হয়। সাদৃশ্যমূলক অলংকারে যে চিত্রধর্মীতা আছে তাতেই তা আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

সাদৃশ্য বিচার করা যায় তিনটি উপায়ে—

- বস্তু দুটির সমান মূল্য স্বীকার করে।
- বস্তু দুটির অভেদ কল্পনা করে।
- বস্তু দুটির ভেদকে প্রধান্য দিয়ে।

সাদৃশ্যমূলক অলংকারে অঙ্গ চারটি—

- যাকে তুলনা করা হয় অর্থাৎ উপমেয়।
- যার সঙ্গে তুলনা করা হয় অর্থাৎ উপমান।
- যে সাধারণ ধর্মে তুলনা সম্ভব হয়।
- তুলনাবাচক শব্দ।

উপমেয় এবং উপমানকে বিভিন্ন ভাবে বোঝানো যায়। যেমন বিষয়-বিষয়ী, প্রকৃত-অপ্রকৃত, প্রস্তুত-অপ্রস্তুত, প্রাকরণিক-অপ্রাকরণিক। একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে—

"কানুর পিরীতি চন্দনের রীতি
ঘষিতে সৌরভময়।"

উপমেয়-কানুর পিরীতি
উপমান-চন্দন
সাধারণ ধর্ম-সৌরভময়
তুলনাবাচক শব্দ-রীতি

এখানে কানুর পীরিতি-ই কবির বর্ণনীয় বিষয়। চারটি অঙ্গ মিলে এখানে যে অলংকার সৃষ্টি হয়েছে তাতে কবিতাংশটি সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়েছে।

বিরোধমূলক অলংকার

যখন দুটি বস্তুকে আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধী বলে বোধ হয়, কিন্তু তাৎপর্যে সেই বিরোধের অবসান হয়, তখন হয় বিরোধমূলক অলংকার। বিসদৃশ বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য আবিষ্কারে যেমন মনে চমৎকৃতির বোধ জাগে, তেমনি বৈষম্যবোধেও অলংকার, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে হয় বিরোধমূলক অলংকার।

শৃঙ্খলামূলক অলংকার

শৃঙ্খলামূলক অলংকারে একটি কারণের কার্য পরবর্তী কার্যের কারণ হয় এবং একাধিক কার্যকারণ শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে চলে।

ন্যায়মূলক অলংকার

যখন শিল্পী তাঁর সৃষ্টিতে কোনো বিষয়কে ন্যায়মূলক সত্যের আশ্রয়ে অলংকারের আকারে প্রকাশ করেন, কেবল তখনই ন্যায়মূলক অলংকারের সৃষ্টি সম্ভব।

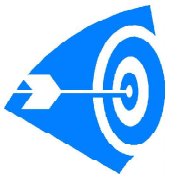
গূঢ়ার্থপ্রতীতিমূলক অলংকার

কোনো কথার কিংবা কবিতার যেমন একটা বাচ্যার্থ থাকে, তেমনি থাকে একটা গূঢ়ার্থ। কবি যখন বাচ্যার্থের ছদ্মবেশে, পাঠক কিংবা শ্রোতার কাছে উপস্থিত করেন তার আড়ালে গূঢ়ার্থটি এবং সে গূঢ় অর্থটি কবি-কল্পনার চমৎকারিত্বে মনোহর ব্যঞ্জনার সহৃদয়-হৃদয়-সংবাদী হয়ে ওঠে, তখনই হয় গূঢ়ার্থপ্রতীতিমূলক অলংকার।



আসুন জেনে নিই

অর্থালংকারের শ্রেণিবিভাগ এবং সংখ্যা বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে। কোনো কোনো আলংকারিকদের মতে যত বাক্য তত অলংকার। এটি যদিও অতিশয়োক্তি। কিন্তু বিভিন্ন আলংকারিকগণ যে সকল অলংকারের বিবরণ ও নিদর্শন দিয়ে গেছেন, তাদের সংখ্যা দুশোরও বেশি। এই বিষয়ে 'শব্দকল্পদ্রুম' কোষগ্রন্থে 'চন্দ্রালোক' এবং 'সাহিত্যদর্পণ' থেকে নাম-লক্ষ্মণ-উদাহরণসহ যে সকল প্রসিদ্ধ অলংকারের দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হয়েছে তার সংখ্যাই ১২২। এ ছাড়াও রয়েছে অসংখ্য অপ্রসিদ্ধ অলংকার।



৬.৫ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত

১। অলংকার শব্দের আভিধানিক অর্থ অলম্-কৃ (করা)+ঘঞ+ণ আভরণ বা ভূষণ, অর্থাৎ যা দিয়ে মানবদেহকে সাজ-সজ্জায় সজ্জিত করা যায়।...

(৬ নং অধ্যায়ের ৬.৩ অংশ দ্রষ্টব্য)



৬.৬ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

- অলংকার বলতে বোঝায় আভূষণ বা গহনা। আভূষণ যেমন মানব দেহের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে তেমনি কাব্যদেহের সৌন্দর্য বৃদ্ধিকারী ধর্মই অলংকার।
- বামন বলেছেন কাব্যংগ্রাহ্যমলংকারাৎ অর্থাৎ কাব্যের গ্রহণযোগ্যতা অলংকারে। কিন্তু তিনি শেষ করেছেন সৌন্দর্যমলংকারঃ বলে অর্থাৎ সৌন্দর্যই মূল কথা।

- কাব্যের অলংকার হবে সহজাত, সহজ ও স্বাভাবিক-অপৃথগযত্ননির্বত্য অর্থাৎ জোর করে অলংকার প্রয়োগ করা যাবে না।
- কাব্যদেহ গঠিত হয় শব্দ ও অর্থ দিয়ে। এই শব্দকে ও অর্থকে সাজ-সজ্জায় সজ্জিত করার নামই অলংকার। সেজন্য অলংকারকে শব্দ ও অর্থভেদে দু ভাগে ভাগ করা হয়েছে—শব্দালংকার ও অর্থালংকার।
- শব্দালংকারে শব্দের প্রাধান্য। শব্দকে সেখানে পরিবর্তন করা যায় না।
- অর্থালংকারে শব্দের অর্থের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। শব্দের সমার্থক অন্য কোনো শব্দ বসালেও অলংকার অক্ষুণ্ণ থাকে।
- অর্থালংকারের ব্যাপকতা অনেক বেশি বলেই শব্দলংকারের তুলনায় অর্থালংকারের সংখ্যা ও বৈচিত্র্য বেশি।



৬.৭ অতিরিক্ত পঠন

গুপ্ত, অতুলচন্দ্র (১৩৫৫ বঙ্গাব্দ); কাব্যজিজ্ঞাসা; কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়

চক্রবর্তী, শ্যামাপদ (১৩৬৩ বঙ্গাব্দ); অলঙ্কারচন্দ্রিকা; কলকাতা : ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লি:

বিশ্বাস, নরেন (১৯৭৬); অলঙ্কার অন্বেষা; কলকাতা : পুনশ্চ

ভট্টাচার্য, পরেশচন্দ্র (২০০৪); ছন্দ মীমাংসা ও অলংকার সমীক্ষা; কলকাতা : জয়দূর্গা প্রা: লি

মজুমদার, অতীন্দ্র (১৩৬৭ বঙ্গাব্দ); ছন্দ ও অলংকার; কলিকাতা : নয়া প্রকাশ

সাত্তার, ড. আব্দুস (আগস্ট ২০০৬); অলংকার; ঢাকা : একাত্তর প্রকাশনী

হালদার, দেবাশীষ ও অন্যান্য (২০১৭); সাহিত্যের রূপতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, অলঙ্কার, ছন্দ; ঢাকা : বুকস্ ফেয়ার



৬.৮ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১. অলংকার সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য লিখুন।

২. কাব্য অলংকার প্রয়োগের উদ্দেশ্য বর্ণনা করুন।

৩. অলংকারের প্রকারভেদ বিষয়ে আলোচনা প্রস্তুত করুন।

৪. শব্দালঙ্কার কাকে বলে, উদাহরণসহ বুঝিয়ে দিন।

৫. অর্থালঙ্কারের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদে নির্দেশ করুন।

অধ্যায় ৭ : বাংলা অলংকার পরিচয় ২

অধ্যায় বিন্যাস

৭.১ জ্ঞাতব্য বিষয়
৭.২ পরিচিতি
৭.৩ শব্দালংকারের সামগ্রিক পরিচিতি
৭.৪ শব্দালংকার : অনুপ্রাস
৭.৪.১ যমক
৭.৪.২ শ্লেষ ও বক্রোক্তি
৭.৫ নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে শব্দালংকার নির্ণয়
৭.৬ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম
৭.৭ অতিরিক্ত পঠন
৭.৮ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর সংকেত
৭.৯ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৭.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই অধ্যায়টি পড়ে আপনি—

- শব্দালংকারের সামগ্রিক পরিচয় জানবেন
- অনুপ্রাস, যমক, শ্লেষ ও বক্রোক্তির সংজ্ঞা সম্পর্কে জানবেন
- বিভিন্ন প্রকারের শব্দালংকারের নির্ণয় সম্বন্ধে জানবেন

৭.২ পরিচিতি

অলংকার কাব্যদেহে সৌন্দর্যবর্ধন করে। যেহেতু শব্দ ও অর্থ কাব্যদেহ গঠিত করে সুতরাং এই অঙ্গ দুটিকে সাজ সজ্জায় সজ্জিত করাই অলংকার। সেই দিক থেকে দেখলে অলংকারকেও দুভাগে ভাগ করা হয়েছে শব্দালংকার ও অর্থালংকার । শব্দালংকারে শব্দের ধ্বনির প্রাধান্য । তাই শব্দালংকারে শব্দকে পরিবর্তন করা যায় না। শব্দালংকারের মধ্যে আছে অনুপ্রাস, যমক, শ্লেষ, বক্রোক্তি এবং পুনরুক্তবদাভাস। অনুপ্রাস হল ধ্বনির পুনরুক্তি । বাক্যে অনেক সময় একই শব্দ বা বর্ণের পুনরুক্তি ঘটে এবং তাতে সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়। একেই বলে অনুপ্রাস। দুই বা ততোধিক ব্যঞ্জনধ্বনি নির্দিষ্ট ক্রমে সার্থক ভাবে ব্যবহৃত হলে হয় যমক অলংকার । আবার একটি শব্দ একবার ব্যবহার হয়ে যদি একাধিক অর্থ প্রকাশ করে তবে হয় শ্লেষ অলংকার। বক্তা যখন কোনো প্রশ্ন করেন কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে কিন্তু শ্রোতা

তার ভিন্ন অর্থ গ্রহণ করেন তখন হয় বক্রোক্তি অলংকার। প্রত্যেকটি অলংকারই প্রকৃত পক্ষে শব্দের প্রাধান্য সূচিত করে। এখানে অর্থ গৌণ।

৭.৩ শব্দালংকারের সামগ্রিক পরিচিতি

অর্থবহ ধ্বনি সমষ্টিকে বলে শব্দ। যে অলংকার ধ্বনির সৌন্দর্যবৃদ্ধি করে এবং শ্রুতিসৌকর্য বিষয়ক তাকে শব্দালংকার বলে। এই অলংকারটি একন্তভাবেই ধ্বনির সুষমার উপর নির্ভরশীল; এবং সেইজন্য ধ্বনির তথা শব্দের পরিবর্তনে অলংকার বিনষ্ট হয়। এই ধ্বনির ভেতর রয়েছে বর্ণ ধ্বনি যা অনুপ্রাস অলংকারে পরিলক্ষিত হয়, পদধ্বনি যা যমক, বক্রোক্তি, শ্লেষ, পুনরুক্তবদাভাসে পরিলক্ষিত হয়, এবং বাক্যধ্বনি যা দেখা যায় সর্ব যমকে। শব্দালংকারে শব্দের দিকটিই আসল, অর্থ এখানে গৌণ। শব্দের বিশেষ বর্ণ সমাবেশময় গঠনের রূপ এখানে সত্য। এই গঠনের রূপই বর্ণসমূহের মধ্যে দিয়ে যে ধ্বনি সৃষ্টি হয়। তাই অলংকারটিকে নিয়ন্ত্রিত করে। উদাহরণ দিয়ে বিষয়টিকে বোঝানো যেতে পারে—

কেন গর্ব্বী কর্ণে তুমি কর্ণ — দান কর,
রাজেন্দ্র ?"

এখানে 'কর্ণ' 'কর্ণ' অলংকার যমকের উদাহরণ। বাক্যাংশটির অর্থ গঠিত কর্ণের কথা কেন শুনছেন রাজেন্দ্র? অর্থাৎ প্রথম কর্ণ এর অর্থ 'সেনাপতি কর্ণ 'এবং দ্বিতীয় কর্ণ এর অর্থ হচ্ছে 'কান'। কর্ণ-দান বলতে কানে শোনার কথা বলা হয়েছে যে কোনো একটি কর্ণ শব্দকে পরিবর্তন করলেই যমক অলংকারটি বিনষ্ট হয় এখানে পদ্ধতির ব্যবহার সুস্পষ্ট। আবার নিম্নোক্ত চরণ দুটি লক্ষ করলে দেখি—

"কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত চরাচর যাহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকর?"

এখানে কবির রচনার উদ্দেশ্য দুটি- ১। ঈশ্বরের মহিমা ২। আত্ম মহিমা।

"কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত , ব্যাপ্ত চরাচর অর্থাৎ ঈশ্বর সারা বিশ্বে ছড়িয়ে আছে সুতরাং তিনি গুপ্ত নন তাঁর আলোকেই বিশ্বসংসার আলোকিত সূর্যের আলোক তাঁরই দান 'যাহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকর'।

এটি প্রথম অর্থ। কিন্তু দ্বিতীয় অর্থ হল— ঈশ্বর অর্থাৎ কবি ঈশ্বর গুপ্ত যিনি 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন । সুতরাং ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রতিভার উজ্জ্বল সাক্ষর তাঁর 'প্রভাকর' পত্রিকা। এখানে 'ঈশ্বর', 'প্রভা', 'প্রভাকর' শব্দগুলির একটিকে পরিবর্তন করলেই শ্লেষ অলংকারটি বিনষ্ট হবে।

একটি বিষয় লক্ষ করার মত যে অর্থ নয় শব্দেরই প্রাধান্য বেশি এখানে। অনেকে শব্দ মানে ধ্বনি তা শুধু অনুপ্রাস অলংকারেই আছে বলে অনেকে মনে করেন। যমক শ্লেষ ইত্যাদিতে অর্থের মর্যাদা চরম কিন্তু তবুও এদের অর্থালংকারের পর্যায়ভুক্ত করা যায় না কারণ অর্থ ঠিক রেখে শব্দ পরিবর্তন করলে যে অলংকারটি বিনষ্ট হয় তা উপর্যুক্ত উদাহরণে স্পষ্ট।

সেইজন্য অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় শব্দালংকারের আলোচনায় শব্দধ্বনি, পদধ্বনি, ও বাক্য ধ্বনির কথা বলেছেন।

শব্দালংকারের রয়েছে অনুপ্রাস, যমক, শ্লেষ, বক্রোক্তি, এবং পুনরুক্তবদাভাস অলংকার। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে অনুপ্রাসের ব্যবহার সর্বাধিক। আর একথা তো ঠিক শব্দালংকারের সার্থকতা শোনার মধ্যে। ধ্বনির মধ্যে যে আলো থাকে তাঁর দ্রষ্টা মন, চোখ নয়। কবি এই ধ্বনিকেই অলংকার মণ্ডিত করেন। কবি সমালোচক ALFRED NOYES- ও বলেছেন-

"... it (poetry society of London) has been rendering a great service to the cause of poetry of many years how it has helped people to realize that poetry was meant to be heard." (The poetry review, march-april, 1933)

সুতরাং এই ব্যাপারটিকে সব দেশের সমালোচকগণ মেনে নিয়েছেন।

৭.৪ শব্দালংকার : অনুপ্রাস

জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে কথা বলার সময় আমরা যে সকল শব্দ ব্যবহার করি সেই সমস্ত শব্দে বিশেষ ধ্বনির পুনরুক্তি ঘটে যা কখনও বিরক্তি উৎপাদন করতে পারে বা শ্রুতিসুখকরও হতে পারে। যখন পুনরুক্তি সুখকর হয় বা সৌন্দর্য সৃষ্টি করে তখন অনুপ্রাস হয়। মঙ্গলকাব্যে 'চৌতিশা' অংশে এই বর্ণ বা বর্ণ গুচ্ছের পুনরুক্তি দেখা যেত। যেমন মুকুন্দ চক্রবর্তীর 'অভয়ামঙ্গল'-এ আছে—

"কালী কপালিনী কান্তা কপাকুণ্ডলা। কালরাত্রি কুন্দমুখী কত জান কলা।।

শব্দের আদিতে 'ক' অক্ষরের পুনরুক্তি ঘটেছে। বলা যেতে পারে 'ক' অক্ষরটি বারে বারে আবৃত হয়েছে বা ধ্বনিত হয়েছে সুতরাং এই বারবার ধ্বনিত হওয়াই অনুপ্রাস। অনুপ্রাসের সংজ্ঞায় বলা চলে একই বর্ণ ব বর্ণগুচ্ছ যুক্ত বা বিযুক্ত ভাবে যদি বার বার ধ্বনিত হয় তাহলে তকে অনুপ্রাস অলংকার বলে, তবে মনে রাখতে হবে বর্ণ বলতে স্বরবর্ণ নয়, ব্যঞ্জনবর্ণকে বোঝানো হয়েছে।

একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে—

"গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি"

চরণটি 'গ' ধ্বনি অনুপ্রাসিত হয়ে হয়েছে 'গ' এর সঙ্গে 'উ'ধ্বনি যুক্ত হয়ে আছে। ব্যঞ্জনধ্বনির সাথে স্বরধ্বনির এক সাথে সমতা তৈরি হয়েছে । আবার

'কাল কোকিল অলিকুল বকুল ফুলে'

চরণটি 'ক' ধ্বনি পাঁচবার আবৃত হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে স্বরধ্বনি চরণটিতে রক্ষিত হয়নি কিন্তু 'ক' ধ্বনির অনুপ্রাস হয়েছে। সুতরাং একটি কথা পরিষ্কার যে স্বরধ্বনির সাম্য

হোক বা না হোক অনুপ্রাস হবেই।



আসুন জেনে নিই

বাংলায় স্বরের অনুপ্রাস গ্রহণযোগ্য হবে কিনা এই বিষয়ে মতপার্থক্য আছে। সাধারণত স্বরের অনুপ্রাসকে মেনে নেওয়া যায় না কারণ পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য এর মতে "শুদ্ধ স্বরের পুনরাবৃত্তিতে শ্রুতি সুখকর কিংবা ধ্বনিমাধুর্যের সৃষ্টি হয় না।" শ্যামাপদ চক্রবর্তী তাঁর 'অলঙ্কার চন্দ্রিকা' গ্রন্থে বলেছেন "শুদ্ধ স্বরধ্বনির সাদৃশ্যকে আমরা অনুপ্রাস বলি না কারণ এক স্বর বার বার উচ্চারিত হলেও ধ্বনিগত বৈচিত্র্য সৃষ্টি করতে পারে না।" তবে তিনি একথাও বলেছেন যে একই স্বরধ্বনির অনেকবার আবৃত হলে কখনো কখনো অপূর্ব মায়াজাল সৃষ্টি হতে পারে । সেটা হয় onomatopoeia বা 'ভাবধ্বনি'-তে। কিন্তু onomatopoeia অনুপ্রাস নয়। এটিকে Figure of speech বা অলংকারের পর্যায়ভুক্ত করা চলে না । শ্যামাপদ চক্রবর্তী বলেছেন যেহেতু বাংলায় স্বরধ্বনির উচ্চারণে হ্রস্ব বা দীর্ঘ নেই, সব স্বরই হ্রস্ব, শুধু মাত্রাছন্দের কবিতায় 'ঐ' বা 'ঔ' দীর্ঘ উচ্চারিত হয় এবং ওজনে এরা বাকি দীর্ঘ স্বরের তুলনায় ভারী তাই তিনি ঐ এবং ঔ এর অনুপ্রাস স্বীকার করেছেন। অনুপ্রাসের শ্রেণিবিভাগ নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। সংস্কৃত আলংকারিকগণ অনুপ্রাসকে পাঁচ ভাগে ভাগ করেছেন বৃত্ত্যনুপ্রাস, ছেকানুপ্রাস, শ্রুত্যনুপ্রাস এবং লাটানুপ্রাস। তবে শ্যামাপদ চক্রবর্তীর মতে অনুপ্রাসকে মূলত তিন ভাগে ভাগ করা হয় অন্ত্য, বৃত্তি, ছেক। এদের মধ্যে বৃত্তিই শ্রেষ্ঠ। ছেক গৌণ এবং শ্রুত্যনুপ্রাসকে কেবল অন্ত্যানুপ্রাসের সহকারী হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে ।

❐ অন্ত্যানুপ্রাস

অন্ত্যানুপ্রাসের ব্যবহার শুধু পদ্য বা কবিতায় সীমাবদ্ধ। কবিতায় চরণান্তিক, পদান্তিক, বা পর্বান্তিক অনুপ্রাসকেই বলে অন্ত্যানুপ্রাস অর্থাৎ পদান্তের সঙ্গে পর্বান্তের ধ্বনিসাম্য অন্ত্যানুপ্রাস। উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বোঝানো যেতে পারে— "নিরাবরণ বক্ষে তব নিরাভরণ দেহে," অথবা "চিকন সোনা-লিখন উষা আঁকিয়া দিল স্নেহে।"

'দেহে" এবং 'স্নেহে' তে ধ্বনিসাম্য ঘটেছে । আবার— "শ্রাবণে ডেপুটিপনা/ এ তো কভু নয় সনা/তন প্রথা এ যে অনা/সৃষ্টি অনাচার।" এখানে পনা, সনা, অনা—তের অনুপ্রাস ঘটেছে। অন্ত্যানুপ্রাসের ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে শুদ্ধ স্বরধ্বনির প্রাধান্য এখানে বেশি। স্বরের ব্যঞ্জনা এখানে শুধু অন্ত্যব্যঞ্জনেই সীমাবদ্ধ নয়। ব্যঞ্জন সাদৃশ্য না থাকলেও অনেক সময় শুধু স্বরধ্বনির সাদৃশ্যে অনুপ্রাস সার্থক হয়। দুটি দৃষ্টান্ত —

১। 'ধরা নাহি দিলে ধরিব দুপায়, কি করিতে হবে বলো সে উপায়/ঘর ভরি দিব সোনায় রূপায়'—

অন্ত্যানুপ্রাস ঘটেছে 'দুপায়' > 'উপায়', 'এবং' রূপায় > উপায় শব্দের মধ্যে।

২। "অজানা গোপন গন্ধে পুলকে চমকি দাঁড়াবে থমকি"

—অনুপ্রাস ঘটেছে চমকি— এবং থমকি এর— অমকির মধ্যে। উল্লেখযোগ্য যে — "মনে আছে সেই গ্রীষ্মের দিনপঞ্জী রোদে ফুটি ফোটা মাঠের পাঁজরে কচি শস্যের চারা ধুঁকে মরে ঘূর্ণি ধুলোয় এসেছে নকল পাঞ্জা আসানি প্রবল বর্ষণে মেঘপুঞ্জ।"

এখানে প্রথম, চতুর্থ এবং পঞ্চম চরণের শেষে 'ঞ্জী', 'ঞ্জা' এবং 'ঞ্জ' যুক্ত ব্যঞ্জন রয়েছে। ঞ্জ যুক্ত ব্যঞ্জনের অনুপ্রাস হয়েছে ঠিকই কিন্তু অন্ত্যানুপ্রাস হইনি। কারণ চরণান্তিক কোনো মিল বা Rhyme এখানে হয়নি।

❐ বৃত্ত্যনুপ্রাস

যে কোনো অনুপ্রাসই আসলে বৃত্ত্যনুপ্রাস কারণ একই ব্যঞ্জন ধ্বনির আবৃত্তিই তো আসলে বৃত্তি সুতরাং বৃত্ত্যনুপ্রাস। বৃত্ত্যনুপ্রাস সম্পর্কে কিছু নির্দিষ্ট বিধান—

ক) একটি মাত্র ব্যঞ্জনধ্বনি মাত্র দু'বার ব্যবহৃত হবে। যেমন—

"বিদায় বিষাদ শ্রান্ত সন্ধ্যার বাতাস— এখানে 'বি' ধ্বনি দু'বার আবৃত হয়েছে।

খ) একটি মাত্র ব্যঞ্জনধ্বনি দু'বার থেকে বেশি ব্যবহৃত হবে যেমন—

"কেতকি কত কি কথা কামিনীর কহে কানে কানে" এখানে 'ক' ধ্বনি ৯ বার আবৃত হয়ে অনুপ্রাস অলংকার হয়েছে।

গ) একাধিক ব্যঞ্জনধ্বনি স্বরূপ অনুসারে অলংকার হয়েছ। যেমন—

"রসাত্মক বাক্যই কাব্য।" এখানে 'বাক্য' ও 'কাব্য' শব্দ দুটিতে 'ব' ও 'ক' ধ্বনি ব্যবহৃত হয়েছে কিন্তু ক্রম রক্ষিত হয়নি পর্যায়ভঙ্গ হয়ে এরূপ সাদৃশ্যকে বলে 'স্বরূপ সাদৃশ্য'।

খ) যুক্ত বা বিযুক্ত ভাবে ব্যঞ্জনগুচ্ছ ক্রমানুসারে বহুবার ধ্বনিত হবে। যেমন—

"সঙ্কট্ময় পঙ্কিল পথ শঙ্কিল চারিধার" এখানে 'ঙ্ক' যুক্ত ব্যঞ্জন তিনবার আবৃত হয়েছে।

"গত যামিনী, জিত দামিনী, কামিনী, কুল লাজে" এখানে 'মিনী' বিযুক্ত ব্যঞ্জনগুচ্ছ তিনবার আবৃত হয়েছে।



আসুন জেনে নিই

অনুপ্রাস অর্থে 'বৃত্তি' কথাটি প্রথম প্রয়োগ করেন অষ্টম শতাব্দীর উদ্ভট। তিনি তিন রকম বৃত্তির কথা বলেছেন— 'পুরুষা', উপনাগরিকা এবং গ্রাম্যা। এই তিনপ্রকার বৃত্তির মধ্যে উপনাগরিকা শ্রেষ্ঠ। গ্রাম্যা-কে কোমলাও বলা হয়। ভরতমুনি তাঁর নাট্যশাস্ত্রতে 'কৌশিকী' এবং 'ভারতী' বৃত্তির কথা বলেছেন। উদ্ভটের বৃত্তি আর ভরতমুনির বৃত্তির মিলন রসের সাগরে। সেইজন্য বলা হয়েছে— "রসানুগত অনুপ্রাসের নাম বৃত্ত্যনুপ্রাস"

❐ **ছেকানুপ্রাস**

দুই বা তার বেশি ব্যঞ্জনধ্বনি যুক্ত বা বিযুক্ত ভাবে ক্রমানুসারে যদি দু'বার ধ্বনিত হয় তবে ছেকানুপ্রাস অলংকার হয়। 'ছেক' শব্দের অর্থ পণ্ডিত। পণ্ডিতদের ব্যবহার যোগ্য বলেই এই নামকরণ করা হয়েছে। মনে রাখতে হবে এক ব্যঞ্জনে ছেকানুপ্রাস হবে না। বৃত্ত্যনুপ্রাসের মাঝে পার্থক্য শুধু এইটুকুই যে বৃত্ত্যনুপ্রাসে স্বরূপানুসারে ব্যঞ্জনধ্বনি দু'বার আবৃত্ত হয় আর ছেকানুপ্রাসে ক্রমানুসারে দুবার আবৃত্ত হবে। যেমন—

ক) "এখনি অন্ধ বন্ধ করো না পাখা।" এখানে 'ন্ধ', 'ন্ধ',—এর ক্রম রক্ষিত হয়েছে।

খ) "অধর অধীর হতো চুম্বন-লালসে।" এখানে 'অধর' এবং 'অধীর' শব্দ দুটির দুটি বর্ণ 'ধ' ও 'র' ক্রমানুসারে দু'বার ধ্বনিত হয়েছে।

❐ **শ্রুত্যনুপ্রাস** : বাগ্‌যন্ত্রের একই স্থান থেকে যে সকল ধ্বনি উচ্চারিত হয় সেগুলি একই ধ্বনি না হলেও সদৃশ ধ্বনি। সেই সদৃশ ধ্বনির সাহায্য তৈরি অনুপ্রাসকে শ্রুত্যনুপ্রাস বলে। শ্রুত্যনুপ্রাস শব্দের অন্ত্যে হয় বলে একে অন্ত্যানুপ্রাসের সহকারী বলা হয় বাগ্‌যন্ত্রের একই স্থান থেকে উৎপন্ন 'ক' ও 'খ', গ ও ঘ, চ ও ছ, য ও ঝ, ট ও ঠ, ত ও থ, দ ও ধ, প ও ফ, এবং ব ও ভ, সদৃশ ধ্বনি। ড এবং ঢ এর শ্রুত্যনুপ্রাস বাংলায় তেমন পাওয়া যায় না। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে—

ক, খ > "পরপারে দেখি আঁকা তরুছায়া মশীমাখা।"

ট, ঠ > "ধরি তার কর দুটি আদেশ পাইলে উঠি।"

দ, ধ > "বাদী প্রতিবাদী, বিবিধ উপাধি।"

মনে রাখতে হবে বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণের ধ্বনি সাম্যে শ্রুত্যনুপ্রাস ঘটে কিন্তু বর্গের প্রথম ও তৃতীয় বর্ণে শ্রুত্যনুপ্রাস কদাচিত দেখা যায়। যেমন— ক,গ > ভয় কোরো না অলক্ত রাগ মোছে যদি মুছিয়া যাক।" এখানে 'ক' ধ্বনি 'গ' এর মতো উচ্চারিত। অতএব শ্রুত্যনুপ্রাস অলংকার 'র' ও 'ড়' ধ্বনির কখনও শ্রুত্যনুপ্রাস হয়। যেমন—

র, ড় > "স্থির জলে নাহি সাড়া পাতাগুলি গতিহারা।"

❐ **লাটানুপ্রাস**: তাৎপর্যের দিক থেকে আলাদা কিন্তু অর্থযুক্ত শব্দের বা শব্দ সমষ্টির প্রয়োগকে লাটানুপ্রাস বলে। অনেক আলংকারিকই এই অনুপ্রাসকে স্বীকার করেননি। আচার্য বিশ্বনাথ বলেছেন— "শব্দার্থেয়োঃ পৌনরুক্তং ভেদে তাতপর্যমাত্রতঃ"— অর্থাৎ অর্থসহ শব্দের পুনরুক্তি যদি ঘটে এবং তাতে তাৎপর্যগত দিক থেকে পার্থক্য দেখা যায় তবে হয় লাটানুপ্রাস।

"কালো তা সে যতই কালো হোক" এখানে দু'টি কালোরই অর্থ কৃষ্ণ বর্ণ কিন্তু পুনরুক্ত হওয়াতে সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়েছে।

৭.৪.১ যমক :

'সাহিত্যদর্পণ'-কার বিশ্বনাথ কবিরাজ যমক অলংকারের সংজ্ঞায় বলেছেন :

"সত্যর্থে পৃথগর্থায়াঃ স্বরব্যঞ্জন সংহতেঃ। ক্রমেণ তেনৈবাবৃত্তির্যমকং

বিনিগদ্যতে।।"

অর্থাৎ বিভিন্ন অর্থ থাকা একটি পদ যদি স্বরসমেত ব্যঞ্জনধ্বনির ক্রমসাদৃশ্য অনুসারে সার্থক, নিরর্থক বা সার্থক নিরর্থক রূপে বারবার আবৃত হয় তাহলে যমক অলংকার হয়। সার্থক ও নিরর্থক বলার অর্থ থাকতে পারে, নাও থাকতে পারে বা একটির থাকতে পারে অন্যটির নাও থাকতে পারে। যমক অলংকারের কয়েকটি লক্ষণ—

ক) এই অলংকারে স্বরসমেত ব্যঞ্জনধ্বনির সাদৃশ্য থাকে, যেমন— পুঞ্জ, পুঞ্জী, বা পাঞ্জা, পদ এই তিনটিতে 'ঞ্জ' 'ঞ্জী', এবং 'ঞ্জা' পাই। কিন্তু যমকের উদাহরণ নয়, তা অনুপ্রাসের উদাহরণ।

খ) স্বরসমেত ব্যঞ্জনধ্বনি ক্রমানুসারে আবৃত হবে। যেমন-কাটা এবং টাকা— দুটোতেই 'কা' এবং 'টা' রয়েছে কিন্তু কাটা, টাকা রয়েছে। 'ক', এর পর 'ট' ধ্বনিই হতে হবে অথবা 'ট' এর পর 'ক' ধ্বনি। এখানে স্বরূপ সাদৃশ্য হয়েছে কিন্তু বর্ণের ক্রমরক্ষিত হয়নি। তাই এটা যমক নয়।

গ) যে শব্দটি বার বার আবৃত হয় তা ভিন্নার্থ বোধক হওয়া চাই। যেমন 'ফুলে ফুলে মধু নাই'-এখানে 'ফুলে' শব্দটি পুনরাবৃত্ত হলেও শব্দ দুটিতে অর্থ পার্থক্য নেই বলে এটা যমক অলংকার হবে না।

ঘ) বর্ণ গুচ্ছ সার্থক, নিরর্থক আবার সার্থক- নিরর্থকের মিশ্রণ হতে পারে। সার্থক শব্দগুলি বিভিন্নার্থক হতে হবে। যেমন— "গিরিযায় হে লয়ে হর প্রাণ কন্যা গিরিজায়।"

'গিরিযায়' — হিমালয়, 'গিরিজায়' — উমা, হিমালয় কন্যা

সার্থক — নিরর্থক- "বৎসরান্তে আনতে হবে তারে।" এখানে বৎসরান্তে— (বৎসর + অন্তে) কিন্তু শ্রুতিতে একে (বৎসর + আনতে) মনে হয়। এই আনতে অর্থহীন। তার সঙ্গে 'আনতে হবে তারে'—র 'আনতে'র যমক তৈরি হয়েছে। আরেকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে—

"যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল" এখানে 'যৌবনের' শব্দের 'বনে'র আলাদা কোনো অর্থ হয় না। এই 'বনের' সাথেই 'বনে মন' এর 'বনে' অর্থাৎ অরণ্যের যমক সৃষ্টি হয়েছে। কোনো কোনো আলংকারিক যমকের ব্যবহার অনুযায়ী নামভেদ কল্পনা করেছেন। বাক্যের আদিতে ব্যবহার হলে হয় আদি যমক, অন্ত্যে হলে হয় অন্ত্যযমক, মধ্যে হলে হয় মধ্য যমক। উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

আদ্য যমক- "ভারত ভারত খ্যাত আপনার গুণে"

মধ্য যমক- "পাইয়া চরণতরী তরি ভবে আশা"

অন্ত্য যমক- "যাইতে মানসসরে কার না মানস সরে।"

সর্ব যমক- "কান্তার আমোদ পূর্ণ কান্ত সহকারে
কান্তার আমোদ পূর্ণ কান্ত সহকারে"

প্রথম চরণে— কান্তার-বনভূমি, আমোদ-সৌরভ, কান্ত-বসন্তকাল, সহকারে-সমাগমে,

দ্বিতীয় চরণ— কান্তার-দয়িতার, আমোদ-আনন্দ, কান্ত-দয়িত, সহকারে-সঙ্গে।

দুই চরণের অর্থ ভিন্ন, দ্বিতীয় চরণটি প্রথম চরণের পুনরাবৃত্তি সেজন্য একে সর্ব্বযমক বলা হয়েছে।

৭.৪.২ শ্লেষ ও বক্রোক্তি

শ্লেষ বা শব্দশ্লেষ : একটি শব্দ বাক্যে একবার ব্যবহার করা হলেও যদি তার একের বেশি অর্থ থাকে এবং পাঠক বিভিন্ন অর্থেই সেটিকে গ্রহণ করেন তখন সেটিকে শ্লেষ বা শব্দ শ্লেষ অলংকার বলা হয়। শব্দ শ্লেষ এবং অর্থশ্লেষ এর পার্থক্য শুধু এইটুকুই যে শব্দশ্লেষে শব্দ পরিবর্তন করা যায় না। তাহলেই অলংকারটি বজায় থাকে কিন্তু অর্থশ্লেষে শব্দ পরিবর্তন করা যায়।

শব্দশ্লেষকে দুই ভাগে করা যায়- সভঙ্গ এবং অভঙ্গ।

- সভঙ্গ শব্দশ্লেষ — শব্দটি অটুট থাকলে এক অর্থ এবং ভাঙলে যদি অন্য অর্থ প্রকাশ পায় তাহলে সভঙ্গ শব্দশ্লেষ হয়। "আমার দিনের শেষ ছায়াটুকু মিশাইলে মূলতানে গুঞ্জন তার রবে চিরদিন..."

এখানে 'মূলতানে' শব্দটির দুটি অর্থ এক মূলতান, আনে সঙ্গীতের রাগিণী কিন্তু শব্দটিকে যদি ভেঙ্গে মূল তানে করা হয় তাহলে তার অর্থ দাঁড়ায় সেই তান যা অবিরাম বৈচিত্র্যময় গুঞ্জনে আত্মপ্রকাশ করেছে। সুতরাং শব্দটিকে ভাঙতে হচ্ছে তার অর্থ বোঝার জন্য। সুতরাং এটি সভঙ্গ শ্লেষের উদাহরণ।

- অভঙ্গ শব্দশ্লেষ— শব্দকে না ভেঙ্গে যখন বাক্যের একাধিক অর্থ প্রকাশ পায়, তখন হয় অভঙ্গ শব্দশ্লেষ। যেমন— "এনেছে তোর স্বামী বান্ধি নিজ গুণে" — দেবী চণ্ডী আত্মপ্রকাশের সময় কালকেতুর স্ত্রী ফুল্লরাকে এই কথা বলেছেন 'গুণে' র অর্থ ধনুকের ছিলা এবং স্বভাবের চমৎকারিত্ব। ফুল্লরা অর্থ করেছে তার স্বামীর স্বভাবের চমৎকারিত্বে বা 'গুণে' শব্দটিকে না ভেঙেই দুটো অর্থ প্রকাশ পাচ্ছে। সুতরাং অভঙ্গ শব্দশ্লেষ অলংকার হয়েছে ।

বক্রোক্তি : ধ্বনিসাদৃশের জন্য অথবা বক্তার কণ্ঠস্বরের পরিবর্তনের জন্য শ্রোতা যদি অভিপ্রেত অর্থটি গ্রহণ না করে অন্য অর্থ গ্রহণ করে তাহলে হয় বক্রোক্তি অলংকার। বক্রোক্তি অলংকার দুটি পক্ষ থাকে প্রশ্নকর্তা এবং উত্তরদাতা অথবা বক্তা এবং শ্রোতা । যেমন—

প্রশ্ন- 'মশায় বুঝি পানাসক্ত।'

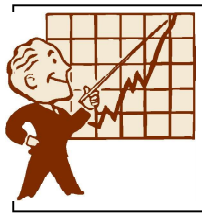
উত্তর- 'হ্যাঁ, তবে সঙ্গে জর্দা চাই।'

এখানে প্রশ্নকর্তা জানতে চেয়েছেন যে উত্তরদাতা মদে আসক্ত কি না

উত্তরদাতা কৌশলে প্রশ্নটি এড়িয়ে গিয়ে পান খাওয়ার কথা বলেছেন জর্দার ইঙ্গিত দিয়ে। এটি শ্লেষ বক্রোক্তির উদাহরণ। বক্রোক্তিকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে— শ্লেষ বক্রোক্তি এবং কাকু বক্রোক্তি ।

- শ্লেষ বক্রোক্তি— একই শব্দের যখন নানা অর্থ গৃহীত হয় তখন হয় শ্লেষ। এই জাতীয় শব্দের অন্তর্গত বৈচিত্র্যের উপর যে বক্রোক্তি নির্ভর করে তাকে শ্লেষ বক্রোক্তি বলে।

কাকু বক্রোক্তি— এই অলংকার 'কাকু' অর্থাৎ বক্তার কণ্ঠস্বরের উপর নির্ভরশীল এই অলংকারে সাধারণত বিধি নিষেধে এবং বিধি হিসেবে গৃহিত হয় উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বোঝানো যেতে পারে। "কে ছেড়ে পদ্মের পর্ণ?" পদ্মের পর্ণ বা পাপড়িই সর্বস্ব তা কেউ ছিড়ে না। প্রশ্নটির মধ্যে উত্তর লুকিয়ে আছে যে 'কেউ পদ্মের পর্ণ ছেড়ে না'। যখন কবি বলেন "স্বাধীনতা হীনতায় বাঁচিতে কে চায় হে বাঁচিতে কে চায়?" তখন উত্তরটি সেখানেই মেলে যে কেউ পরাধীন ভাবে বাচতে চায় না।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

ক) "প্রকৃতপক্ষে সকল অনুপ্রাসই বৃত্ত্যনুপ্রাস।" আলোচনা করুন । (৫০ শব্দের মধ্যে লিখুন)

৭.৫ নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে শব্দালংকার নির্ণয় :

শব্দালংকার নির্ণয় করতে হলে প্রথমে প্রতিটি শব্দালংকারের সংজ্ঞা জানা জরুরি কারণ সংজ্ঞা জানা থাকলে অলংকারটি বুঝতে সুবিধা হয়। অনেক সময় অর্থালংকারের সঙ্গে শব্দালংকারও কবিতায় ব্যবহৃত হয় সেই ক্ষেত্রে অর্থালংকারটি নির্ণয় করার সাথে সাথে শব্দালংকার বিশেষ করে অনুপ্রাস থাকলে তা উল্লেখ করতে হয়। উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বোঝানো যেতে পারে—

ক) "চল চপলার চকিত চমকে করিছ চরণ বিচরণ।"

উক্ত দুটি চরণ যখন পাঠ করি তখন আমরা 'চ' ধ্বনি ৬ বার আবৃত হতে দেখি এবং 'ক' ধ্বনি ৩ বার ও র ধ্বনি ৪ আবৃত হতে দেখি আমরা জানি বৃত্ত্যনুপ্রাসের একটি বৈশিষ্ট্য হল বহুবার আবৃত হবে এক্ষেত্রে তাই হয়েছে। সুতরাং এটি বৃত্ত্যনুপ্রাস অলংকারের নিদর্শন। কারণটি নির্দেশ না করলে অসম্পূর্ণ থাকে।

খ) "লীলা পদ্ম হাতে কুরবক মাথে"— চরণটি পাঠ করলে ব্যঞ্জনধ্বনির সাম্য কণ্ঠ গোচর হয় 'হাতে' এবং 'মাথে' র মধ্যে 'ত' ধ্বনি এবং 'থ' ধ্বনি বাগ্‌যন্ত্রের একই স্থান থেকে উচ্চারিত। সেইজন্য এই ধ্বনিসাম্য ঘটেছে। আমরা জানি এরকম শ্রুতিগ্রাহ্য সদৃশ ধ্বনিতে যে

অনুপ্রাস হয় তাকে বলে শ্রুত্যনুপ্রাস। সুতরাং এটি শ্রত্যনুপ্রাসের নিদর্শন ।

গ) "এখন বলে যাও গা মা পা ধা, আসার বেলা শুধু আ আ আ আ।"

এখানে শুধু স্বরধ্বনির অনুপ্রাস রয়েছে— গা মা পা ধা এবং আ আ আ আ— তে।

ঘ) "ঘন বনতলে এসো ঘন নীল বসনা।

উক্ত চরণটিতে 'ঘন' শব্দটি দুবার ব্যবহৃত হয়েছে তবে ভিন্ন অর্থে। আমরা জানি দুই বা তার চাইতে বেশি ব্যঞ্জনবর্ণ স্বরধ্বনিসমেত নির্দিষ্ট ক্রমে সার্থক বা নিরর্থক ভাবে ব্যবহৃত হলে যমক অলংকার হয় এখানে প্রথম ' ঘন' শব্দটির অর্থ 'নিবিড়' এবং দ্বিতীয় 'ঘন' শব্দটির অর্থ 'মেঘ'। ক্রমে শব্দ দুটি সার্থক ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং এটি সার্থক যমকের উদাহরণ। এতে 'ব' এবং 'ল' ধ্বনির অনুপ্রাস আছে।

ঙ) "তারার যৌবন—বন ঋতু রাজ তুমি।"

উক্ত চরণে 'বন' শব্দটি দুবার ব্যবহৃত হয়েছে কিন্তু সার্থক ও নিরর্থক ভাবে। 'যৌবনবন, শব্দ থেকে 'বন' শব্দটিকে সরিয়ে দিলে অর্থ থাকে না। সুতরাং এটি যমক তবে সার্থক— নিরর্থক যমক। এটিকে মধ্যযমকও বলা হয়। এতে 'ত' এবং 'র' ধ্বনির অনুপ্রাস আছে।

চ) "বলরাম দাসে কয় সাজাইয়া রাণী। নেহারে গোপাল মুখ কাতর পরানি।"

এটি দুই চরণের। এখানে 'রাণী' ও 'রানি' 'শব্দ দুটি ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথমটির রাজার 'স্ত্রী' কিন্তু দ্বিতীয়টি চরণে 'রানি' র আলাদা অর্থ নেই। এটি 'প' ধ্বনির সঙ্গে যুক্ত। সার্থক ও নিরর্থক রূপে যমক অলংকার সৃষ্টি হয়েছে। এবং এটিতে 'রাণী' ও 'রানি' র অন্ত্যানুপ্রাসও হয়েছে ।

ছ) "মাথার ওপরে জ্বলিছেন রবি, রয়েছে সোনার শত ছেলে।"

এখানে কবি 'রবি' শব্দটিকে দুটি অর্থে ব্যবহার করেছেন। (১) রবি — সূর্য (২) রবি- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কিন্তু শব্দটিকে ভাঙতে হয়নি। কোনো শব্দকে না ভেঙ্গে যদি একাধিক অর্থ পাওয়া যায় তাহলে অভঙ্গ শ্লেষ অলংকার হয়।

জ) "বুদ্ধের মতন যাঁর আনন্দ সে নিত্য সহচর।"

এখানে কবি 'আনন্দ' শব্দটিকে দুটি অর্থে ব্যবহার করেছেন। (১) সন্তোষ (২) বুদ্ধদেবের সহচর। কিন্তু শব্দটিকে ভাঙতে হয়নি। না ভেঙ্গেই দুটো অর্থ পাওয়া যাচ্ছে। সুতরাং এটি অভঙ্গ শ্লেষের দৃষ্টান্ত।

ঝ) "দ্বিজ হয়ে কেন কর বারুণী সেবন?" রবির ভয়েতে শশী করে পলায়ান।"

আমরা জানি শ্লেষের সঙ্গে বক্রোক্তির পার্থক্য শুধু এইটুকুই যে বক্রোক্তিতে প্রশ্ন উত্তরের মধ্যে দিয়ে শব্দের ভিন্ন অর্থ প্রকাশ পায়। বক্তা এক অর্থে বলেন শ্রোতা অন্য অর্থ গ্রহণ করেন। উপর্যুক্ত দৃষ্টিতে আমরা লক্ষ করি যে প্রশ্নকর্তা জানতে চাইছেন ব্রাহ্মণ হয়েও উত্তরদাতা কেন মদ্য পান করেন?

উত্তরদাতা দুটি শব্দের ভিন্ন অর্থ গ্রহণ করেছেন। দ্বিজ— চন্দ্র, বারুণী সেবন পশ্চিম

দিকে গমন। তাই তিনি বলেছেন সূর্য দেখা দিয়েছে বলেই চন্দ্র পলায়ান করেছে। সুতরাং এটি বক্রোক্তি অলংকারের দৃষ্টান্ত।

ঞ) "অশ্বত্থের শাখা করেনি কি প্রতিবাদ?"

এখানেও প্রশ্নটির মধ্যেই উত্তর লুকিয়ে আছে। এটি 'না' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আসলে প্রশ্নকর্তা বলেছেন যে অশ্বত্থের শাখা প্রতিবাদ করেছে। এই জাতীয় বাক্য একমাত্র কাকু বক্রোক্তিতে লক্ষিত হয় যেখানে কণ্ঠস্বরের বিশেষ ভঙ্গি সাহায্যে নিষেধাত্মক বক্তব্যকে ইতিবাচক এবং ইতিবাচক শব্দকে নিষেধাত্মক অর্থে প্রকাশ করেন। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। সুতরাং এটি কাকু বক্রোক্তির দৃষ্টান্ত ।



৭.৬ অধ্যায়টি পাঠ আমরা কী শিখলাম

- অলংকার কাব্য শরীরকে সৌন্দর্য প্রদান করে। অলংকারের দুটি ভাগ— শব্দালংকার ও অর্থালংকার।
- শব্দালংকার ধ্বনির সুষমার উপর নির্ভরশীল।
- শব্দালংকার শব্দের পরিবর্তন সহ্য করতে পারেনা।
- শব্দালংকারের মধ্যে রয়েছে অনুপ্রাস, যমক, শ্লেষ, বক্রোক্তি ইত্যাদি।
- জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারে কথা বলার সময় আমরা যেসব শব্দ ব্যবহার করি তাতে শব্দের পুনরুক্তি ঘটে। শব্দের পুনরুক্তি যখন শ্রুতি সুখকর হয় তখন তাকে বলে অনুপ্রাস।
- অনুপ্রাসকে অন্ত্য, বৃত্তি ও ছেক এই তিনটি মূল ভাগে ভাগ করা হয়। এছাড়াও রয়েছে লাটানুপ্রাস।
- যেকোনো অনুপ্রাসই আসলে বৃত্ত্যনুপ্রাস।
- দুই বা ততোধিক ব্যঞ্জনবর্ণ স্বরধ্বনি সমেত নির্দিষ্ট ক্রমে সার্থক, বা নিরর্থক ভাবে ব্যবহৃত হলে হয় যমক অলংকার।
- বাক্যের আদিতে যমক থাকলে হয় আদ্য যমক মধ্যে থাকলে হয় মধ্য যমক এবং শেষে থাকলে হয় অন্ত্য যমক।
- একটি শব্দ একবার মাত্র ব্যবহার করেও কবি যদি তার মধ্যে বিভিন্ন অর্থের ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করতে পারেন তাহলে হয় শ্লেষ অলংকার বা শব্দশ্লেষ অলংকার।
- শ্লেষ অলংকার দ্বিবিধ—অভঙ্গ শ্লেষ এবং সভঙ্গ শ্লেষ।
- শব্দকে না ভেঙে যদি অর্থ পাওয়া যায় তাহলে হয় অভঙ্গ শ্লেষ।
- শব্দকে ভাঙলে যেখানে একাধিক অর্থ পাওয়া যায় সেখানে সভঙ্গ শ্লেষ।
- বক্তা বা প্রশ্নকর্তা যখন কোনো কথাকে বিশেষ অর্থে ব্যবহার করেন অথচ শ্রোতা বা উত্তরদাতা তার অন্য অর্থ গ্রহণ করেন তখন হয় বক্রোক্তি অলংকার।



৭.৭ অতিরিক্ত পঠন

গুপ্ত, অতুলচন্দ্র (১৩৫৫ বঙ্গাব্দ); কাব্যজিজ্ঞাসা; কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়

চক্রবর্তী, শ্যামাপদ (১৩৬৩ বঙ্গাব্দ); অলঙ্কারচন্দ্রিকা; কলকাতা-৯, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লি:

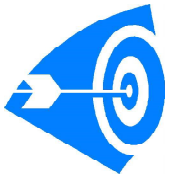
বিশ্বাস, নরেন (১৯৭৬); অলঙ্কার অন্বেষা; কলকাতা-০০৯; পুনশ্চ

ভট্টাচার্য, পরেশচন্দ্র (২০০৪); ছন্দ মীমাংসা ও অলংকার সমীক্ষা; কলকাতা; জয়দুর্গা প্রা: লি:

মজুমদার, অতীন্দ্র (১৩৬৭ বঙ্গাব্দ); ছন্দ ও অলংকার; কলিকাতা-৬; নয়া প্রকাশ

সাত্তার, ড. আব্দুস (আগস্ট ২০০৬); অলংকার; ঢাকা-১১০০; একাত্তর প্রকাশনী

হালদার, দেবাশীষ ও অন্যান্য (২০১৭); সাহিত্যের রূপতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, অলঙ্কার, ছন্দ; ঢাকা; বুকস্ ফেয়ার



৭.৮ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত

১) জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে কথা বলার সময় আমরা যে সকল শব্দ ব্যবহার করি.... বৃত্তানুপ্রাস— (৭ অধ্যায়ের ৭.৪ অংশে দ্রষ্টব্য)



৭.৯ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। উদাহরণ সহ সংজ্ঞা নির্দেশ করে বৃত্ত্যনুপ্রাস অন্ত্যানুপ্রাসের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করুন।

২। অনুপ্রাস বলতে কী বোঝেন? অনুপ্রাস কত প্রকার ও কী কী? প্রত্যেক প্রকারের সংজ্ঞা দিন?

৩। শ্লেষ ও বক্রোক্তির সংজ্ঞা নির্দেশ করুন এবং প্রসঙ্গত এই দুটি অলংকারের সাদৃশ্য ও পার্থক্য দুটি করে উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

৪। "রসানুগত অনুপ্রাসের নাম বৃত্ত্যনুপ্রাস"— এইমত গ্রহণযোগ্য কি না বিচার করুন।

৫। শ্রুত্যনুপ্রাসকে অন্ত্যানুপ্রাসের সহকারী বলা যায় কিনা, উদাহরণ সহকারে আলোচনা করুন।

৬। যমকের সংজ্ঞা দিন। বিভিন্ন প্রকারের যমকের পরিচয় দিন।

অধ্যায় : ৮ বাংলা অলংকার পরিচয়-৩

বিন্যাস ক্রম

৮.১ জ্ঞাতব্য বিষয়
৮.২ পরিচিতি
৮.৩ অর্থালংকারের সামগ্রিক পরিচয়
৮.৪ অর্থালংকার- উপমা
৮.৪.১ রূপক
৮.৪.২ উৎপ্রেক্ষা
৮.৪.৩ অপহ্নুতি
৮.৪.৪ ব্যতিরেক
৮.৪.৫ ব্যাজস্তুতি
৮.৫ নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে অলংকার নির্ণয়
৮.৬ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম
৮.৭ অতিরিক্ত পঠন
৮.৮ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর সংকেত
৮.৯ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৮.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই অধ্যায়টি পড়ে আপনি—

- অর্থালংকারের সামগ্রিক পরিচয় জানবেন
- অর্থালংকারের শ্রেণিবিভাগ জানবেন
- উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, অপহ্নুতি ব্যতিরেক ও ব্যজস্তুতি অলংকারে সংজ্ঞা সম্পর্কে জানবেন। বিভিন্ন প্রকারের অর্থালংকারের নির্ণয় পদ্ধতি সম্পর্কে জানবেন

৮.২ পরিচিতি

অলংকার কাব্যদেহে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে, অলংকারকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে শব্দালংকার ও অর্থালংকার। অর্থালংকারে শব্দের ধ্বনি অপেক্ষা অর্থের প্রাধান্য। শব্দের অর্থ বজায় রেখে যদি শব্দটিকে পরিবর্তিত করা হয় তাহলেও অলংকারটি অক্ষুণ্ণ থাকে। অর্থালংকারকে বেশ কটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে—

সাদৃশ্যবাচক, বিরোধমূলক, শৃঙ্খলাবাচক, ন্যায়মূলক, গূঢ়ার্থপ্রতীতিমূলক ইত্যাদি। সাদৃশ্যবাচক অলংকারে সাধারণত দুটি বিজাতীয় বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য নির্ণয় করা হয়। এই

সাদৃশ্য নির্ণয় হয় কখনও স্বধর্ম বিচার করে যা উপমা অলংকারের মূল কথা, কখনও অভেদ কল্পনা করে যা রূপক অলংকারের মূল আবার কখনও ভেদকে স্বীকার করে যা ব্যতিরেক অলংকারে পাই। প্রত্যেক প্রকার অলংকারেই কখনও সাদৃশ্য কখনও বিরোধ কখনও সংশয় বিচার করে অলংকার নির্ণয় করতে হয়।

৮.৩ অর্থালংকারের সামগ্রিক পরিচয়

যে অলংকার অর্থের উপর নির্ভরশীল তাকে বলে অর্থালংকার। শব্দালংকারে শব্দের পরিবর্তন ঘটলে অলংকার নষ্ট হয় কিন্তু অর্থালংকারে তা নাও হতে পারে। শব্দ পরিবর্তিত হলেও অর্থটি যদি বজায় থাকে তাহলে অর্থালংকার বজায় থাকবে। শব্দালংকারের আবেদন শ্রুতির কাছে কিন্তু অর্থালংকার আবেদন বুদ্ধির কাছে।

তবে শব্দের অর্থটি বোঝা খুব দরকার। অর্থালংকারের ব্যাপকতা অনেক বেশি কারণ শব্দার্থ বিচিত্র। তবু শ্রেণি বিচারে অর্থালংকার পাঁচটি শ্রেণি পাওয়া যায়। প্রত্যেকটি শ্রেণিতে আবার অনেক উপশ্রেণি বা অলংকার থাকে। শ্রেণি পাঁচটি হল—

ক) সাদৃশ্যমূলক অলংকার

খ) বিরোধমূলক অলংকার

গ) শৃঙ্খলামূলক অলংকার

ঘ) ন্যায়মূলক অলংকার এবং

ঙ) গূঢ়ার্থ-প্রতীতিমূলক অলংকার

অলংকারে যে কয়টি শ্রেণিবিভাগ রয়েছে তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল সাদৃশ্যমূলক অলংকার। এই অলংকারে দুটি বিসদৃশবস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য আবিষ্কারের চেষ্টা করা হয়। বিষয় বা বস্তু দুটির স্বভাব ধর্ম বা গুণে বৈসাদৃশ্য থাকলেও কবি দুইয়ের মধ্যে এমন ধর্ম খুঁজে বের করবেন যা বস্তু দুটিকে সাম্যে বেঁধে ফেলে। বস্তু দুটির বাহ্য বৈসাদৃশ্য যত বেশি হয়, অলংকার ততই সৌন্দর্যময় হয়ে ওঠে। সদৃশ বস্তুতে তুলনা হয় না। যদি তুলনা করা হয়েও থাকে, তাতে সৌন্দর্য সৃষ্টি হয় না। চোখের সঙ্গে চোখের তুলনায় অলংকার হয় না কারণ সমজাতীয় বলে এরা বৈচিত্র্যহীন। কিন্তু যখন বলা হয় 'তোমার চোখটি হরিণীর মতো' তাহলে সেই চোখের অর্থগত বিস্তৃতি ঘটে এবং সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়। দুটি বিসদৃশ বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য দেখাতে গেলে তার চারটি দিকের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হয়। এই চারটি দিকে সাদৃশ্যবাচক অলংকারের চারটি অঙ্গ বলা হয়। যেমন—

ক) তুলনার বিষয় অর্থাৎ যাকে তুলনা করা হয় তাকে বলে উপমেয়।

খ) যার সঙ্গে তুলনা করা হয় তাকে বলে উপমান

গ) যে কারণে তুলনা করা হয় বা যে সাধারণ ধর্ম তুলনা সম্ভব করে।

ঘ) যেভাবে তুলনাটি বোঝানো হয় বা যে ভঙ্গিতে তুলনাটি দেখানো হয় তাকে

বলে তুলনাবাচক বা সাদৃশ্যবাচক শব্দ।

সাদৃশ্য বা স্বধর্ম বিচার করা যায় তিনটি উপায়ে— ক) বস্তুটির দুটির সমান মূল্য স্বীকার করে-উপমা অলংকারে পাই। খ) বস্তু দুটির অভেদ কল্পনা করে রূপক অলংকারে পাই। গ) বস্তু দুটির ভেদকে প্রাধান্য দিয়ে ব্যতিরেক অলংকার পাই। আরও কিছু শব্দ যুগ্ম উপমেয় উপমান বোঝাতে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যেমন—

বিষয়-বিষয়ী, প্রকৃত-অপ্রকৃত, প্রস্তুত-অপ্রস্তুত ইত্যাদি। এরা ঠিক উপমেয় উপমানের প্রতিশব্দ নয় তাবে সমার্থক। উপমেয়, উপমান সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণার জন্য উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বোঝানো যেতে পারে। যেমন— 'কাজলের মতো কালো কুন্তল পড়েছে ঝুলে'। এখানে 'কুন্তল'-কে কাজলের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। সুতরাং উপেমেয় এখানে 'কুন্তল', উপমান 'কাজল', সাধারণ ধর্ম দু-ক্ষেত্রেই 'কালো', এবং তুলনা বাচক শব্দ 'মতো'। সাদৃশ্যবাচক অলংকারের চারটি অঙ্গই এখানে বর্তমান। যেসব শব্দ দ্বারা তুলনাটিকে প্রকাশ করা হয় সেগুলি হল-মতো, সম, যথা, যেমতি, যেমন, তুল, তুলনা, প্রায়, হেন, মতন, উপমা, তুল্য, কল্প, জাতীয়, সঙ্কাশ, যেন, সদৃশ, প্রতিকাশ, বৎ ইত্যাদি।

সাদৃশ্যবাচক অলংকারের মধ্যে রয়েছে— উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, অপহ্নুতি, সন্দেহ, নিশ্চয়, ভ্রান্তিমান, ব্যতিরেক, সমাসোক্তি, অতিশয়োক্তি, উল্লেখ, দীপক, সহোক্তি, দৃষ্টান্ত, নিদর্শনা, প্রভৃতি।

❐ বিরোধমূলক অলংকার

বিসদৃশ বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য আবিষ্কারের যেমন চমৎকারিত্ব তৈরি হয় তেমনই বৈষম্য বোধেও মনে আনন্দ জন্মে। প্রথম ক্ষেত্রে হয় সাদৃশ্যবাচক অলংকার, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে হয় বিরোধমূলক অলংকার। যখন দুটি বস্তুকে আপাতদৃষ্টিতে বিরোধী মনে হয় বা তাদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয় কিন্তু তাৎপর্য বিশ্লেষণে বিরোধের অবসান হয় তাহলে হয় বিরোধমূলক অলংকার। যেমন—

"সবে বলে মোরে কানু-কলঙ্কিনী গরবে ভরল দে।" কলঙ্কিত হওয়ার সঙ্গে গৌরবের কোনো সাদৃশ্য নেই, আছে বিরোধ। এই বিরোধের অবসান ঘটে তাৎপর্য বিশ্লেষণে। কারণ কলঙ্ক কৃষ্ণের সাথে সম্পর্কের সূত্রে সুতরাং এই কলঙ্ক তো গৌরবেরই শ্রী রাধার কাছে। আবার যখন কবি বলেন—

"অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময় লোভিব মুক্তির স্বাদ" এখনও দেখি বন্ধনে মুক্তির কথা বলা হয়েছে। বন্ধন মুক্তির বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। বিরোধমূলক অলংকারের মধ্যে রয়েছে 'বিরোধাভাস', 'বিভাবনা', 'বিশেষোক্তি', 'অসঙ্গতি', 'বিষম' প্রভৃতি অলংকার।

❐ শৃঙ্খলামূলক অলংকার

কোনো কারণের কার্য যদি পরবর্তী কোনো কার্যের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে হয় শৃঙ্খলামূলক অলংকার। শৃঙ্খলামূলক অলংকার এর মধ্যে আছে—

'কারণমালা', 'একাবলি', 'সার', 'মালাদীপক' প্রভৃতি অলংকার। উদাহরণ দিয়ে শৃঙ্খলামূলক অলংকার বোঝানো যেতে পারে—

"লোভে পাপ পাপে মৃত্যু শাস্ত্রের বচন।
অতএব কর সবে লোভ সম্বরণ।"

'লোভ' যদি কারণ হয় তার কার্য হল 'পাপ'। এই 'পাপ' আবার 'মৃত্যুর' কারণ হয়েছে সুতরাং এটি 'কারণমালা' শৃঙ্খলামূলক অলংকার।

❐ ন্যায়মূলক অলংকার

'যুদ্ধের দ্বারা যুদ্ধের মূল উৎপাটন করা যায় না'; 'হিংসার সাহায্যে হিংসা দমন করা যায় না অথবা 'এই জগতে হায় সেই বেশি চায় যার আছে ভুরি ভুরি' এ সমস্তই ন্যায়মূলক সত্য। সুতরাং শিল্পী যখন তাঁর দৃষ্টিতে কোনো বিষয়কে ন্যায়মূলক সত্যের আশ্রয়ে অলংকারের আকারে শৈল্পিক সৌন্দর্য প্রকাশ করেন তখন হয় ন্যায়মূলক অলংকার। ন্যায়মূলক অলংকারের মধ্যে রয়েছে— অর্থাপত্তি, কাব্যলিঙ্গ, অনুমান, পরিবৃত্ত বা বিনিময়, পর্যায় এবং সমুচ্চয় অলংকার।

❐ গূঢ়ার্থ-প্রতীতিমূলক অলংকার

বর্ণনার বিষয় থেকে বিষয়ান্তরের প্রতীতি সৃষ্টি হয় যে অলংকারে তাকেই বলা হয় গূঢ়ার্থপ্রতীতিমূলক অলংকার। কেউ কেউ একে ব্যঞ্জনামূলক ও ন্যায়মূলক অলংকার বলেছেন। কোনো একটি বিষয় বর্ণিত হয়, কিন্তু তা থেকে ব্যঞ্জিত হয় ভিন্নতর বিষয়, তা থেকে সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়। বক্তব্যের মধ্যে একটা গূঢ় অর্থ নিহিত থাকে বলেই এই নামকরণ ধরা হয়েছে। এই অলংকার শ্রেণির মধ্যে রয়েছে অপ্রস্তুত প্রশংসা, অর্থান্তরন্যাস, ব্যাজস্তুতি এবং স্বভাবোক্তি অলংকার। এছাড়াও কিছু অলংকার আছে যা বাংলা কাব্যে হয় কিন্তু তার বেশি উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

যেমন— 'তুল্যযোগিতা', 'দীপক', 'সহোক্তি', 'সমাধি', 'ভাবিক', 'পরিবৃত্তি', 'সামান্য', 'সূক্ষ্ম', 'অধিক', 'পরিসংখ্যা' ইত্যাদি।

৮.৪ সাদৃশ্যবাচক অর্থালংকার

❐ উপমা

সাধারণত উপমা শব্দটি তুলনা অর্থে ব্যবহার করা হয়। 'চাঁদের মত মুখ' বলতে বোঝায় সেই মুখমণ্ডল যার সৌন্দর্য চাঁদের সঙ্গে তুলনীয়। যদি বলা হয় 'উপমার সঙ্গে কি

প্রাণের উপমা?' তখন উপমা শব্দটি কিন্তু তুলনা অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে, তুলনার উপর নির্ভর করে যেসব অলংকারের সৃষ্টি হয়েছে, তাদের উপমাই বলা চলে । তবে 'উপমা' অলংকার বলতে বোঝায়— "একই বাক্যে স্বভাব ধর্মে বিজাতীয় দুটি পদার্থের বিসদৃশ কোনো ধর্মের উল্লেখ না করে যদি শুধু বিশেষ গুণ বা অবস্থায় অথবা ক্রিয়ায় পদার্থ দুটির সাম্য অর্থ সাদৃশ্য দেখানো হয়, তাহলে হয় উপমা অলংকার।" আসলে দুটি বিজাতীয় বস্তুর মধ্যে যে সাদৃশ্য তাই উপমা অলংকারের মূল কথা। যেমন— "জনগণে যারা জোঁক সম শোষে তারে মহাজন কয়।"

'জোঁক' এবং 'মহাজন' দু'টি বিজাতীয় প্রাণী। এখানে 'শোষে' বা 'শোষণ করে' ক্রিয়াটি দুটি প্রাণীর মধ্যে সাম্য ঘটিয়েছে। এখানে তুলনা করা হয়েছে জোঁকের সঙ্গে মহাজনকে। দুটি প্রাণীরই সাধারণ ধর্ম শোষণ করা, জোঁক মানুষের রক্ত শোষণ করে মহাজন ও তাই, এবং দুটি বিজাতীয় প্রাণী যোগ বা তুলনা বোঝানো হয়েছে 'সম' শব্দ ব্যবহার করে। উপমার নানা বিভাগ আলংকারিকগণ কল্পনা করেছেন। ড. অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় বলেছেন উপমা প্রধানত চার রকম— পূর্ণোপমা, লুপ্তোপমা, বস্তু-প্রতিবস্তুভাবের উপমা এবং বিম্ব প্রতিবিম্বভাবের উপমা। তবে অন্যান্য কিছু আলংকারিক উপমার আরও কয়েকটি বিভাগ কল্পনা করেছেন, যেমন— মালোপমা, স্মরণোপমা, মহোপমা ইত্যাদি।

❐ পূর্ণোপমা

যে উপমায় উপমেয়, উপমান, সাধারণ ধর্ম এবং সাদৃশ্যবাচক বা তুলনা বাচক শব্দ এই চারটি অঙ্গই বর্তমান থাকে তাকে পূর্ণোপমা বলে। বিভিন্ন তুলনাবাচক শব্দ এই অলংকারের ব্যবহৃত হতে পারে। তারই কিছু নিম্নে দেওয়া হল— মতো, সম, যথা, যেমতি, যেমন, প্রায়, পারা, হেন, মতন, নিভ, তুল, তুলনা, উপমা, তুল্য, জাতীয়, সদৃশ্য, বৎ, কল্প ইত্যাদি। এদের প্রত্যেকটির ব্যবহার সাহিত্যে মেলে। উদাহরণ দিয়ে পূর্ণোপমা অলংকার বোঝানো যেতে পারে—

ক) "ননীর মত শয্যা কোমল পাতা"

এখানে উপমেয় শয্যা, উপমান ননী, সাধারণ ধর্ম কোমল এবং তুলনা বাচক শব্দ মত। চারটি অঙ্গ থাকার জন্য এটি পূর্ণোপমা অলংকার।

খ) "ক্ষণে ক্ষণে তনু ক্ষীণ চৌদশী চাঁদ সমান।"

এখানে উপমেয় তনু, উপমান চৌদশী বা চতুর্দশীর চাঁদ সাধারণ ধর্ম ক্ষীণ, তুলনা বাচক শব্দ সমান। চারটি অঙ্গই বর্তমান। সুতরাং পূর্ণোপমা অলংকার।

❐ লুপ্তোপমা

যে উপমা অলংকারে উপমেয় ছাড়া উপমান, সাধারণ ধর্ম বা তুলনা বাচক শব্দের মধ্যে যে কোনো একটি, দুটি বা তিনটিই লুপ্ত থাকে তখন হয় লুপ্তোপমা অলংকার।

যেমন—

ক) উপমান লোপ

"বড়-বড় দুটি চক্ষু পল্লব-প্রচ্ছায় রেখো মোর মুখপানে। এখানে উপমান 'ফুলদল' লুপ্ত।

খ) তুলনা বাচক শব্দলোপ

"শালপ্রাংশু মহাভুজরথী।"

এখানে উপমেয় 'ভুজ বা হাত' উপমান 'শাল গাছ' সাধারণ ধর্ম 'দীর্ঘ' তুলনাবাচক শব্দ 'মতো' লুপ্ত

গ) সাধারণ ধর্ম লোপ "কণ্টক গাড়ি কমলসম পদতল মঞ্জীর চীর হি ঝাঁপি।" এখানে উপমেয় 'পদতল' উপমান 'কমল' সাধারণ ধর্ম 'লুপ্ত' তুলনাবাচক শব্দ 'সম'।

ঘ) সাধারণ ধর্ম ও তুলনাবাচক শব্দলোপ

"নীরবিলা শশীমুখী।"

এখানে উপমেয় সীতা (শশীমুখী) উপমান 'শশী' তবে সাধারণ ধর্ম 'সৌন্দর্য' এবং তুলনাবাচক শব্দ 'মতো' বা 'সম' লুপ্ত।

ঙ) উপমান ও তুলনা বাচক শব্দলোপ

"মেঘলা দিনে দেখেছিলেম মাঠে/কালো মেয়ের কালো হরিণ-চোখ।" এখানে উপমেয় 'চোখ' সাধারণ ধর্ম 'কালো' কিন্তু উপমান ও তুলনাবাচক শব্দ লুপ্ত।

চ) উপমান সাধারণ ধর্ম ও তুলনাবাচক শব্দলোপ

"তড়িত বরণী হরিণ নয়নী দেখিনু আঙিনা মাঝে।" এতে উপমান নেই, সাধারণ ধর্ম নেই, এমনকি তুলনাবাচক শব্দও নেই। শুধু উপমেয় আছে। তড়িত এর মতো বরণ যার অর্থাৎ রাঁধা, হরিণ নয়নী যে অর্থাৎ হরিণের মতো নয়ন যার। দুটিতেই বহুব্রীহি সমাস রয়েছে। সমাস ভাঙলে উপমার পূর্ণরূপের দেখা মেলে।

❐ বস্তু-প্রতিবস্তু ভাবের উপমা

উপমেয় ধর্মকে বস্তু এবং উপমান ধর্মকে প্রতিবস্তু বলা হয়। উপমেয় এবং উপমানে সাধারণ ধর্ম যদি ভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত হয় তবে সাধারণ ধর্মের একার্থ কিন্তু ভিন্ন ভাষারূপ দুটিকে বলা হয় প্রতিবস্তু। সুতরাং বলা যায়, যে উপমা অলংকারে উপমেয় এবং উপমানের সাধারণ ধর্ম বস্তু প্রতিবস্তু ভাবাপন্ন অর্থাৎ ভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত হলেও যদি অর্থের দিক থেকে সদৃশ্য বা তুলনা বাচক শব্দটি উপস্থিত থাকে তাকে বলা হয় বস্তু-প্রতিবস্তুভাবের উপমা। যেমন—

ক) "দারুণ নখের ঘা হিয়াতে বিরাজে/ রক্তোৎপল ভাসে হেন নীল সরোমাঝে।"

এখানে উপমেয় 'নখের ঘা', উপমান 'রক্তোৎপল', তুলনাবাচক শব্দ 'হেন' এবং সাধারণ ধর্ম ভিন্ন অর্থে প্রকাশিত 'বিরাজে'/ 'ভাসে' ফলে বস্তু প্রতিবস্তু এবং এরা ভাষায় ভিন্ন কিন্তু অর্থে এক।

খ) "রকত-উৎপল ফুলে/ যৈছে ভ্রমর বুলে ঐছে ফিরয়ে দুই আঁখি।" এখানে উপমেয় 'আঁখি' উপমান 'ভ্রমর' সাধারণধর্ম 'বুলে' এবং 'ফিরে' একই অর্থে কিন্তু ভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত তাই বস্তু প্রতিবস্তু ভাবের উপমা।

❐ বিম্ব প্রতিবিম্ব ভাবের উপমা

উপমেয়ের ধর্মকে বিম্ব এবং উপমানের ধর্মকে প্রতিবিম্ব বলা হয়, যে উপমা অলংকারে সাধারণ ধর্ম ভিন্ন ভাষায় ভিন্ন অর্থে প্রকাশ পায় অথচ তাদের মধ্যে একটা সূক্ষ্ম সাদৃশ্য অনুভব করা যায় তবে হয় বিম্ব প্রতিবিম্ব ভাবের উপমা। যেমন—

"আগুনে যেমন সব বিষ যায়, প্রেমেও তেমনি সকলই শুচি।"

এখানে উপমেয় 'আগুন', উপমান প্রেম, 'সব বিষ যায় ও সকলি শুচি', সাধারণ ধর্ম আপাতদৃষ্টিতে ভিন্নার্থক হলেও একটা সূক্ষ্ম সাদৃশ্য রয়েছে। আগুন যেমন সব কিছুকে পুড়িয়ে উজ্জ্বল করে তোলে, তেমনি প্রেমও সব কলঙ্কিতকে বিনষ্ট করে 'শুচি' হয়ে ওঠে।

খ) "কানুর পিরীতি বলিতে বলিতে/ পাঁজর ফাটিয়া উঠে।/শঙ্খবণিকের করাত যেমতি/আসিতে যাইতে কাটে।।"

এখানে উপমেয় 'কানুর পিরিতি', উপমান শঙ্খবণিকের করাত, সাধারণ ধর্ম প্রথম ক্ষেত্রে 'বলিতে বলিতে পাঁজর ফাটিয়া উঠে এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে 'আসিতে যাইতে কাটে'। ভিন্ন শব্দ দিয়ে প্রকাশিত হলেও একটা সূক্ষ্ম সাদৃশ্য বর্তমান। তা হল বেদনাবোধ। অতএব বিম্ব প্রতিবিম্ব ভাবের উপমা।

❐ মালোপমা

যেখানে উপমেয় একটি কিন্তু তার উপমান অনেক, এ ধরনের উপমাকে মালোপমা বলে। এ যেন উপমেয়র গলায় উপমানের মালা। সেজন্যই এই নামকরণ করা হয়েছে। যেমন—

"আমার হৃদপিণ্ডের মতো আমার সত্তার মতো আমার অজানা স্নায়ুতন্ত্রীর মতো সর্বক্ষণ সত্য আমার দেশ।"

এখানে উপমেয় দেশ কিন্তু উপমান 'হৃদপিণ্ড', 'সত্তা', 'অজানা স্নায়ুতন্ত্রী'। তুলনাবাচক শব্দ মতো দিয়ে তুলনা করা হয়েছে। একটি উপমেয় কিন্তু তার গলায় উপমানের মালা হওয়ায় মালোপমা।

খ) "কুন্দেন্দু তুষার শঙ্খ শুচিশুভ্র সৌন্দর্যের রাণী, মূর্তিমাঝে উর বীণাপাণি।" এখানে উপমেয় বীণাপাণি কিন্তু উপমান 'কুন্দ,' 'ইন্দ', 'তুষার', 'শঙ্খ'। সুতরাং মালোপমা অলংকার।

❐ স্মরণোপমা

কোনো পদার্থকে দেখে বা অনুভব করে যদি সেরকম অন্য কোনো বস্তুর স্মৃতি মনে

জাগে তাহলে হয় স্মরণোপমা অলংকার। যেমন—

"কালো জল ঢালিতে সই কালা পড়ে মনে, নিরবধি দেখি কালা শয়নে স্বপনে।"

কালো জল দেখে তৎসদৃশ কালা বা শ্রীকৃষ্ণের কথা রাধার মনে জেগেছে। সুতরাং স্মরণোপমা অলংকার। কিন্তু মনে রাখতে হবে স্মৃতি রোমন্থন করলে বা স্মরণ থাকলেই হবে না, তৎসদৃশ কোনো বস্তুর কথা মনে জাগতে হবে তবেই স্মরণোপমা অলংকার হবে। যেমন—

"বসি তার তলে নয়নের জলে শান্ত হইল ব্যথা, একে একে মনে উদিল স্মরণে বালক কালের কথা।"

এখানে স্মৃতির রোমন্থন আছে কিন্তু তৎসদৃশ কোনো বস্তুর কথা মনে আসেনি সুতরাং স্মরণোপমা দৃষ্টান্ত নয়।

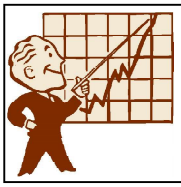
❐ মহোপমা

যে উপমায় উপমানের শক্তি ও সৌন্দর্য বিশদভাবে বর্ণিত হয় ফলে তা একটি স্বতন্ত্র ও সম্পূর্ণ চিত্রের আকার ধারণ করে। কবি এখানে উপমেয়কে ত্যাগ করে উপমানকেই সজ্জিত করেন। এই জাতীয় উপমাকেই বলা হয় 'মহোপমা'। যেমন— "কাদিল মাধব প্রিয়া উল্লাসে শুষিলা/অশ্রুবিন্দু বসুন্ধরা-শুষে শক্তি যথা/যতনে, হে কাদম্বিনী, নয়নম্বু তব,/অমূল্য মুকুতা ফল ফলে যার গুণে/ভাতে যবে স্বাতী সতী গগন মণ্ডলে।"



আসুন জেনে নেই

ইউরোপীয় মহাকাব্যে বিশেষ করে হোমারের মহাকাব্যে epic smile - নামক এক অলংকার ব্যবহৃত হয়েছে। এরই সাদৃশ্য বাংলায় এক ধরনের উপমার ব্যবহার করেছেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। অবশ্য অনেক অলংকারিকই এর বিশেষ রূপকে অস্বীকার করেছেন তবে অধ্যাপক সুধীরকুমার দাশগুপ্ত তাঁর 'কাব্যশ্রী' নামক গ্রন্থে এই জাতীয় উপমা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং নাম দিয়েছেন 'মহোপমা'।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

১. সাদৃশ্যবাচক অলংকারের পরিচয় দিন। (১০০ শব্দের মধ্যে)

৮.৪.১ রূপক

উপমেয়কে সম্পূর্ণ অস্বীকার না করে যদি তার উপর উপমানের অভেদ আরোপ করা হয় তাহলে রূপক অলংকার হয়। আসলে একটি বস্তুর উপরে অন্য একটি বস্তুকে এমনভাবে স্থাপন করা হয় যাতে দ্বিতীয় বস্তুটি প্রথম বস্তুটিকে নিজের রূপে রূপায়িত করে নেয়। ড. অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় বলেছেন— "স্বরূপে অর্থাৎ

বস্তুগতভাবে উপমেয় উপমান বিভিন্ন হলেও তাদের অতি সম দেখাবার জন্যই কাল্পনিক অভেদারূপের নাম রূপক।" এই অলংকারে উপমেয় অস্বীকৃত নয় কিন্তু তার গুরুত্ব অপেক্ষাকৃত কম। মনে রাখতে হবে রূপক অভেদ প্রধান হলেও অভেদ সর্বস্ব নয়। উদাহরণ দিয়ে বোঝানো যেতে পারে—

"এমন মানব জমিন রইল পতিত
আবাদ করলে ফলতো সোনা।" এখানে উপমেয় 'মানব' উপমান 'জমিন'। সাধারণ ধর্ম 'আবাদ করা'। উপমেয়র ওপরে উপমান আরোপিত হয়েছে। সুতরাং রূপক অলংকার।

রূপকের প্রকারভেদ

বাংলায় মোট চার প্রকার রূপকের কথা বলা হয়েছে নিরঙ্গরূপক, সাঙ্গ রূপক, পরম্পরিত রূপক এবং অধিকারূঢ়বৈশিষ্ট্য রূপক।

❒ **নিরঙ্গ রূপক**

একটি মাত্র উপমেয় বা বিষয়ের উপর যদি এক বা একাধিক উপমান বা বিষয়ী আরোপিত হয় তবে তাকে বলা হয় নিরঙ্গ রূপক। নিরঙ্গ রূপক দু ভাগে বিভক্ত— কেবল রূপক এবং মালা রূপক।

- **কেবল নিরঙ্গ রূপক**

যখন একটি উপমেয়র উপর একটি উপমানের অভেদরূপ কল্পনা করা হয় তখন হয় কেবল রূপক। যেমন—

ক) "শিশু-ফুলগুলি তোমারে ঘেরিয়া ফুটে।" এখানে উপমেয় 'শিশু' উপমান 'ফুল' সাধারণ ধর্ম 'ফুটে' পদটি উপমানের অনুগামী। এখানে উপমেয় 'শিশু' অস্বীকৃত নয় তবে গৌণ। তাই কেবল নিরঙ্গ রূপক অলংকার হয়েছে।

খ) "আসল কথাটা চাপা দিতে ভাই/ কাব্যের জাল বুনি।" এখানে উপমেয় 'কাব্য' উপমান 'জাল' সাধারণ ধর্ম 'বুনি' বা বোনা উপমানের অনুগামী। 'কাব্য' এখানে গৌণ। তাই কেবল নিরঙ্গ রূপক অলংকার হয়েছে।

- **মালা নিরঙ্গ রূপক**

যখন একটি উপমেয়র উপর অনেক উপমানের মালার অভেদরূপ কল্পনা করা হয় তবে হয় মালা রূপক। যেমন—

ক) "আমি কি তোমার উপদ্রব অভিশাপ, দূরদৃষ্ট, দু:স্বপন, করলগ্ন কাঁটা?" এখানে উপমেয় 'আমি'র উপর একাধিক উপমান যথা—
'উপদ্রব', 'অভিশাপ', 'দূরদৃষ্ট', 'দু:স্বপন', 'করলগ্ন কাঁটা' র অভেদ আরোপ হয়েছে। সুতরাং মালা নিরঙ্গ রূপক।

খ) "হাথক দরপণ মাথক ফুল।
নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বুল।।" এখানে উপমেয় 'কৃষ্ণ' উহ্য, উপমান একাধিক, যথা— 'হাথক দরপণ', 'মাথক ফুল', 'নয়ন অঞ্জন', 'মুখক তাম্বুল' অতএব মালা নিরঙ্গ রূপক।

- **সাঙ্গ রূপক**

যে রূপক অলংকারে অঙ্গসমেত উপমেয়র উপরে অঙ্গসমেত উপমানের অভেদরোপ হয় তাকে বলে সাঙ্গ রূপক। সাঙ্গ অর্থাৎ সহ। উদাহরণ দিয়ে 'সাঙ্গ' ব্যাপারটি বোঝানো যেতে পারে। ধরা যাক চরণকে পঙ্কজ বলা হয়েছে অর্থাৎ উপমেয় চরণের উপর উপমান পঙ্কজের অভেদ রূপ করা হয়েছে। এখন চরণের অঙ্গ আঙুল ও নখ। চরণ যদি অঙ্গী হয় আঙুল ও নখ অঙ্গ। ঠিক তেমনি উপমান পঙ্কজ অঙ্গ, তার অঙ্গী হল দল, কেশর ইত্যাদি। সুতরাং অঙ্গ সমেত উপমেয়র উপর অঙ্গ সমেত উপমানের আরোপ যখন হবে তখন হয় সাঙ্গ রূপক। যেমন—

"কোদালে" মেঘের মউজ উঠেছে
আকাশের নীল গাঙে/ হাবুডুবু খায় তারা বুদ্‌বুদ্।"

উপমেয় এখানে 'আকাশ', তার অঙ্গ মেঘ, তারা। উপমান 'নীলগাঙ' যার অঙ্গ মউজ, বুদবুদ। অঙ্গ সমেত উপমেয় অভেদারোপ করা হয়েছে। তাই এটি সাঙ্গ রূপক।

- **পরম্পরিত রূপক**

যদি একটি উপমেয় উপমানের অভেদারোপ অন্য উপমেয় উপমানের অভেদের কারণ হয় তবে হয় পরম্পরিত রূপক। এখানে কার্য কারণ সম্বন্ধ থাকে বলে বলা হয় 'পরম্পরিত'। যেমন—

ক) "হৃদয় কাননে কতশত আশালতা শুকায়ে মরিল।"
এখানে উপমেয় 'হৃদয়'এর উপর উপমান 'কাননে'র অভেদারোপ হওয়াতে উপমেয় 'আশা'র উপর উপমান 'লতা'র অভেদ আরোপ হয়েছে।

খ) "কেমনে বিদায় তোরে করি, রে বাছনি, আঁধারি হৃদয়াকাশে তুই পূর্ণশশী আমার?" এখানে উপমেয় 'তুই (ইন্দ্রজিৎ)-এ 'পূর্ণশশী'র অভেদারোপ হয়েছে বলেই উপমেয় 'হৃদয়'- এ উপমান 'আকাশ'-এর আরোপের কারণ। তাই পরম্পরিত রূপক অলংকার হয়েছে।

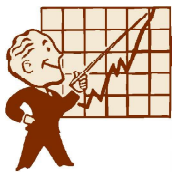
- **অধিকারূঢ়বৈশিষ্ট্য রূপক**

কোনো উপমান যদি অধিকারূঢ় অর্থাৎ অসম্ভব ধর্মবিশিষ্ট হয় এবং সেই উপমান যদি উপমেয়ে আরোপ করা হয়, তবে অধিকারূঢ়বৈশিষ্ট্য রূপক অলংকার হয়। যেমন—

ক) "ও নব জলধর অঙ্গ/ ইহ থির বিজুরীতরঙ্গ।"

এখানে 'ও নব জলধর অঙ্গ' বলতে কৃষ্ণকে বোঝানো হয়েছে। বিদ্যুৎতরঙ্গকে 'থির' বা স্থির কল্পনা করে রাধার উপর আরোপ করা হয়েছে।

খ) "অভিনব হেম কল্পতরু সঞ্চরু" এখানে উপমেয় 'চৈতন্যদেব' উহ্য, উপমান 'কল্পতরু' কিন্তু হেম নির্মিত কল্পতরু অবাস্তব, অসম্ভব কিন্তু কল্পনায় তা সম্ভব করা হয়েছে তাই অধিকারূঢ় বৈশিষ্ট্য রূপক অলংকার হয়েছে।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

২. রূপক অলংকার সম্পর্কে লিখুন। (১০০ শব্দের মধ্যে)

৮.৪.২ উৎপেক্ষা

উপমেয়কে উৎকট বা প্রবল সাদৃশ্য হেতু উপমান বলে সংশয় হলে উৎপ্রেক্ষা অলংকার হয়। বস্তুত 'উপ্রেক্ষা' শব্দের অর্থ উৎকট জ্ঞান, কল্পনা বা মিথ্যা। কবি তার নৈপুণ্যে এই মিথ্যা কল্পনা কেউ সৌন্দর্যমণ্ডিত করেন। উৎপ্রেক্ষা অলংকারে উপমানের প্রতি এমন আকর্ষণ সৃষ্টি হয় যাতে উপমান অর্থাৎ সংশয়ের বস্তুটিকে সত্য বলে মনে হয়।

উৎপ্রেক্ষায় যে সংশয় জাগে তা এককোটিক। শুধুই উপমানের দিক থেকে এই সংশয় জাগে। উৎপেক্ষা দু'রকম যথা- বাচ্যোৎপ্রেক্ষা এবং প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা।

- **বাচ্যোৎপ্রেক্ষা**

যে উৎপ্রেক্ষা অলংকারে সম্ভাবনাবাচক শব্দ উল্লেখিত থাকে, সেখানে হয় বাচ্যোৎপ্রেক্ষা অলংকার। বাংলায় কিছু সম্ভাবনা বাচক শব্দ: যেন, বুঝি, মনে হয়, মনে গানি, বোধ হয় ইত্যাদি।

উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বোঝানো যেতে পারে—

ক) "ধরণী এগিয়ে আসে দেয় উপহার/ ও যেন কনিষ্ঠা মেয়ে দুলালী আমার।" উপমেয় 'ধরণী'কে প্রবল সাদৃশ্যবশত উপমান 'কনিষ্ঠ মেয়ে' বলে সংশয় হয়। 'যেন' সম্ভাবনা বাচক শব্দ ব্যবহার করে এই সংশয় সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই বাচ্যোৎপ্রেক্ষা অলংকার।

খ) "ফেনিল সলিল রাশি বেগ ভরে পড়ে আসি চন্দ্রলোক ভেঙ্গে যেন পড়ে ধরণীতে।"-এখানে 'ফেনিল সলিল রাশি/ বেগ ভরে পড়ে আসি' উপমেয় কিন্তু উপমান 'চন্দ্রলোক ভেঙ্গে যেন পরে ধরণীতে' প্রবল হওয়াতে এবং সম্ভাবনা বাচক শব্দ 'যেন' থাকায় এটি বাচ্যোৎপ্রেক্ষা হল।

- **প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা**

যে উৎপ্রেক্ষায় সম্ভাবনা বাচক শব্দ থাকে না অথচ অর্থ থেকে সম্ভাবনার ভাবটি অনুমান করে নিতে হয়, তাকে বলে প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা অলংকার। যেমন—

ক) "কি পেখলু নটবর গৌর কিশোর/ অভিনব হেম-কল্পতরু-সঞ্চরু/সুরধুনি তীরে উজোর।" উপমেয় 'নটবর গৌরকিশোর'কে ছাপিয়ে প্রধান হয়ে উঠেছে উপমান 'হেমকল্পতরু' অতএব উৎপ্রেক্ষা অলংকার, কিন্তু বাচকতাবোধক কোনো শব্দ এখানে নেই তাই এটি প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা অলংকার।

খ) "একখানি গ্রাম শোভে জলময় মাঠে
গঙ্গা-মৃত্তিকার ফোঁটা গগন-ললাটে।"
উপমেয় জলময় মাঠে সুন্দর শোভিত একটি গ্রাম, কিন্তু উপমেয়কে ছাপিয়ে প্রধান হয়ে উঠেছে উপমান গঙ্গা মৃত্তিকার ফোঁটা যা শোভিত হচ্ছে গগন ললাটে। বাচকতা বোধগম্য তাই প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা অলংকার।

৮.৪.৩ অপহ্নুতি

প্রকৃত বা উপমেয়কে অপহ্নব অর্থাৎ নিষেধ বা অস্বীকার করে যদি অপ্রকৃত বা উপমানের প্রতিষ্ঠা হয় তাহলে অপহ্নুতি অলংকার হয়। এই অলংকারে উপমেয়কে অস্বীকার করে উপমানকে উজ্জ্বলভাবে প্রতিষ্ঠা করা হয়। রূপক অলংকার-এর সঙ্গে এই অলংকারের কিছু সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য আছে। উভয় অলংকারেই উপমেয় ও উপমানে অভেদ কল্পনা ধরা হয় কিন্তু রূপকের তুলনায় অপহ্নুতি অভেদের পরিমাণ অনেক বেশি।

অপহ্নুতিতে উপমেয়কে দুই ভাবে অস্বীকার করা হয়—

ক) না, নয়, নহে ইত্যাদি নিষেধাত্মক অব্যয় প্রয়োগ করে। খ) ছল, ব্যাজ, ছদ্ম, ছলনা ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করে। যেমন— ক) "তারাই আজি নিঃস্ব দেশে কাঁদছে হয়ে অন্নহারা;/ দেশের যত নদীর ধারা জল না, ওরা অশ্রুধারা !" এখানে উপমেয় 'জল' উপমান 'অশ্রু'। না অব্যয় যোগ করে উপমেয়কে অস্বীকার করা হয়েছে। সুতরাং এটি প্রথম শ্রেণির অপহ্নুতি অলংকার। আবার "চোখে চোখে কথা নয় গো, বন্ধু, আগুনে আগুনে কথা।"— এখানে উপমেয় চোখকে নয় অব্যয় যোগ করে উপমান আগুনকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

খ) "বৃষ্টি ছলে গগন কাঁদিলা।" এখানে উপমেয় 'বৃষ্টি' উপমান 'কান্না', ছলে শব্দযোগে বৃষ্টিকে অস্বীকার করা হয়েছে বলে এটি অপহ্নুতি অলংকার।
আবার "দেবতা আশিস ছলে বরষে শিশির।" এখানে দেবতার আশিস্‌কে অস্বীকার করে উপমান 'শিশির'কে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে ছলে 'শব্দ' প্রয়োগে।

৮.৪.৪ ব্যতিরেক

যদি উপমান অপেক্ষা উপমেয়কে উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট করে প্রকাশ করা হয় তবে হয় ব্যতিরেক অলংকার। যেমন—

ক) "যে জন দেখিয়াছে বিদ্যার চলন সেই বলে ভাল চলে মরাল বারণ।।"
এখানে উপমান মরাল ও বারণ অপেক্ষা উপমেয় বিদ্যার চলন এর উৎকর্ষ প্রদর্শিত হয়েছে কিন্তু তুলনার দ্বারা এই উৎকর্ষ ব্যক্ত হয়নি ব্যঞ্জনায় বোঝা যাচ্ছে। সুতরাং ব্যতিরেক অলংকার।

খ) "সুধা হতে সুধাময় দুগ্ধ তার।" এখানে উপমান 'সুধা' থেকে উপমেয় 'তার' (শুক্রাচার্যে আশ্রম ধেনু)-দুগ্ধ বেশি সুধাময় বলা হয়েছে। অর্থাৎ উপমেয়ের উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে।

৮.৪.৫ গূঢ়ার্থপ্রতীতিমূলক অলংকার

ব্যাজস্তুতি

যদি স্তুতির সাহায্যে নিন্দা বা নিন্দার সাহায্যে স্তুতি কবি কল্পনার চমৎকারিত্বে ব্যঞ্জিত হয় তাহলে হয় ব্যাজস্তুতি অলংকার। 'ব্যাজ' শব্দের অর্থ হল 'ছল' অর্থাৎ ছল করে নিন্দা বা প্রশংসাই এই অলংকারের উদ্দেশ্য। এই অলংকারের উৎকৃষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায় ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের 'অন্নদার আত্মপরিচয়' অংশে। যেমন—

ক) "অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ/কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন"
অন্নদার আত্মপরিচয় দান প্রসঙ্গে ঈশ্বরী পাটনীর কাছে এই মন্তব্যটি করেছেন। পাটনী নিন্দা হিসেবেই অর্থটি গ্রহণ করেছেন। কিন্তু অন্নদা আসলে স্বামীর গুনগান করছিলেন। সুতরাং এটি ব্যাজস্তুতি অলঙ্কার।

খ) "কি সুন্দর মালা তুমি আজি পরিয়াছ গলে, প্রচেত:।"— এটি প্রশংসার ছলে নিন্দার উদাহরণ। রামচন্দ্র সমুদ্র বন্ধন করে লঙ্কায় পৌঁছে যান সীতা উদ্ধারের জন্য। সেই সেতুবন্ধনকে 'সুন্দরমালা' বলে ব্যঙ্গ করেছেন লঙ্কেশ্বর রাবণ। এখানে ক্রূরতার চেয়ে অভিমান বেশি ফুটে উঠেছে।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

১। রূপক ও উপমা অলংকার এর পার্থক্য উদাহরণসহ আলোচনা করুন। (৫০ শব্দের মধ্যে লিখুন।)

৮.৫. নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে অলংকার নির্ণয়

অর্থালংকার নির্ণয় করতে হলে প্রথমেই জানতে হবে অর্থালংকার বলতে আমরা কী বুঝি। অর্থালংকারে যেহেতু শব্দের তুলনায় অর্থের প্রাধান্য বেশি সুতরাং শব্দের অর্থ না বুঝলে অলংকার নির্ণয় সম্ভব নয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে বাচ্যার্থ বুঝলেও হয় না ব্যঞ্জনাটিকে উপলব্ধি করতে হয়। অর্থালংকারকে বেশ কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে তার মধ্যে সাদৃশ্যবাচক অলংকার সংখ্যা অনেক এবং প্রত্যেকটির ব্যবহার কাব্য সাহিত্যে মেলে। সাদৃশ্যবাচক অলংকার এর সংজ্ঞা জেনে নিতে হবে। এই জাতীয় অলংকারের যে চারটি অঙ্গ কল্পনা করা হয়েছে সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা জরুরী। নয় তো অলংকার নির্ণয় সম্ভব নয় উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বোঝানো যেতে পারে—

১। "মৃত্যু তো চেঙ্গিসের

অশ্বের মত দ্রুতগামী" এখানে প্রথমেই বুঝতে হবে কার সাথে কাকে তুলনা করা হয়েছে অর্থ বুঝলে বুঝতে অসুবিধা হবে না যে 'মৃত্যু'কে 'চেঙ্গিসের অশ্বের' সাথে তুলনা করা হয়েছে। সুতরাং উপমেয় 'মৃত্যু' উপমান 'চেঙ্গিসের অশ্ব'। এবার সাধারণ ধর্ম আছে কি না দেখতে হবে। দেখা গেল 'দ্রুতগামী' শব্দটি রয়েছে যা 'মৃত্যু' এবং 'চেঙ্গিসের অশ্বের' সাধারণ ধর্ম। অর্থাৎ মৃত্যুও অশ্বের মতো দ্রুতগামী। এবার তুলনাবাচক শব্দ আছে কিনা সেটা দেখতে হবে। উপর্যুক্ত উদাহরণে 'মতো' শব্দের ব্যবহারে তুলনা সম্ভব হয়েছে সুতরাং এটি উপমা অলংকারের দৃষ্টান্ত তবে চারটি বর্তমান থাকার জন্য এটি শুধু উপমা নয় পূর্ণোপমা অলংকার।

২। "মলিন বদনা দেবী হায়রে যে মতি, খনি তিমির গর্ভে সূর্যকান্ত মণি।"

উপর্যুক্ত কবিতা কাব্যটিতে মলিন বদনা দেবীকে খনির গর্ভে থাকা সূর্যকান্ত মণির সাথে তুলনা করা হয়েছে। সুতরাং এখানে 'মলিন বদনা দেবী' এবং উপমান 'সূর্যকান্ত মণি'। দেবী এবং মণি দুটোই বিজাতীয়। দু'জনের সাদৃশ্য নির্মাণ করা হয়েছে। দুজনের সাধারণ ধর্ম মলিনতা তিমির অর্থাৎ অন্ধকার। ব্যঞ্জনা একই। তুলনা সম্ভব হয়েছে 'যেমতি' শব্দ ব্যবহারে। সুতরাং চারটি অঙ্গই বর্তমান। এটি পূর্ণোপমা অলংকারে দৃষ্টান্ত।

৩। "মেহগিনির মঞ্চ জুড়ি/পঞ্চ হাজার গ্রন্থ; সোনার জলে দাগ পড়ে না, খোলে না কেউ পাতা,/অস্বাদিতমধু যেমন/যূথী অনাঘ্রাতা।" উপর্যুক্ত কবিতা অংশটিতে 'পঞ্চহাজার গ্রন্থ' এর যথা বলা হয়েছে যা কেউ পড়ে না, কেউ ছুঁয়েও দেখেনি। এই অপঠিত গ্রন্থের সাথে 'অস্বাদিত মধু', অনাঘ্রাতা যূথী ফুলের তুলনা করা হয়েছে। অর্থাৎ উপমেয় এখানে 'গ্রন্থ' এবং উপমান 'মধু' এবং 'যূথী'। দেখা গেল একটি উপমেয় সঙ্গে দুটো উপমান মালা হিসেবে বিদ্যমান। 'কেউ খোলে না পাতা' এবং 'আস্বাদিত', 'অনাঘ্রাতা', শব্দ তিনটি অর্থ একই। 'যেমন' তুলনাবাচক শব্দ দ্বারা তুলনা সম্ভব হয়েছে। সুতরাং এটি মালোপমা অলংকারের দৃষ্টান্ত। এখানে সাধারণ ধর্মের অর্থের ব্যঞ্জনা এক, অর্থ কিন্তু ভিন্ন।

৪। "মত্ত লোভ-মদে-স্ববন্ধু-বান্ধবে মূঢ় নাশে অনায়াসে/ক্ষুধায় কাতর ব্যাঘ্র গ্রাসয়ে যেমতি স্ব-শিশু।"

এখানে 'মূঢ়'কে তুলনা করা হয়েছে যে মত্ততার ও লোভের বশে নিজ বন্ধু বান্ধবের 'নাশে' বা সর্বনাশ করে অনায়াসে। ঠিক যেমন ভবে এক 'ব্যাঘ্র', 'ক্ষুধায় কাতর' অনায়াসে শিশুকে গ্রাস করে। অর্থাৎ এখানে উপমেয় বা বস্তু হল 'মূঢ়' উপমা 'ব্যাঘ্র'। দুজনের মধ্যে সাধারণ ধর্ম হল 'নাশে' এবং 'গ্রাসয়ে।' আর এক কিন্তু ভিন্ন শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। সুতরাং এটি বস্তু-প্রতিবস্তুভাবের উপমা।

৫। "বসি কবিগণ
সোনার উপমাসূত্রে বুনিদে বসন।"

এখানে সমাসবদ্ধ পদটি লক্ষ করার মতো। কবিতার অর্থ না বুঝলে অলংকার নির্ণয় সম্ভব নয়। এখানে বলা হয়েছে কবিগণ বসে সোনার উপমার সুতো দিয়ে বসন বুনছেন বা তৈরি করতেন। কবিরা বসন বুনেন না তাঁরা কাব্য রচনা করেন। সুতরাং এখানে উপমা ও সূত্রের মধ্যে একটা অভেদ কল্পনা করা হয়েছে। উপমেয় এবং উপমান সূত্র এর মধ্যে অভেদরোপ হয়েছে। আমরা জানি উপমেয় এবং উপমানে যখন অভেদরূপ হয় তখন রূপক অলংকার। লক্ষ করতে হবে এখানে উপমেয় এবং উপমানের মধ্যে কোনো তুলনাবাচক শব্দ ব্যবহার করে তুলনা সম্ভব হয়নি। এখানে উপমেয় এবং উপমানের কোনো উল্লেখ নেই। সুতরাং এটি নিরঙ্গ রূপকের উদাহরণ।

৬। "নন্দের নন্দন চাঁদ/পাতিয়ে রূপের ফাঁদ
ব্যাধ ছিল কদম্বের তলে।/ দিয়ে হাস্য সুধা চার অঙ্গচ্ছটা আঠা তার।"

উপর্যুক্ত বৈষ্ণব পদটিতে শ্রীকৃষ্ণকে ব্যাধরূপে কল্পনা করা হয়েছে। সুতরাং এখানে 'নন্দের নন্দন' শ্রীকৃষ্ণ তিনি অঙ্গী। এখানে তার অঙ্গ হিসাবে আছে রূপ, হাস্য, অঙ্গচ্ছটা। উপমান 'ব্যাধ' অঙ্গী। তার অঙ্গ হিসেবে এসেছে ফাঁদ, চার, আঠা ইত্যাদি। অঙ্গসহ উপমেয়ের উপর অঙ্গসহ উপমানের অভেদরোপ হয়েছে বলে এটি সাঙ্গরূপক।

৭। "হাওয়া উঠছে শিশিরে শিরশিরিয়ে
শিউলীর গন্ধ এসে লাগে
যেন কার ঠাণ্ডা হাতের কোমল সেবা।"

এখানে 'হাওয়া'র কথা বলা হয়েছে যা 'শিরশিরিয়ে' উঠছে, যার ফলে শিউলি ফুলের গন্ধে সুরভিত চারদিক সুতরাং 'হাওয়া' এখানে উপমেয় বা প্রকৃত কিন্তু 'কার ঠাণ্ডা হাতের' সেবার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। উৎপ্রেক্ষায় সংশয় এককোটিক। উপমেয় এবং উপমান দু'দিক থেকে সংশয় থাকে না। এখানে উপমেয় 'হাওয়া'কে উপমান মনে হচ্ছে। 'যেন' সম্ভাবনা বাচক শব্দ ব্যবহার করে সংশয় সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। সুতরাং এটি বাচ্যোৎপ্রেক্ষা অলংকারের দৃষ্টান্ত। নিম্নের কবিতাংশটি লক্ষ করুন—

"এ যে তোমার তরবারি।
জ্বলে উঠে আগুন যেন, বজ্র হেন ভারী।"

এখানেও 'আগুন যেন'তে 'যেন' শব্দের ব্যবহার রয়েছে কিন্তু এটি সম্ভবনা বাচক 'যেন' নয়। 'আগুন যেন' অর্থ আগুনের মত সুতরাং এটি উৎপ্রেক্ষা নয়, উপমার দৃষ্টান্ত। উৎপ্রেক্ষায় উপমেয়কে উপমান বলে সংশয় হয়।



আসুন জেনে নিই

উৎপ্রেক্ষা অলংকার এবং সন্দেহ অলংকারের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে। উৎপ্রেক্ষা সংশয়ে এককোটিক কিন্তু সন্দেহ অলংকারের দ্বিকোটিক। কোটিক অর্থাৎ পক্ষ বা side উৎপ্রেক্ষায় সংশয় উপমানে অর্থাৎ উপমেয়কে উপমান বলে সংশয় হয় কিন্তু সন্দেহ অলংকারে উপমেয় উপমান দুই পক্ষেই সংশয় থাকে।

৮। "ফাগবিন্দু দেখি সিন্দুর বিন্দু কহ।
কণ্টকে কঙ্কন দাগ মিছাই ভাবহ।।"

এটি অপহ্নুতি অলংকারের চমৎকার দৃষ্টান্ত। শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে রাত্রি যাপন করে প্রভাতে শ্রীরাধার কাছে এলে কৃষ্ণ অঙ্গে ভোগচিহ্ন দেখে শ্রীরাধা যে অনুযোগ করেছেন, শ্রীকৃষ্ণ তারই উত্তর দিচ্ছেন। শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীরাধার বাক্যালাপ না বুঝলেও বুঝতে হবে কেউ, অন্য কাউকে কিছু বোঝাচ্ছেন। অর্থ বুঝতেই হবে। তিনি বললেন 'ফাগ বিন্দু' অর্থাৎ আবীরকে তুমি 'সিঁদুর' বলে ভুল করছ এবং কাঁটা লেগে গা ছিঁড়ে গেছে তাকে তুমি কঙ্কন-এর দাগ বলে ভাবছ। অর্থাৎ 'সিঁদুর বিন্দু' এবং 'কঙ্কন দাগই' এখানে উপমেয় বা প্রকৃত। কিন্তু উপমেয়কে পুরোপুরি অস্বীকার করে 'ফাগ বিন্দু' এবং 'কণ্টক'কে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সংজ্ঞা অনুযায়ী এটি অপহ্নুতি অলংকার। মনে রাখতে হবে অনেক সময় রূপক এবং অপহ্নুতি অলংকারের মধ্যে সাদৃশ্য হেতু অলংকার নির্ণয়ে সমস্যা সৃষ্টি হয়। সুতরাং রূপক এবং অপহ্নুতি অলংকারের পার্থক্যটুকু মনে রাখতে হবে। রূপকে উপমান উপমেয়কে বজায় রেখে আপন রূপে তাকে রূপায়িত করে বলে উপমেয় গৌণ হয়ে যায়। এতে উপমেয়কে উপমান রূপায়িত করে তোলে। উভয়ের মধ্যে কাল্পনিক ভেদ সৃষ্টি হয়। অপহ্নুতি অভেদ কাল্পনিক কিন্তু রূপকের তুলনায় এতে অভেদের মাত্রা অনেক বেশি কারণ এতে উপমেয়কে পুরোপুরি অস্বীকার করা হয়েছে।

৯। "গৌরাঙ্গ চাঁদের ছাদে ও চাঁদ কলঙ্কীরে/এমন করিতে নারে আলো।/ অকলঙ্কপূর্ণ চাঁদ উদয় নদীয়াপুরে/মনের আঁধার দূরে গেল।" এখানে উপমান চাঁদের চেয়ে উপমেয় গৌরাঙ্গের উৎকর্ষ কারণ সমেত দেখানো হয়েছে। চাঁদ 'কলঙ্কী' গৌরাঙ্গ নিষ্কলঙ্ক চাঁদ। চাঁদ বাইরের জগত আলোকিত করে। গৌরাঙ্গ মনোজগতের অন্ধকার দূর করে

আলোকময় করে তোলেন। উপমান অপেক্ষা উপমেয়র উৎকর্ষ প্রদানের জন্য এটি ব্যতিরেক অলংকার। সুতরাং উপর্যুক্ত উদাহরণগুলি থেকে একথা স্পষ্ট যে অলংকার নির্ণয় করতে গেলে প্রত্যেকটি অলংকারের সংজ্ঞা ও উপমেয় উপমান, সাধারণ ধর্ম ইত্যাদি সম্পর্কে স্পষ্ট জ্ঞান থাকা জরুরী বাংলা কবিতা পাঠ করা জরুরি কারণ কবিতার অর্থ বুঝতে হলে কবিতা পাঠ অবশ্য কর্তব্য। কবিতার অর্থ বুঝলেই উপমেয় উপমান নির্ণয় সম্ভব।



৮.৬ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

- যে অলংকারে অর্থের উপর নির্ভরশীল থাকে তাকে অর্থালংকার বলে।
- অলংকারের আবেদন বুদ্ধির কাছে।
- অলংকারকে পাঁচটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়।
- পাঁচটি শ্রেণির প্রথমটি হল সাদৃশ্যবাচক অলংকার যার মধ্যে রয়েছে উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, অপহ্নুতি, ব্যতিরেক ইত্যাদি অলংকার।
- গূঢ়ার্থপ্রতীতি মূলক অলংকারে মধ্যে আছে ব্যাজস্তুতি অলংকার।
- উপমা অলংকারকে অনেক ভাগে ভাগ করা হয়েছে যেমন-পূর্ণোপমা, লুপ্তোপমা, বস্তু-প্রতিবস্তু ভাবের উপমা, বিম্ব-প্রতিবিম্ব ভাবের উপমা, মালোপমা,স্মরণোপমা ইত্যাদি।
- উপমেয়কে সম্পূর্ণ অস্বীকার না করে যদি তার উপর উপমানে অভেদ রূপ করা হয় তবে হয় রূপক অলংকার।
- রূপক অলংকারে অভেদ রূপ প্রধান কিন্তু তা সর্বস্ব নয়।
- রূপক প্রধানত দুই প্রকার-নিরঙ্গ রূপক এবং সাঙ্গ রূপক। নিরঙ্গ রূপককে আবার কেবল রূপক এবং মালা রূপকে ভাগ করা হয়েছে।
- উপমেয়কে গভীর সাদৃশ্য বসত যদি উপমান বলে সংশয় হয় তবে হয় উৎপ্রেক্ষা অলংকার।
- উৎপ্রেক্ষায় সংশয় হয় শুধু উপমানে।
- উৎপ্রেক্ষাকে দু ভাগ করা হয়-বাচ্য এবং প্রতীয়মান।



৮.৭ অতিরিক্ত পঠন

গুপ্ত, অতুলচন্দ্র (১৩৫৫ বঙ্গাব্দ); কাব্যজিজ্ঞাসা; কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়

চক্রবর্তী, শ্যামাপদ (১৩৬৩ বঙ্গাব্দ); অলঙ্কারচন্দ্রিকা; কলকাতা : ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লি:

বিশ্বাস, নরেন (১৯৭৬); অলঙ্কার অন্বেষা; কলকাতা : পুনশ্চ
ভট্টাচার্য, পরেশচন্দ্র (২০০৪); ছন্দ মীমাংসা ও অলংকার সমীক্ষা; কলকাতা: জয়দুর্গা প্রা:লি
মজুমদার, অতীন্দ্র (১৩৬৭ বঙ্গাব্দ); ছন্দ ও অলংকার; কলিকাতা : নয়া প্রকাশ
সাত্তার, ড. আব্দুস (আগস্ট ২০০৬); অলংকার; ঢাকা : একাত্তর প্রকাশনী
হালদার, দেবাশীষ ও অন্যান্য (২০১৭); সাহিত্যের রূপতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, অলঙ্কার, ছন্দ; ঢাকা : বুকস্ ফেয়ার

৮. ৮ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর সংকেত

(১) নং প্রশ্নের উত্তরের জন্য ৮.৪ নং অংশটি দেখুন।
(২) নং প্রশ্নের উত্তরের জন্য ৮.৪.১ নং অংশটি দেখুন।
(৩) নং প্রশ্নের উত্তরের জন্য ৮.৪ নং অংশটি দেখুন।

৮.৯ আর্দশ প্রশ্নাবলি

১। সাদৃশ্যবাচক অলংকার কাকে বলা হয়? আপনার পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত দুই প্রকার সাদৃশ্যবাচক অলংকার সম্বন্ধে উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

২। উদাহরণসহ সংখ্যা-নির্দেশ করে উৎপ্রেক্ষা ও অপহ্নুতি অলংকারের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করুন।

৩। উপমা অলংকার কাকে বলে? বিভিন্ন প্রকারের উপমা অলংকার সম্বন্ধে উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

৪। গূঢ়ার্থপ্রতীতিমূলক অলংকার কাকে বলে? ব্যাজস্তুতি অলংকার এর সংজ্ঞা উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

৫। অলংকার নির্ণয় করুন।

ক) বুদ্ধের করুণ আঁখি দুটি সন্ধ্যা তারা সম রহে ফুটি।
খ) ক্ষণে ক্ষণে তনু ক্ষীণ চৌদ্দশী চাঁদ সম।
গ) বিরহ পয়োধি পার কিয়ে পাওর।
ঘ) সংসার সাগর দুঃখ তরঙ্গের খেলা আশা তায় একমাত্র ভেলা।
ঙ) বলিতেছে জল তরল অনল গলিয়া পড়িছে অম্বরতল দিগ বধূ যেন ছল ছল আঁখি অশ্রু জলে।

অধ্যায়- ৯ : বাংলার খ্যাতনামা সম্পাদকের পরিচয়

বিন্যাস ক্রম

৯.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

৯.২ পরিচিতি

৯.৩ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: সম্পাদক-পরিচয়

৯.৩.১ সারসংক্ষেপ

৯.৩.২ সম্পাদনার রূপরেখা

৯.৩.৩ শব্দার্থ

৯.৪ সম্পাদক সাগরময় ঘোষ

৯.৪.১ প্রাক্ কথা

৯.৪.২ ব্যক্তি পরিচয়

৯.৪.৩ সাগরময় ঘোষ : সম্পাদকের রূপরেখা

৯.৪.৪ নতুন লেখক গোষ্ঠী নির্মাণ

৯.৫ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

৯.৬ অতিরিক্ত পঠন

৯.৭ অগ্রগতি-নির্ধারক উত্তর-সংকেত

৯.৮ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৯.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই অধ্যায়টি পড়ে আপনি—

- বিচিত্র প্রতিভার অধিকারী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনা-বিশ্বের সঙ্গে পরিচিত হতে পারবেন।
- সম্পাদক সাগরময় ঘোষের সম্পাদক সত্তার সঙ্গে পরিচিত হবার অবকাশ থাকবে।

৯.২ পরিচিতি

বর্তমান অধ্যায়ে আপনারা যে দু'জন সম্পাদকের সম্পাদনা কর্মের বিষয়ে সতথ্য আলোচনা পড়বেন তাঁরা দু'জন ভিন্ন সময়-পরিসরের বাংলা সম্পাদনা জগতের প্রতিনিধি। নিজস্ব শিল্প দক্ষতার জোরে একের পর এক পত্রিকা সম্পাদনা করে দু'জনেই সাহিত্যের প্রচার প্রসারকে ত্বরান্বিত করেছেন। বাংলা সম্পাদনা জগতে তাঁদের অবদান সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপিত হবে।

৯.৩ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: সম্পাদক-পরিচয়

কবি, গল্পকার, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, নাট্যকার, সঙ্গীতজ্ঞ, চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ একজন সম্পাদকও বটে। তাঁর জন্ম ১৮৬১ সালের ৭ই মে, কলকাতার জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে। পিতার নাম মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মাতার নাম সারদা দেবী। এই ঠাকুরবাড়ি থেকে একাধিক পত্রিকা সময়ে সময়ে প্রকাশিত হয়েছে। সৃষ্টিশীল রবীন্দ্রনাথ বাল্যকাল থেকে কাব্যচর্চার পাশাপাশি এদিকেও আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কৈশোর থেকে বার্ধক্য কাল পর্যন্ত প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে জড়িয়ে ছিলেন নানা পত্রিকার সম্পাদনার কাজে। ১২৮৪ বঙ্গাব্দে ঠাকুরবাড়ি থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'ভারতী' পত্রিকা। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ষোল। তিনিও সম্পাদক চক্রে ছিলেন। তাঁর মুদ্রিত প্রথম ছোটগল্প 'ভিখারিণী' ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে এই 'ভারতী' পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়। কালক্রমে ১৩০৫ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৮৯৭-১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী' পত্রিকা সম্পাদনার ভার নেন। একবছর এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন তিনি। এরকম স্বল্প সময়ের জন্য হলেও রবীন্দ্রনাথ যে-সমস্ত সাময়িক পত্রিকার পরিচালনা কিংবা সম্পাদনার কাজে যুক্ত হয়েছিলেন সেরকম কিছু পত্রিকা হল: 'বালক', 'হিতবাদী', 'সাধনা', 'নবপর্যায় বঙ্গদর্শন', 'ভাণ্ডার', 'তত্ত্ববোধিনী' ইত্যাদি। এই 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকাতেই রবীন্দ্রনাথের রচিত প্রথম কবিতা 'অভিলাষ' প্রকাশিত হয়েছিল 'দ্বাদশ বর্ষীয় বালকের রচনা' শিরোনামে। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের ৭ই আগস্ট তিনি পরলোকে পাড়ি দেন।

৯.৩.১ সারসংক্ষেপ

বাংলা সম্পাদনা জগতে রবীন্দ্রনাথের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। ১২৮৪ বঙ্গাব্দে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিকল্পনায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'ভারতী' পত্রিকা থেকেই সম্পাদক রবীন্দ্রনাথের যাত্রা শুরু। ষোল বছরের রবি ঠাকুর সেসময় 'ভারতী'র সম্পাদনাচক্রের অন্যতম সদস্য ছিলেন। কালক্রমে পরিচালনা করেছেন ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত অন্যতম সাময়িক পত্রিকা 'বালক'; সরাসরি সম্পাদনা করেছেন 'হিতবাদী' (সাহিত্য বিভাগ), 'সাধনা', 'নবপর্যায় বঙ্গদর্শন', 'ভাণ্ডার', 'তত্ত্ববোধিনী' ইত্যাদি সাময়িক পত্রিকা। কোনোটা এক বছরের জন্য, আবার কোনোটা চার বছরের জন্য সম্পাদনা করেছেন। উল্লিখিত পত্রিকাগুলোতে ওই সময়কার অন্যান্য লেখকদের রচনার পাশাপাশি প্রকাশিত হয়েছে সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথের বিবিধ কবিতা, গল্প, নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ ইত্যাদি। সংগঠক, সাহিত্যিক, সঙ্গীতজ্ঞ, চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথের সম্পাদক সত্তাটিও যে যথেষ্ট উজ্জ্বল, তা অনস্বীকার্য।

৯.৩.২ সম্পাদনার রূপরেখা

সম্পাদনা বিষয়টি নিয়ে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ ছিল অপরিসীম। পারিবারিক আবহে এই বিষয়টির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন তিনি। কবি মনে করতেন সম্পাদনা এমন একটি কাজ যেখানে একজন সম্পাদক একসঙ্গে হাজার জন লেখকের চিন্তা-চেতনা-সমাজদৃষ্টির খোঁজ পান। নিজেকে সমৃদ্ধ করার এ এক বড় সুযোগ। ১৩১২ বঙ্গাব্দের 'ভাণ্ডার' পত্রিকার প্রথম ভাগ বৈশাখ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ এ প্রসঙ্গে লিখেছেন:

"ব্যাধের বাঁশি শুনিয়া হরিণ যে কারণে ধরা দেয়, আমারও সেই একই কারণ। অর্থাৎ তাহা কৌতূহল, আর কিছুই নহে। দেশের যে সকল লোক নানা বিষয়ে নানারকম ভাবনাচিন্তা করিয়া থাকেন, তাঁহারা কী ভাবিতেছেন জানিবার যদি সুযোগ পাওয়া যায়, তবে মনে ঔৎসুক্য না জন্মিয়া থাকিতে পারে না।"

তবে ঔৎসুক্য থাকলেও রবীন্দ্রনাথ কিন্তু কোনো একটি পত্রিকায় দীর্ঘকালীন সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেননি কিংবা বলা ভালো করতে পারেননি। নাহলে সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথকে যাবতীয় সৃষ্টিশীল কাজ থেকে বিরত থাকতে হত। কারণ সম্পাদনা একটি প্রভূত সময় সাপেক্ষ কাজ। সাময়িক পত্রিকার সম্পাদকদের সীমাহীন শ্রমকে সংবেদনশীল দৃষ্টি দিয়ে বিচার করেছেন রবীন্দ্রনাথ। আর কোনো রাখ ঢাক না রেখেই বলেছেন— "সম্পাদক যদি অনন্য কর্ম্মা হইয়া কর্ণধারের মতো পত্রিকার চূড়ার উপর সর্ব্বদাই হাল ধরিয়া বসিয়া থাকিতে পারেন তবেই তাঁহার যথাসাধ্য মনের মত কাগজ চালানো সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমাদের দেশের সম্পাদকের পত্র-সম্পাদন হালগোরুর দুধ দেওয়ার মত সমস্ত দিন খেতের কাজে খাটিয়া কৃশ প্রাণের রসাবশেষটুকুতে প্রচুর পরিমাণে জল মিশাইয়া যোগান দিতে হয়, তাহাতে পরম ধৈর্যবান জন্তুটারও প্রাণান্ত হইতে থাকে, ভোক্তাও তাহার বার্ষিক তিনটাকা হিসাবে ফাঁকি পড়িল বলিয়া রাগ করিয়া উঠেন।"

অপ্রিয় হলেও রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্যকে এড়িয়ে যাওয়ার অবকাশ নেই। সম্পাদনা কর্ম যে কতটা কঠিন এবং সম্পাদককে এর জন্য সব দিক দিয়ে কতটা লড়াই করতে হয়, তা তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন। তারপরেও সাহিত্যের প্রকাশকে গতিশীল রাখতে তার সার্বিক উন্নতিকল্পে যুগ যুগান্তর ধরে সম্পাদিত, প্রকাশিত হয়ে চলেছে বিভিন্ন ভাষার কতশত পত্রিকা, তার ইয়ত্তা নেই। আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি যে, ১২৮৪ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি থেকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিকল্পনায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় 'ভারতী' পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ এই পত্রিকার ভিত্তিস্থাপনকারীদের মধ্যে অন্যতম। সেসময় 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার পাশে স্বকীয়তা বজায় রেখে নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে 'ভারতী'। সাহিত্য প্রকাশের এক

উল্লেখযোগ্য প্ল্যাটফর্মে পরিণত হয়েছিল 'ভারতী'। এই পত্রিকাতেই ছোটগল্পকার রবীন্দ্রনাথের মুদ্রিত প্রথম ছোটগল্প 'ভিখারিণী' ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে আত্মপ্রকাশ করে। এছাড়া গল্পের মধ্যে 'করুণা'; 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী', 'কবি কাহিনী' শীর্ষক কাব্য ইত্যাদিও প্রকাশিত হয়েছে 'ভারতী' পত্রিকাতে কালক্রমে। রবীন্দ্রনাথের বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের পর 'ভারতী' পত্রিকা সম্পাদনা করেন স্বর্ণকুমারী দেবী, হিরন্ময়ী দেবী প্রমুখ। ১৩০৫ অর্থাৎ ১৮৯৭-১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে 'ভারতী'র সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। একবছর তিনি সুষ্ঠুভাবে এই পত্রিকার সম্পাদকের ভূমিকা পালন করেন।

মাসিক পত্রিকা 'বালক' ঠাকুর পরিবার থেকে প্রকাশিত পত্রিকাগুলির মধ্যে অন্যতম। এর সম্পাদক ছিলেন জ্ঞানদানন্দিনী দেবী। তবে রবীন্দ্রনাথই এই পত্রিকার সবটা দেখাশোনা করতেন। জানা যায়, মূলত পরিবারের ছেলেদের সৃজনশীলতাকে তুলে ধরার জন্যই এই পত্রিকার আয়োজন করে ঠাকুর পরিবার। একবছর চলে এর প্রকাশনা; তারপর 'ভারতী' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হয়ে এর নামকরণ হয় 'ভারতী ও বালক'। উল্লেখ্য, রবীন্দ্র-নাটক 'মুকুট'; উপন্যাস 'রাজর্ষি' এই পত্রিকাতেই আত্মপ্রকাশ করে।

১২৯৮ বঙ্গাব্দের জৈষ্ঠ্য মাসে (১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে) প্রকাশিত, সম্পাদক কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের 'হিতবাদী' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকার সাহিত্য বিভাগটি রবীন্দ্রনাথ অল্প কিছুদিন সম্পাদনা করেন। অনেকের মতে এই 'হিতবাদী' পত্রিকাতেই ছোটগল্পকার রবীন্দ্রনাথের সার্থক ছোটগল্পের স্রোতধারা গতি পায়। লক্ষণীয়, 'দেনাপাওনা', 'পোস্টমাস্টার', 'গিন্নী', 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা', 'ব্যবধান', 'তারাপ্রসন্নের কীর্তি' মতো উল্লেখযোগ্য ছোটগল্প 'হিতবাদী' পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই প্রকাশিত হয়।

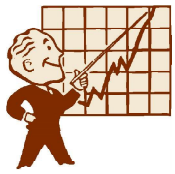
১২৯৮ এর অগ্রহায়ণ মাসে (১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে) ঠাকুর পরিবার থেকে প্রকাশিত হয় 'সাধনা' পত্রিকা। এর স্থায়িত্বকাল মাত্র চার বছর (অগ্রহায়ণ, ১২৯৮ — কার্তিক, ১৩০২)। প্রথম তিন বছর পত্রিকাটির সম্পাদনা করেন সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এরপর 'সাধনা'র সম্পাদক রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বিচিত্র বিষয়ক রচনার দ্বারা সমৃদ্ধ করেন সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ। উল্লেখ্য, 'সাধনা' পত্রিকার চার বছরের কালসীমায় রবীন্দ্রনাথের ৩৬টি ছোটগল্প এতে প্রকাশিত হয়। 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন', 'অতিথি', 'কঙ্কাল', 'একরাত্রি', 'জীবিত ও মৃত', 'কাবুলিওয়ালা', 'ছুটি', 'সুভা' ও অন্যান্য। শুধু ছোটগল্প নয়, রবীন্দ্র-কবিতা সহ নানা প্রবন্ধ-নিবন্ধ এই পত্রিকায় মুদ্রিত হয়। প্রাবন্ধিক অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য তাঁর 'সাধনা পত্রিকা ও রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক গ্রন্থের উপক্রমণিকাতে ব্যক্ত করেছেন যে— "সাধনা পত্রিকার যুগে রবীন্দ্রনাথ নিজে সম্পূর্ণরূপে আবিষ্কারের কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। এই সময়-পর্বে কখনো তাঁর মনে হয়েছে কাব্য রচনাতেই তাঁর সবটুকু সুখ, কখনো বোধ

হয়েছে ছোট ছোট গল্প লেখাতেই তাঁর সৃষ্টির সার্থকতা, আবার কখনো বা অনুভব করেছেন সাধনায় উচ্চ বিষয়ের প্রবন্ধ লিখে বঙ্গদেশকে উন্নতির পথে নিয়ে যাওয়াই হল মহৎ কাজ।"

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১২৭৯ বঙ্গাব্দে। এর প্রকাশনা চলে চার বছর। পরবর্তী সময়ে আরো দু'জন সম্পাদক এর প্রকাশে সহায় হন। আবারও বন্ধ হয়ে যায় এর প্রকাশ। উল্লেখ্য, রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত উপন্যাস 'চোখের বালি' এই পত্রিকাতেই মুদ্রিত হয়। যাই হোক, পুনরায় রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় 'বঙ্গদর্শন' 'নবপর্যায় বঙ্গদর্শন' রূপে প্রকাশিত হতে শুরু করে ১৩০৮ বঙ্গাব্দে। রবীন্দ্রনাথ মোট চার বছর অর্থাৎ ১৩০৮ থেকে ১৩১২ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন। 'নবপর্যায় বঙ্গদর্শন'-এ শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, দীনেশচন্দ্র সেন সহ ঠাকুর পরিবারের একাধিক শক্তিশালী লেখক তাঁদের স্বতন্ত্র সাহিত্য ভাবনা ব্যক্ত করার পরিসর পেয়েছেন। অন্যান্য রচনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যে সমস্ত সাহিত্য ভাবনামূলক প্রবন্ধ 'নবপর্যায় বঙ্গদর্শন'-এ প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা', 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য', 'সাহিত্যের সামগ্রী', 'সাহিত্যের তাৎপর্য', 'রামায়ণ', 'মেঘদূত' ইত্যাদি অন্যতম। রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত অন্যতম সাময়িক পত্রিকা 'ভাণ্ডার'। ১৩১২ বঙ্গাব্দে 'নবপর্যায় বঙ্গদর্শন' এর সাথে নতুন করে এই পত্রিকাটির সম্পাদনাও শুরু করেন রবি ঠাকুর। ওই একই বছরে বঙ্গদর্শনের সম্পাদনা থেকে সরে এসে পুরোপুরি মনোনিবেশ করেন 'ভাণ্ডার' প্রকাশনায়। এটি একটি মাসিক পত্রিকা। এর প্রকাশক ছিলেন কেদারনাথ দাশগুপ্ত। অন্যান্য লেখকদের রচনার সঙ্গে এই পত্রিকাটিতে রবীন্দ্রনাথের দেশাত্মবোধক গান-কবিতার পাশাপাশি একাধিক রাজনৈতিক প্রবন্ধ, স্বদেশ ভাবনামূলক আলোচনা প্রকাশিত হয়। উল্লেখ্য, 'ভাণ্ডার' পত্রিকাটি 'প্রবন্ধ', 'প্রস্তাব', 'প্রশ্নোত্তর' ও 'সঞ্চয়' চারটি অংশে বিভক্ত ছিল। নির্দিষ্ট বিষয় অনুযায়ী লেখা বিশেষ অংশে স্থান পেত। রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত 'ভাণ্ডার' পত্রিকার মোট ২৬টি সংখ্যা পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত এই পত্রিকায় যাঁরা লিখতেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদীশচন্দ্র বসু, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ।

স্বদেশি পত্রিকা 'ভাণ্ডার' সম্পাদনার সময় রবীন্দ্রনাথ কিছুকাল স্বদেশ চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। তৎকালীন পরিবেশ পরিস্থিতিই কবিকে ভাবনার রসদ জুগিয়েছে। কবির কলমেও ঝরেছে তারই ফলশ্রুতি। কিন্তু ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের বৈশাখ মাসে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা সম্পাদনায় এসে রবীন্দ্রনাথ বিভোর হলেন ধর্মচিন্তায়। ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী'তে প্রারম্ভিক লগ্নে প্রার্থনা, তপস্যা কেন্দ্রীক ধর্মীয় আলোচনাই প্রকাশিত হত। কালক্রমে রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বাবধানে শিল্প-সাহিত্য-কৃষি-

বিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রবন্ধ-নিবন্ধও এতে স্থান পায়; সেইসঙ্গে আঙ্গিকগত পরিবর্তনও লক্ষ করা যায়। রবীন্দ্রনাথের বহু ব্রাহ্মধর্ম বিষয়ক প্রবন্ধ এই পত্রিকায় মুদ্রিত হয়। তাঁর সম্পাদিত প্রথম সংখ্যাতেই প্রকাশিত হয় তাঁর 'বাহ্মধর্ম্মের সার্থকতা' প্রবন্ধটি। এছাড়া কালক্রমে 'খেলা ও কাজ', সমুদ্রপাড়ি', 'বোম্বাইশহর', 'পাপের মার্জ্জনা' শীর্ষক একাধিক মনন ঋদ্ধ প্রবন্ধ এখানে মুদ্রিত হয়। তাতে রবীন্দ্র-মানসের বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায়। এ পর্বে পত্রিকাটির সহকারী সম্পাদক হন চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথদের সম্পাদনাকালে প্রথম এই পত্রিকার সূচিপত্রে লেখকদের রচিত বিষয়ের পাশাপাশি তাঁদের নামের তালিকা গ্রন্থিত হতে শুরু করে। প্রতিটি রচনার শেষে লেখকের নিজের নাম লিপিবদ্ধ হতে থাকে। প্রতি সংখ্যার শেষ পৃষ্ঠায় 'আশ্রম সংবাদ' ও গ্রন্থ সমালোচনা বলে দুটো নতুন বিষয় যুক্ত হয়। একটানা চার বছর রবীন্দ্রনাথ 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন। সম্পাদনার গুণে পত্রিকায় বিষয় বৈচিত্র্য ও আঙ্গিক বিন্যাসে পরিবর্তন এনে যে অভিনবত্ব দেখিয়েছেন, তা 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার পথ চলার ইতিহাসে সম্পাদক রবীন্দ্রনাথকে স্মরণীয় করে রেখেছে।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

১। সম্পাদক রবীন্দ্রনাথের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন (১০০ শব্দের মধ্যে)

৯.৩.৩ শব্দার্থ

সম্পাদনা: সংশোধন, পরিমার্জনের মাধ্যমে একটি শিল্পবস্তুকে সুন্দর ও সম্পূর্ণ রূপ দেওয়া।

সাময়িক পত্রিকা: নির্দিষ্ট সময়ান্তে প্রকাশ্য পত্রিকা।

৯.৪ সম্পাদক সাগরময় ঘোষ

৯.৪.১ প্রাক্ কথা

'দেশ' পত্রিকার মালিক না হয়েও দেশ পত্রিকার কথা বললেই প্রথমেই যাঁর কথা উঠে আসে তিনি সাগরময় ঘোষ। মূলত দেশ পত্রিকার সাহায্যেই বাংলা সাহিত্যে বিপ্লব ঘটিয়েছেন তিনি। দেশ পত্রিকাকে তিনি বৌদ্ধিক-সাহিত্যমহলে কেবল প্রতিষ্ঠিতই করেননি দিয়েছেন এক অনন্য গতিতে চলার দক্ষতা। সাগরময় ঘোষ সম্পাদক হয়েছেন 'দেশ' সম্পাদক সরণিতে বেশ পরে। দেশ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। তারপর হয়ে ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র

সেন। অনেকটা দীর্ঘ সময় পার করেই সম্পাদকের দায়িত্ব নিয়েছেন সাগরময় ঘোষ।

৯.৪.২ ব্যক্তি পরিচয়

সাগরময় ঘোষ জন্মেছিলেন ১৯১২ সালের ২২ জুন পূর্ববঙ্গ অধুনা বাংলাদেশের চাঁদপুরে। বাবা কালীমোহন ঘোষ ছিলেন রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সহযোগী। শান্তিনিকেতনের শ্রীনিকেতন গড়ে উঠেছিল কালীমোহন ঘোষের হাতেই। সাগরময়ের যখন জন্ম কালীমোহন ঘোষ তখন বিলেতে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্য ও শিশুদের পাঠ্যক্রম নিয়ে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। বলাবাহুল্য তার বিলেত যাত্রার পেছনের কারিগর রবীন্দ্রনাথই। সাগরময়ের জন্মের এক বছর পরে কালীমোহন ঘোষ দেশে ফিরে দায়িত্ব নিয়েছিলেন শান্তিনিকেতন আশ্রমের শিশু বিভাগের। যদিও পরবর্তীতে নদীগর্ভে তলিয়ে যাওয়ায় চাঁদপুরের সেই পৈত্রিক ভিটেতে আর কখনো যাওয়া হয়নি সাগরময়ের।

সাগরময় ঘোষের নামটি দেওয়া রবীন্দ্রনাথের। তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শান্তিদেব ঘোষ তো রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রবাদ প্রতিম শিল্পী। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এতো নৈকট্যের কারণে স্বভাবতই সাগরময়ের প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনার সূচনা হয়েছিল শান্তিনিকেতনে। রবীন্দ্রনাথকে পেয়েছিলেন সরাসরি শিক্ষক হিসেবে। যার পরিপ্রেক্ষিতে সাগরময়ের জীবনে পরবর্তীতে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব ছিল ভীষণ ভাবে লক্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আন্তরিক সম্পর্ক থাকায় দেশ পত্রিকায় যোগ দেওয়ার পরে সাগরময় ঘোষের ওপরেই দায়িত্ব পড়েছিল রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে গল্প এবং কবিতা জোগাড় করার।

সাগরময় ঘোষের ওপর রবীন্দ্রপ্রভাব কতখানি ছিল তা পাওয়া যায় সাগরময় ঘোষের লেখা আত্মজীবনীতে। লিখেছিলেন, 'আমাকে যদি কেউ প্রশ্ন করে এই পৃথিবীতে জন্মে তুমি কী পেলে? আমার উত্তর রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ আর রবীন্দ্রনাথ।' দেশ পত্রিকায় যোগ দেয়ার পর সাগরময় ঘোষ হয়ে উঠলেন পাকা জহুরি। দেশ পত্রিকায় তখন লিখছেন রবীন্দ্রনাথ, তারাশঙ্কর, বুদ্ধদেব বসু, সৈয়দ মুজতবা আলী, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো নামকরা সব সাহিত্যিকেরা।

৯.৪.৩ সাগরময় ঘোষ : সম্পাদকের রূপরেখা

দেশ পত্রিকায় সাগরময় ঘোষ যোগ দিয়েছিলেন ১৯৪০ সালে। তখন রবীন্দ্রনাথ বেঁচে ছিলেন। দেশ পত্রিকায় যোগ দেওয়ার কিছুকাল পরেই সাগরময় ঘোষের ওপর দায়িত্ব পড়ে রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে গল্প ও কবিতা সংগ্রহ করা।

অবশ্য সে বছরই রবীন্দ্রনাথ পরলোক গমন করেন। রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে বেশ কয়েকটি কবিতা সংগ্রহ করার পাশাপাশি তিনি পেরেছিলেন রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত গল্প 'শেষকথা' সংগ্রহ করতে।

যে সাগরময় ঘোষের কারণে দেশ পত্রিকার আজ সাহিত্য পত্রিকায় জগৎজোড়া খ্যাতি সেই সাগরময় ঘোষের দেশ পত্রিকার সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার পেছনে ছিল একটি স্মরণীয় ঘটনা। সেসময় স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদানের অপরাধে জেলে যেতে হয়েছিল সাগরময় ঘোষকে। তার আগে তিনি কাজ করেছিলেন ওষুধ কোম্পানি বেঙ্গল ইমিউনিটিতে। জেলেই থাকা অবস্থাতে তিনি সঙ্গী হিসেবে পেলেন আনন্দবাজার গোষ্ঠীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা প্রফুল্লকুমার সরকারের ছেলে অশোককুমার সরকারকে। একই ভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদানের জন্য অশোককুমার সরকারকেও জেলে যেতে হয়েছিল। তখন জেলে বিপ্লবীদের মধ্যে দারুণ আড্ডার মেজাজ ছিল। এই প্রেক্ষিতে অশোককুমার সরকারের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে উঠল সাগরময় ঘোষের। মনে রাখতে হবে অসাধারণ গানের গলা ছিল সাগরময় ঘোষের। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর হঠাৎ একদিন অশোককুমার সরকারই তাঁকে ডেকে পাঠালেন। মেছুয়া বাজারের বর্মণ স্ট্রিটে দেশ পত্রিকার কার্যালয়ে পৌঁছানোর পর অশোককুমার সরকার একপ্রকার অনুরোধ করেই দিলেন কাজের প্রস্তাব। অশোককুমার সরকারদের তখন দুটি পত্রিকা। একটি 'আনন্দবাজার' অন্যটি সাহিত্য পত্রিকা 'দেশ'।

অশোককুমার সাগরময় ঘোষকে তিনটি কাজের কথা জানিয়ে যে কোনো একটি বেছে নেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তিনটির মধ্যে সাগরময় ঘোষ বেছে নিলেন 'দেশ' পত্রিকায় কাজ করার সুযোগ। দেশ পত্রিকার সম্পাদক তখন সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। তিনিই ছিলেন দেশে পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। সংবাদপত্রে পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকলেও সহকারী সম্পাদক হিসেবে দেশ পত্রিকায় যোগ দিলেন সাগরময় ঘোষ।

সাগরময় ঘোষ কতটা অভিজ্ঞ ও চতুর সম্পাদক ছিলেন তার প্রেক্ষিতে বলা যায় ১৯৯৯ সালে তার মৃত্যুর পর বিখ্যাত ব্রিটিশ সংবাদপত্র 'গার্ডিয়ান' পত্রিকায় তাঁর মৃত্যুর সংবাদের শিরোনামে তাঁকে বলা হয়েছিল 'Bengal's literary tiger'। সাগরময় ঘোষ 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব নেন ১৯৭৬ সালে। সম্পাদক হিসেবে বহাল ছিলেন ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত। আর মৃত্যু পূর্বের বাকি আড়াই বছর ছিলেন সাম্মানিক সম্পাদক।

দেশ পত্রিকার মধ্য দিয়ে কত সাহিত্যিককে যে তিনি তুলে এনেছেন। অজস্র তরুণ সাহিত্যিককে দেশ পত্রিকার মধ্য দিয়েই প্রতিষ্ঠার সুযোগ দিয়েছেন। সেই সাগরময় ঘোষ সম্পাদকের টেবিলে যাওয়ার পর নিজের সাহিত্য বা নিজের লেখার বিষয়ে হয়ে গেলেন খামখেয়ালী উদাসীন। অথচ তিনিও একসময় হতে

চেয়েছিলেন সাহিত্যিক। চাইলে গানের জগতে ভিড়ে যাওয়ারও সুযোগ ছিল।

৯.৪.৪ নতুন সাহিত্যিক গোষ্ঠী নির্মাণ

সাগরময় ঘোষ জহুরীর মতো বেছে সাহিত্যিক সমাজ নির্মাণ করেছেন। এত বিখ্যাত সাহিত্যিকের মধ্যে বছর সাতেক বয়সের 'দেশ' পত্রিকা ছিল অনেকটাই ঋদ্ধ। কিন্তু সাগরময় ঘোষ দেশ পত্রিকায় এসে দেশ পত্রিকাকে প্রকৃত অর্থেই গড়ে তুললেন বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ মুখপত্র হিসেবে। দেশ পত্রিকাকে ঘিরেই তিনি গড়ে তুললেন সাহিত্যের এক অপার সম্ভার। তরুণ সাহিত্যিকদের সুযোগ দিতেন অকাতরে। তিনি যখন দেশ পত্রিকার সম্পাদক তখন তরুণ সাহিত্যিকদের উদ্দেশ্যে বলতেন, 'আমি তো কেবল স্টেজের মালিক। শুধু স্টেজ ভাড়া দিই। নাচবে তুমি। ভুগলে ভুগবে তুমি।' পক্ষান্তরে দেশ পত্রিকাকে তিনি পরিণত করলেন নবীন-প্রবীণ সাহিত্যিকের মিলনমেলায়।

সাগরময় ঘোষের হাত ধরে বিখ্যাত সাহিত্যিকেরা উঠে এসেছেন। মণিশংকর মুখোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শরৎ মুখোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ, সমরেশ বসু, সমরেশ মজুমদার, জয় গোস্বামীর নাম তো উঠে আসবেই প্রথমেই। সম্পাদক হিসেবে সাগরময় ঘোষ কতটা উদ্যমী ছিলেন তা আজ অবিশ্বাস্য শোনাবে। একবার দেশ পত্রিকা থেকে শারদীয় সংখ্যা বেরোবে। সাগরময় ঘোষ সুবোধ ঘোষকে তাড়া দিলেন লেখা পাঠানোর জন্য। সুবোধ ঘোষের সাফ জবাব তিনি এবার লিখবেন না। সাগরময় ঘোষ নাছোড়বান্দা। তিনি লেখা আদায় করেই ছাড়বেন। এদিকে শারদীয় সংখ্যা প্রকাশের দিনও ঘনিয়ে আসছে। সাগরময় ঘোষ ছাপাখানায় বলে দিলেন সবাইকে প্রস্তুত থাকতে। যেকোনো সময় লেখা আসতে পারে। সাগরময় ঘোষের ক্রমাগত তাড়া আর উৎপীড়নে সুবোধ ঘোষ রীতিমতো বাধ্য হলেন তিনি লিখবেন। ঠিক হয়েছিল রাতজেগে লিখবেন সুবোধ ঘোষ। শেষরাতে সুবোধ ঘোষের বাড়িতে গিয়ে তার লেখা সংগ্রহ করেই সাগরময় ঘোষ প্রেসে যাবেন। ঠিক রাত আড়াইটায় সুবোধ ঘোষের বাড়ি পৌঁছালেন সাগরময়। গিয়ে দেখেন সুবোধ ঘোষ ঘুমাচ্ছেন। ঘুম থেকে ডেকে তুলতেই সুবোধ ঘোষ অপারগ হয়ে বললেন, এবার আর আমার দ্বারা সম্ভব হবে না দাদা।' এদিকে সাগরময় ঘোষের তখন অকূলপাথারে পড়ার দশা। ভোরবেলা তীব্র হতাশ আর ক্লান্ত বদনে তিনি ফিরে গেলেন দেশ পত্রিকার অফিসে। উদ্দেশ্য সুবোধ ঘোষের লেখার বদলে অন্য কোনো লেখা নিয়ে সংখ্যা পূর্ণ করতে হবে। বলে রাখা ভালো সেবার ঠিকই সুবোধ ঘোষের উপন্যাস বেরিয়ে

ছিল দেশ পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায়। কীভাবে? সাগরময় ঘোষ চলে যাওয়ার পর মতি ফিরেছিল সুবোধ ঘোষের। সাগরময় ঘোষ চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরই তিনি দেশ পত্রিকার অফিসে পৌঁছে বসে গেলেন লিখতে। দুপুর পর্যন্ত একটানা লিখলেন সেবারে শারদীয় সংখ্যায় ছাপা হওয়া তার বড় গল্পটি।

কেবল সুবোধ ঘোষই নন। এমন কত কত সাহিত্যিকের লেখার পিছনে যে সাগরময় ঘোষের নাম জড়িয়ে আছে। মণিশংকরের বিখ্যাত উপন্যাস 'এপার বাংলা ওপার বাংলা' লেখার ক্ষেত্রে সাগরময় ঘোষের প্রভাব ছিল লক্ষ্যণীয়। প্রথমবার যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিলেন মণিশংকর। যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফেরার পর ভোর পাঁচটার দিকে শংকরকে বিমানবন্দর থেকে আনতে গিয়েছিলেন তার স্ত্রী ও মা। অন্যদিকে সেই ভোররাত্রিতেই তীব্র শীত উপেক্ষা করে নবীন এক লেখককে স্বাগত জানাতে বিমানবন্দরে হাজির সাগরময় ঘোষও। সাগরময় ঘোষ তখন সম্পাদক হিসেবে ভীষণ প্রভাবশালী। অথচ সেই তীব্র শীতের রাতে সাগরময় ঘোষের বিমানবন্দরে যাওয়ার উদ্দেশ্য কেবল স্বাগত জানানোই নয়। বরং তরুণ লেখক মণিশংকরের কাছ থেকে যদি কোনো লেখা পাওয়া যায়। সাগরময় ঘোষকে দেখে চমকে উঠে শংকর বলেই ফেললেন 'আপনি এখানে!' জবাবে সাগরময় ঘোষ কেবল বলেছিলেন, 'তোমাকে ধরব বলেই এসেছিলাম। যদি কিছু মাথায় আসে, মনে রেখ।'

সেই আবদার মাথায় রেখেই শংকর লিখেছিলেন বিখ্যাত উপন্যাস 'এপার বাংলা ওপার বাংলা'। একসময় দারুণ গল্প লিখতেন সাগরময় ঘোষ। কিন্তু সম্পাদনার সঙ্গে তার যাত্রার পর গল্প লেখাকে নির্বাসনে পাঠিয়ে দেন সাগরময় ঘোষ। খুঁজে খুঁজে পরখ করতেন আর পড়তেন পত্রিকা আর সাগর সেঁচে বাছাই করতেন মুক্তা। সাগরময় ঘোষের গদ্য যে কতটা অনন্য তা পাওয়া যায় তার লেখা 'সম্পাদকের বৈঠকে' ও 'একটি পেরেকের কাহিনী' গ্রন্থে। নবীন প্রবীণ অসংখ্য লেখকের সঙ্গে তার আত্মস্মৃতি আর নানা ঘটনার নির্ঝর স্বাদু গদ্যে উঠে এসেছে এই গ্রন্থে।

বলে রাখা ভালো দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত কোনো লেখাই সাগরময় ঘোষের পড়া ছাড়া ছাপা হতো না। কোনো লেখকের মধ্যে সুপ্ত প্রতিভা লুকায়িত থাকলে তাকে অকাতরে সুযোগ দিতেন। এত প্রভাবশালী সম্পাদক হওয়ার পরও লেখকের স্বাধীনতার বিষয়ে বিন্দুমাত্র হস্তক্ষেপ করতেন না সাগরময় ঘোষ। প্রয়োজনে দিতেন পরামর্শ। কিন্তু কখনোই লেখককে না জানিয়ে সাগরময় ঘোষ লেখা সংযোজন বা বিয়োজন করতেন না। ব্যক্তিগত জীবনে কিছুটা গম্ভীর হলেও ভীষণ সময়নিষ্ঠ এবং স্বাস্থ্যসচেতন ছিলেন সাগরময় ঘোষ।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

২। সম্পাদক সাগরময় ঘোষ যেভাবে নতুন লেখক গোষ্ঠী নির্মাণ করেছিলেন সে সম্পর্কে লিখুন। (১৫০ শব্দের মধ্যে)



৯.৫ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

- বিচিত্র প্রতিভার অধিকারী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনা-বিশ্বের সঙ্গে পরিচিত হতে পারা গেল।
- সম্পাদক সাগরময় ঘোষের সম্পাদক সত্তার সঙ্গে পরিচিত হলাম।



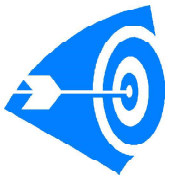
৯.৬ অতিরিক্ত পঠন

ঘোষ, সাগরময় (১৯৬৬); সম্পাদকের বৈঠকে; কলকাতা: ত্রিবেণি প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড

ভট্টাচার্য, সুভাষ (২০১৮); বাংলা লেখক ও সম্পাদকের অভিধান; কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

লোধ, বিজন কুমার (১৯৭৩); সম্পাদকের কলমে; কলকাতা: দীপ্তি প্রকাশনী

সেনগুপ্ত, জ্যোতির্ময় (২০২২); পাণ্ডুলিপি থেকে প্রুফ সংশোধন; কলকাতা: সপ্তর্ষি প্রকাশন



৯.৭ অগ্রগতি-নির্ধারক উত্তর-সংকেত

১। সম্পাদনা বিষয়টি নিয়ে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ..... এভাবে গুছিয়ে লিখুন।

২। সাগরময় ঘোষ জহুরীর মতো ..... নতুন সাহিত্যিক গোষ্ঠী অংশ থেকে এভাবে সাজিয়ে লিখুন।



৯.৮ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করুন।

২। সম্পাদক হিসাবে রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব আলোচনা করুন।

৩। সাগরময় ঘোষের সম্পাদক সত্তার পরিচয় দিন।

৪। নতুন পত্রিকা লেখক গোষ্ঠী নির্মাণে সাগরময় ঘোষের কৃতিত্ব বিচার করুন।

অধ্যায় ১০ : বাংলা সম্পাদনা স্বরূপ ও নানা প্রসঙ্গ

বিন্যাস-ক্রম

১০.১ জ্ঞাতব্য বিষয়
১০.২ পরিচয়
১০.৩ সম্পাদনা কী ও কেন
১০.৪ সম্পাদক ও সম্পাদনা
১০.৫ সম্পাদকীয় নির্মাণ
১০.৬ সংবাদপত্র সূচনা ও পুনর্লিখন
১০.৭ সংকলন ও কপি পরীক্ষা
১০.৮ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম
১০.৯ অতিরিক্ত পঠন
১০. ১০ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত
১০.১১ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১০.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই অধ্যায়টি পড়ে আপনি—

- সম্পাদনা, সম্পাদক ও সম্পাদকীয় নির্মাণ সম্পর্কে ধারণা পাবেন।
- সংবাদপত্র সূচনা এবং পুনর্লিখন সম্পর্কে জানতে পাবেন।
- সংকলন ও কপি পরীক্ষা সম্পর্কে অবগত হতে পারবেন।

১০.২ পরিচয়

সাময়িক পত্র, সংবাদপত্র, গ্রন্থ প্রকাশ বা যে কোনো লেখা প্রকাশের ক্ষেত্রে সম্পাদনা কর্ম উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। এই সম্পাদনা কর্মে যাবতীয় নীতি, কৌশল ও প্রক্রিয়া রয়েছে। এক একটি স্তর পার করে সম্পাদককে এগিয়ে যেতে হয়। সম্পাদনার কাজে প্রতিটি স্তর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। সম্পাদনা, সম্পাদকীয় নির্মাণ, সংবাদপত্র সূচনা, পুনর্লিখন, সংকলন, কপি পরীক্ষা সবকিছুরই আলাদা আলদা ভূমিকা রয়েছে।

সম্পাদনা হল প্রচার মাধ্যমের তথ্য বহনের জন্য ব্যবহৃত নির্বাচন এবং প্রস্তুতির একটি প্রক্রিয়া। এই সম্পাদনা প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন বিষয়ের সংশোধন, সংক্ষেপণ, সংগঠন এবং সংস্করণ করা হয় একটি সঠিক, সঙ্গতিপূর্ণ শুদ্ধ এবং সম্পূর্ণ কাজের উদ্দেশ্যে। প্রতিটি সম্পাদনা প্রক্রিয়াই কাজের প্রতি লেখকের ধারণার মধ্য দিয়ে শুরু হয় এবং কাজটি নির্মাণের

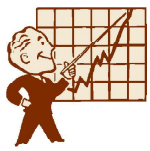
জন্য লেখক ও সম্পাদকের মধ্যে একটি সাহায্যের দিক অব্যাহত থাকে।

১০.৩ সম্পাদনা কী ও কেন

স্বভাবতই মনে প্রশ্ন তৈরি হতে পারে, সম্পাদনা কী এবং কেন এটি গুরুত্বপূর্ণ। উত্তরে বলা চলে সম্পাদনা হল—

- একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ যা কাজে স্পষ্টতা, নির্ভুলতা এবং একটি মসৃণ রূপ নিয়ে আসে।
- সম্পাদনা লেখার ত্রুটিগুলি দূর করে বাক্য গঠনকে পরিমার্জন করে লেখাকে প্রতিনিয়ত উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর করে তোলে।
- সম্পাদনা লেখার প্রক্রিয়া প্রতিনিয়তই বিভিন্ন স্তরে পরিচালিত হয়।
- পুনর্লিখন বা কাঠামোগত সম্পাদনা লেখকের নির্দিষ্ট চাহিদা পূরণ করে থাকে।
- লেখা ত্রুটিহীন মনে হলেও, নির্বিঘ্নে পড়ার অভিজ্ঞতার জন্য সম্পাদনা অপরিহার্য অঙ্গ।
- লেখার মান উন্নত করতে এবং প্রকাশের জন্য প্রস্তুত করতে সম্পাদনা কর্ম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।
- সম্পাদনা হল বিষয়বস্তুকে স্পষ্টতা, নির্ভুলতা এবং সামগ্রিক মানের জন্য পরিমার্জিত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া, যা ত্রুটি সংশোধন, বাক্য গঠন, কাল এবং কাঠামো পুনর্গঠনের বাইরেও বিস্তৃত।
- সম্পাদকগণ লেখার অপ্রয়োজনীয়তা দূর করে, একটি ধারাবাহিক প্রবাহ নিশ্চিত করে এবং লেখকের শৈলী বজায় রেখে লেখার উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।
- লেখা শেষ করার পর, একজন সম্পাদক ব্যাকরণগত এবং বানানগত ত্রুটি পরীক্ষা করার জন্য লেখাটিকে পরীক্ষা করেন। সম্পাদকেরা বাক্য গঠন এবং কাল পরীক্ষা করেন এবং প্রয়োজনে, কাজটি বাস্তবিক ভাবে সঠিক কিনা সেটাও পুরোপুরি নিশ্চিত করে নেন।

সম্পাদনার গুরুত্ব এখানেই যে, কোনো কাজ যদি সহজ মনে হয়, তবুও সেই কাজটি প্রুফরিড করার জন্য একজন সম্পাদকের প্রয়োজন হবে। প্রুফরিডিং হল ব্যাকরণ, বাক্য গঠন, বিরামচিহ্ন, বানান ইত্যাদির মধ্য দিয়ে যাওয়া এবং লেখকের কাজকে সূক্ষ্মভাবে সাজানোর প্রক্রিয়া।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

১। সম্পাদনা বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করুন। (৮০ শব্দের মধ্যে)

১০.৪ সম্পাদক ও সম্পাদনা

যে কোনো লেখা, সংবাদপত্র, গ্রন্থ সম্পাদনা, সাময়িক পত্র প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার দ্বারা এগিয়ে গেলেও সবসময়ই সম্পাদকের একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা থাকে। ব্যক্তিগত বিদ্যা, দক্ষতা, সাধারণ মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা ইত্যাদি সামাজিক কর্তব্যবোধকে মাথায় রেখেই সম্পাদককে তাঁর সম্পাদনা কর্ম এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়। এছাড়া—

- অনেক সময় গ্রন্থ সম্পাদনার ক্ষেত্রে সম্পাদক লেখার ধরন বজায় রাখার কাজ করে থাকেন। সম্পাদক এক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় শব্দ এবং বাক্য মুছে ফেলে আরও আকর্ষণীয় শব্দ দিয়ে কিছু শব্দ প্রতিস্থাপন করেন।
- সম্পাদক নিশ্চিত করেন যেন কাজটি তার বর্ণনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং পাঠকের পক্ষে সহজে বোঝা যায়। এটি অপ্রয়োজনীয়তাগুলি সরিয়ে, অনুচ্ছেদগুলি ভেঙে বা সংযুক্ত করে সামঞ্জস্যপূর্ণতা নিশ্চিত করে তিনি কাজটিকে এগিয়ে নিয়ে যান।
- সম্পাদনার ক্ষেত্রে ভুল বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। তথ্যগত ভুল, অক্ষরের অদল-বদল, বানানের ত্রুটি, বাক্যবিন্যাসের অসঙ্গতি ইত্যাদি। এই ধরনের ত্রুটিগুলি সংশোধন না হলে ছাপার মধ্যে রয়ে গেলে তা পাঠক সমাজকে অত্যন্ত পীড়া দেয়। এই ত্রুটি সংশোধনের প্রক্রিয়াই হল সম্পাদনা পক্রিয়া। আর যে বা যিনি সম্পাদনা করেন, তিনি হলেন সম্পাদক।
- যে কোনো ভুল ধরাই সম্পাদকের কাজ। খুব মনোযোগ দিয়ে রচনা পাঠ করে তিনি ভুলগুলোকে ঠিক করবেন। অন্যের লেখার ওপর কলম চালিয়ে লেখার মান বাড়ানোই হল সম্পাদকের অন্যতম কাজ।
- কাজকে ত্রুটিহীন এবং ত্রুটিমুক্ত করে তুলতে গিয়ে বছরের পর বছর অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সম্পাদনা দক্ষতা বিকশিত হয়। তাই সম্পাদককে বিভিন্ন ধরনের সম্পাদনা কর্ম সম্পর্কে সচেতন থাকতে হয়।
- ত্রুটি সংশোধনের মধ্যেই শুধুমাত্র সম্পাদনার কাজ সীমাবদ্ধ থাকে না। রচনাকে গুণগত দিক দিয়ে উন্নত করাও সম্পাদনা তথা সম্পাদকের অন্যতম কাজ। দরকার হলে সম্পাদককে লেখার পরিমার্জনাও করতে হয়।
- সম্পাদকের আরেকটি অন্যতম কাজ হল লেখকের ভাবনাকে ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করা। পাঠক লেখা পড়তে গিয়ে যেন কোন সমস্যার সম্মুখীন না হন, সেই দিকটাতেও সম্পাদকের লক্ষ রাখতে হয়।
- বাক্য বিন্যাসের ক্ষেত্রেও সম্পাদককে লক্ষ রাখতে হয়। বাক্য যেন অযথা বড় না হয়, দরকার হলে অপ্রয়োজনীয় অংশ কেটে বাদ দিতে হবে সম্পাদককে। এমনকি প্রয়োজনে তিনি পুরো বাক্যবন্ধই বাদ দিতে পারেন।

- প্রচ্ছদ নির্মাণ, বাঁধাই প্রভৃতি বিষয়ের দিকটিকেও সম্পাদককে খুঁটিয়ে দেখতে হবে।
- আধুনিক যুগে সম্পাদককে সাম্প্রতিক মুদ্রণশিল্প, প্রযুক্তির ব্যবহার, বিন্যাস রীতি ইত্যাদির ক্ষেত্রে ধারণা থাকতে হবে।

১০.৫ সম্পাদকীয় নির্মাণ

গ্রন্থ, সাময়িক পত্র এবং সংবাদপত্রে সম্পাদকের সম্পাদকীয় নির্মাণের ক্ষেত্রে সবসময় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে হয়—

- ভারতের রাজনীতি সম্পর্কে সর্বব্যাপী অভিজ্ঞতা থাকা দরকার।
- দৃঢ় আত্মবিশ্বাস, অফুরন্ত কর্মক্ষমতা, চারিত্রিক গুণ এবং অসামান্য ব্যক্তিত্ব থাকা প্রয়োজন।
- সম্পাদকীয় নির্মাণের ক্ষেত্রে সম্পাদকের বিষয়ের জ্ঞানের পাশাপাশি সুনির্দিষ্ট মতামত থাকা প্রয়োজন, যা কোনোমতেই অযৌক্তিক এবং একগুয়ে না হয়।
- সামাজিক মানুষ হিসেবে সম্পাদকীয় নির্মাণের ক্ষেত্রে সম্পাদককেও কিছু দায়-দায়িত্ব পালন করতে হয়। পাঠকদের চাহিদার কথা মাথায় রেখেই তাঁকে পত্রিকা সম্পাদনা এবং সমগ্র সম্পাদকীয় কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়।
- সংবাদপত্রের স্বরূপ উন্মোচনে সংবাদপত্রের মূল চাবিকাঠি হল সম্পাদকীয় নির্মাণ।
- সম্পাদকীয়-ই হচ্ছে সংবাদপত্রের দৃষ্টিভঙ্গির উন্মুক্ত দরজা, যা দিয়ে অনায়াসে সংবাদপত্রকে চেনা ও জানা যায়।
- সংবাদপত্রের জন্য সম্পাদকীয় খুবই জরুরি। সম্পাদকীয় হচ্ছে পত্রিকার ভরকেন্দ্র, যার ওপর পত্রিকা দাঁড়িয়ে থাকে।
- সম্পাদকীয় বক্তব্যের পক্ষে-বিপক্ষে ভাবার জন্য পাঠকেরা সুযোগ পেয়ে থাকেন। এই অঙ্গীকার ও চিন্তা দুটোই খুব জরুরি। যেমন পত্রিকার জন্য তেমনি পাঠকের জন্য।

পত্রিকার চূড়ান্ত সাফল্য নির্ভর করে তার গুরুত্বের ওপর। আর ওই গুরুত্বেরই একটা উৎস হচ্ছে সম্পাদকীয়। সম্পাদকীয়কে যখন গুরুত্ব দেওয়া হয়, তার দিকে যখন সরকার, পাঠক, নীতি নির্ধারকরা তাকিয়ে থাকে, তখন বোঝা যায় যে পত্রিকাটি খুবই প্রভাবশালী। আর যদি পত্রিকা কী লিখল না-লিখল তাকে উপেক্ষা করা হয়, তাহলে বুঝতে হবে সে বড়ই হাল্কা, নিউজপ্রিন্টের মতো।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

২। সম্পাদকীয় নির্মাণে সম্পাদকের ভূমিকা আলোচনা করুন। (১০০ শব্দের মধ্যে)

১০.৬ সংবাদপত্র সূচনা ও পুনর্লিখন

নিউজ রুমে তথা সংবাদপত্রের অফিসে বিভিন্ন সূত্র থেকে খবর আসে। এই খবর সংগ্রহের দায়িত্বে থাকেন প্রতিবেদক বা রিপোর্টার। এঁদের মধ্যেও আবার শ্রেণিবিভাজন রয়েছে—

- সংবাদপত্র অফিসে তথা নিউজরুমে অধিক সংখ্যায় থাকেন স্টাফ রিপোর্টারেরা, যাঁরা মুখ্য প্রতিবেদকের অধীনে কাজ করে থাকেন। এই স্টাফ রিপোর্টারেরা প্রধানত স্থানীয় খবর জোগাড়ের দায়িত্বে থাকেন। তাঁরা 'বীটে' অর্থাৎ সেই সমস্ত জায়গায় বেশি যান, যেখানে প্রতিনিয়ত খবর পাওয়া যায়।
- স্থানীয় বাজার, অফিস, আদালত, সিনেমা হল, বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বর, বিভিন্ন সভায়, থানা, বাস স্ট্যাণ্ড, খেলার স্টেডিয়াম ইত্যাদি স্থান হল স্টাফ রিপোর্টারের 'বীট'।
- মুখ্য প্রতিবেদকের নির্দেশে স্টাফ রিপোর্টারের বিভিন্ন খবর জোগাড় করে এনে অফিসে কপি লিখে জমা দেন।
- সেইসব কপি যায় অবর সম্পাদকের কাছে সম্পাদনার জন্য।
- শ্রেণি বিভাজনে স্টাফ রিপোর্টারের ওপরের স্তরে থাকেন প্রিন্সিপাল করেসপন্ডেন্ট।
- প্রিন্সিপাল করেসপন্ডেন্ট এর ওপরের স্তরে থাকেন স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট। তাঁরই উপরে ন্যস্ত থাকে গুরুত্বপূর্ণ খবর কভার করার দায়িত্ব।
- দেশের রাজধানী তথা বড় বড় বিভিন্ন শহর থেকে খবর পাঠান স্পেশাল করেসপন্ডেন্টরা। ব্যুরো চীফ এর মাধ্যমে নিউজরুমে সেইসব খবর এসে পৌঁছায়।
- এছাড়া জেলা শহর থেকেও বিভিন্ন সংবাদদাতারা বহু ধরণের সংবাদ পাঠান। সেইসব সংবাদ কপি অবর সম্পাদকের কাছে যায় সম্পাদিত হওয়ার জন্য। সম্পাদনার পর এই সমস্ত কপি মুদ্রণযোগ্য হয়ে ওঠে।
- এছাড়া বিদেশের বিভিন্ন সংবাদদাতা এবং সংবাদ সংস্থার (লন্ডন, ওয়াশিংটন, প্যারিস, মস্কো প্রভৃতি) পাঠানো প্রচুর কপি এসে নিউজরুমে জমা হয়।
- সেদিক থেকে প্রতিবেশী দেশগুলিও পিছিয়ে নেই। বাংলাদেশ, নেপাল, পাকিস্তান, চীন প্রভৃতি দেশ থেকেও সংবাদদাতারা প্রচুর পরিমানে খবর পাঠিয়ে থাকেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, সংবাদপত্রের সবচেয়ে বেশি খবর আসে সংবাদসংস্থার কাছ থেকে। অনেক সময় সংবাদ সংস্থার কাছ থেকে টাকা দিয়ে খবর কিনতেও হয়। এই সংবাদ সংস্থার মধ্যে বিশেষ কয়েকটি হল— বিদেশী সংস্থা 'রয়টার', 'এপি', 'এ-এফ পি' এবং দেশীয় সংস্থা 'পি.টি.আই', 'ইউ এন আই' ইত্যাদি। সংবাদপত্রের প্রয়োজন অনুসারে কপি নির্বাচন করে যথাযোগ্য সম্পাদনা করার পর মুদ্রণযোগ্য কপি তৈরি হয় এবং তা কম্পোজের জন্য পাঠানো হয়।

সংবাদপত্র সূচনা:

সংবাদপত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল সূচনা, একে ইংরেজিতে বলে 'ইনট্রো'। যে কোনো সংবাদের মূল কথাটি এই ইনট্রোর মধ্যে বলা থাকে। মূলত ৩০ থেকে ৪০ শব্দের মধ্যে এই ইনট্রো বা সূচনা লেখা হয়ে থাকে। যা পড়লেই পাঠক সংবাদের মূল বিষয়বস্তু বুঝে যান। সংবাদপত্রে পাঠকের সাধারণ কৌতূহলকে পাঁচটি 'W' তথা (What, When, Who, Why এবং Where) ও একটি 'H' তথা How এ ভাগ করে দেখা হয়। অর্থাৎ যে কোন সংবাদের সূচনায় মানুষের মনে প্রশ্ন জাগে কখন, কোথায় কী ঘটল, কেন ঘটল, কারা ঘটাল এবং শেষে কী হল। সংবাদপত্র সূচনার মধ্যে এই প্রশ্নগুলির জবাব যথাসাধ্য দেবার চেষ্টা করতে হয়, যেন সূচনাটুকু পড়লেই পাঠকেরা সব প্রশ্নগুলির উত্তর পেয়ে যান। সম্পাদনার সময় সংবাদপত্রের সূচনাটি ভালো ভাবে লক্ষ করতে হয়।

পুনর্লিখন:

সম্পাদনার ক্ষেত্রে অন্যতম ভূমিকা পালন করে 'পুনর্লিখন'। কোনো সংবাদে যদি অস্পষ্টতা বা জটিলতা দেখা দেয়, তবে সেই লেখাকে আবার নতুন করে লিখতে হয়। সম্পাদনার মূল কারবার শব্দ এবং বাক্য নিয়ে। অনেক সময় আবার বাক্যবিন্যাসের অদল বদল করার ফলেও লেখার জটিলতা ঠিক হয়ে যায়। সম্পাদনার দায়িত্বে থাকা অবর-সম্পাদক অনেক সময়ই বহু রিপোর্টারদের বিভিন্ন লেখার ওপরে কলম চালিয়ে নতুন করে লেখাকে সাজান। কখনও বাক্যকে ছোট করেন আবার কখনও বাক্যবিন্যাসের পরিবর্তন করে বিষয়কে স্পষ্ট করে ফুটিয়ে তোলেন।

অবর-সম্পাদক সবসময়ই লক্ষ রাখেন, কথার ভারে এবং অসচ্ছতায় লেখা যেন হারিয়ে না যায়। এই পুনর্লিখনের ক্ষেত্রে তিন বিষয়কে খুব জরুরি বলে মনে করা হয়—

I. সংবাদের বিষয়গুলিকে ক্রমানুসারে পরপর সাজানো, যাতে পাঠকের আগে যেটা জানা দরকার সেটা যেন জানতে পারে।
II. লেখার জন্য কতটা স্থান পাওয়া যাচ্ছে, সে বিষয় বিবেচনা করে খবর লেখা।
III. এছাড়া লক্ষ রাখতে হয়, পুনরাবৃত্তি যেন না হয়। পুনর্লিখনের সময় এই পুনরাবৃত্তিকে যতটা সম্ভব এড়িয়ে যাওয়াই ভালো।

১০.৭ সংকলন ও কপি পরীক্ষা

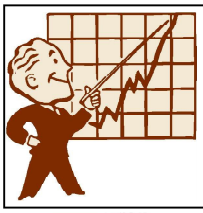
সংকলন:

সংকলনের কাজ মূলত অবর-সম্পাদককেই করতে হয়। যে কোনো সংবাদের ওপর বিভিন্ন সূত্র থেকে অনেক খবর আসতে পারে। স্টাফ রিপোর্টার, স্টাফ করেসপনডেন্ট এমনকি বিভিন্ন সংবাদ-সংস্থা থেকে একই বিষয়ে প্রচুর খবর আসতে পারে। তখন অবর-সম্পাদক সেই সমস্ত খবরকে একসঙ্গে সংকলিত করে আলাদা আলাদা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এক-দুই কপি সংবাদ বানান। (যেমন, 'রেল দুর্ঘটনা'-র খবরে একই সঙ্গে ধ্বংসের খবর, আহতদের খবর, মৃত্যুর খবর, ক্ষতিপূরণের খবর ইত্যাদি)। সংকলনের সময় সমস্ত খবরটিকে বিবেচনার মধ্যে রাখা দরকার। কারণ রিপোর্টারদের পাঠানো কপির সঙ্গে সংবাদ-সংস্থার পাঠানো কপির মিল-অমিল দুই-ই থাকতে পারে। আলাদা আলাদা সূত্র থেকে আসা খবর যদি কোন বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে, তখন অবর-সম্পাদক সে বিষয়ে সত্যতা বিচার করে থাকেন।

কপি পরীক্ষা:

যে কোন সংবাদের ওপরে নিউজরুমে বিভিন্ন মাধ্যম থেকে পাঠানো অসংখ্য কপি এসে জমা হয়। সেই বিপুল কপি থেকে যে সামান্য অংশ ছাপা হবে, তা আগে থেকেই পরীক্ষা করে নেওয়া হয়; আদৌ সেই কপি ছাপবার যোগ্য কিনা। আর সেটা নির্বাচিত হয় কপি পরীক্ষার মধ্যমে। যার দায়িত্বে থাকেন বহু অভিজ্ঞ সিনিয়র অবর-সম্পাদকগণ, কিন্তু মূল কপি পরীক্ষার দায়িত্বে থাকেন মুখ্য অবর-সম্পাদক। কপি পরীক্ষার সময় অবর-সম্পাদক দেখেন—

- কপিটি পাঠকদের চাহিদা পূরণ করবে কিনা।
- বাংলা কাগজ এবং ইংরেজি কাগজে খবরের চাহিদা অনুযায়ী গুরুত্ব প্রদান।
- সংবাদপত্রের নিজস্ব নীতিও কপি পরীক্ষাকে প্রভাবিত করে।
- অবর-সম্পাদকেরা ভালো করেই জানেন, কোনো কাগজ রক্ষণশীল এবং কোনো কাগজ উদারপন্থী। তাই সেই নীতির প্রতি লক্ষ রেখেই তাঁরা কপি পরীক্ষা করে থাকেন।



অগ্রগতির নির্ধারক প্রশ্ন

৩। টীকা লিখুন— সংকলন ও কপি পরীক্ষা। (১০০ শব্দের মধ্যে)



১০.৮ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

এই অধ্যায়টি পড়ে আমরা—

- সম্পাদনা কী এবং কেন সে সম্পর্কে ধারণা পেলাম।

- সম্পাদনার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জানলাম।
- সম্পাদকীয় নির্মাণে সম্পাদকের ভূমিকা কতখানি, তা জানলাম।
- সংবাদপত্র সূচনা এবং পুনর্লিখন সম্পর্কে অবগত হলাম।
- সংকলন ও কপি পরীক্ষা সম্পর্কে জানলাম।



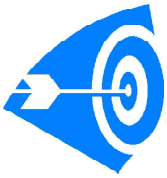
১০.৯ অতিরিক্ত পঠন

ঘোষ, সাগরময় (১৯৬৬); সম্পাদকের বৈঠকে; কলকাতা: ত্রিবেণি প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড

ভট্টাচার্য, সুভাষ (২০১৮); বাংলা লেখক ও সম্পাদকের অভিধান; কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

লোধ, বিজন কুমার (১৯৭৩); সম্পাদকের কলমে; কলকাতা: দীপ্তি প্রকাশনী

সেনগুপ্ত, জ্যোতির্ময় (২০২২); পাণ্ডুলিপি থেকে প্রুফ সংশোধন; কলকাতা: সপ্তর্ষি প্রকাশন



১০.১০ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত

১। সম্পাদনা হল .....লেখার মান উন্নত করতে .... এইভাবে প্রস্তুত করুন।

২। সাময়িক পত্রে ও ....সংবাদ পত্রে সম্পাদনীয় নির্মাণের..... ক্ষেত্রে এইভাবে প্রস্তুত করুন।

৩। সংকলনের কাজ.... যে কোনো সংবাদের ওপরে ..... কপি পরীক্ষার সময় ...এভাবে টীকা লিখুন।



১০.১১ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। সম্পাদনা কী? রচনার উৎকর্ষ সাধনে সম্পাদনার ভূমিকা আলোচনা করুন।

২। সম্পাদকের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে লিখুন ।

৩। সম্পাদকীয় নির্মাণে সম্পাদকের ভূমিকা কতখানি, তা নিজের ভাষায় লিখুন ।

৪। টীকা লিখুন— 'সংবাদপত্র সম্পাদনা', 'পুনর্লিখন'।

৫। সংকলন ও কপি পরীক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

অধ্যায় ১১ : সম্পাদনার নীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ

বিন্যাস-ক্রম

১১.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

১১.২ পরিচয়

১১.৩ সম্পাদনার নীতি সমূহ

১১.৪ সংবাদপত্র সম্পাদনা

১১.৫ সম্পাদনা চিহ্ন

১১.৬ অঙ্গসজ্জা

১১.৭ শিরোনাম

১১.৮ টাইপসজ্জা ও মার্জিন

১১.৯ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

১১.১০ অতিরিক্ত পঠন

১১.১১ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত

১১.১২ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১১.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই অধ্যায়টি পড়ে আপনি—

- সম্পাদনার নীতি সমূহ ও সংবাদপত্র সম্পাদনা সম্পর্কে জানবেন।
- সম্পাদনা চিহ্ন, অঙ্গসজ্জা এবং শিরোনাম সম্পর্কে অবগত হবেন।
- টাইপসজ্জা ও মার্জিনের ধারণা পাবেন।

১১.২ পরিচয়

গণমাধ্যমের অন্যতম একটি শক্তিশালী অঙ্গ হল সংবাদপত্র। গণমাধ্যমের দ্বারা দেশের সর্বসাধারণ মানুষ দেশ-কাল-সময় পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন খবর, তথ্য, ঘটনা, সরকারের বিভিন্ন কাজ, শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির নানা কর্মকাণ্ডের পরিচয় পেয়ে থাকে। পাঠকের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এবং পাঠকের কৌতূহল বজায় রেখে সংবাদ পরিবেশন করা হয়ে থাকে। তাই সংবাদপত্র সম্পাদনার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নিয়ম ও নীতির প্রতি সর্বদাই লক্ষ রাখা হয়। বিশেষত তার ভাষা, উপস্থাপন, বক্তব্যের সংগতি ও সংহতির দিকে নজর রাখতে হয়। শুধু তাই নয়, সংবাদপত্র রচনার ক্ষেত্রে সম্পাদনা চিহ্ন, অঙ্গসজ্জা, শিরোনাম, টাইপসজ্জা, মার্জিন ইত্যাদি দিকগুলোও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

১১.৩ সম্পাদনার নীতি সমূহ (পত্রিকা বা সংবাদপত্র)

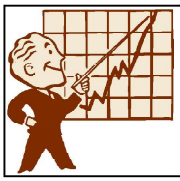
আমরা সকলেই জানি, সংবাদপত্র সম্পাদনার ক্ষেত্রে কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম নীতিকে মেনে নিয়ে এগিয়ে যেতে হয়। সম্পাদনার কাজ দক্ষতার সঙ্গে সমাপ্ত করতে নীতিগুলো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। ফলত দায়িত্বশীল সাংবাদিকেরা প্রতিনিয়তই যথাসম্ভব নীতিগুলি মেনে চলেন। সম্পাদনায় উৎকর্ষ নিয়ে আসতে নীতিগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে—

- ❒ সংবাদপত্র সহজ সরল ভাষায় রচনা করতে হয়। তার মূল কারণ স্বল্পশিক্ষিত মানুষের যেন সংবাদপত্র পাঠ করে বুঝতে কোনো অসুবিধে না হয়, সেদিকে লক্ষ রাখা প্রয়োজন।
- ❒ সংবাদপত্রের কপিতে যদি কোন জটিলতা থাকে, তবে সম্পাদনার পূর্বেই তা ঠিক করতে হবে।

সংবাদপত্র সম্পাদনার সময় প্রাঞ্জলতা প্রতিষ্ঠার দিকে লক্ষ রাখতে হবে।

- সময়ের দিকে লক্ষ রেখে খবর পৌঁছাতে হয় বলে কিছুটা ভুল হবার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু বানান ভুল বা কোনো তথ্যগত ভুল পাঠককে বিভ্রান্ত করতে পারে, সেদিকে লক্ষ রেখে সম্পাদনার সময় সমস্ত ত্রুটি সংশোধন করতে হবে।
- সংবাদপত্র সম্পাদনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি নীতি হল 'সংক্ষিপ্ততা বজায় রাখা'। কাগজের জায়গা খুব মূল্যবান বলে সীমিত জায়গার মধ্যে সংবাদ উপস্থাপন করতে হবে।
- একেবারে যথাযথ বক্তব্য উপস্থাপন করার ওপর নজর দিতে হবে। ফলত অপ্রয়োজনীয় অংশ বাদ দিয়ে মূল বক্তব্যকে সরাসরি পাঠকের কাছে উপস্থাপন করতে হবে।
- সাধারণ রচনা রীতি এবং সংবাদপত্র লেখার রীতি দুই-ই আলাদা। সাধারণ রচনার ক্ষেত্রে পিরামিড নীতি অনুসরণ করা হয়, যেখানে উপরটা সরু হয় এবং নিচের দিকটা ধীরে ধীরে প্রশস্ত হতে থাকে। লেখক সাসপেন্স ধরে ধীরে ধীরে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন বলে রচনা যত এগিয়ে যায়, তত মূল বিষয়বস্তু উদ্‌ঘাটিত হতে থাকে পাঠকের কাছে।
- সংবাদপত্র রচনায় উল্টো পিরামিড রীতির অনুসরণ করা হয়। ফলে মূল বক্তব্য একেবারে প্রথমে থাকে এবং তারপর ধীরে ধীরে প্রাসঙ্গিক বক্তব্যের দিকে এবং অন্যান্য তথ্যের দিকে খবর এগিয়ে যায়।
- সংবাদপত্র সম্পাদনার ক্ষেত্রে সূচনার দিকটি গুরুত্বপূর্ণ। ইংরেজিতে যাকে বলে ইনট্রো, মূল সংবাদটি এই সূচনা বা ইনট্রোর মধ্যেই থাকে।

- সংবাদপত্র সম্পাদনায় সম্পাদকেরা উপর্যুক্ত নিয়ম ও নীতিগুলো মেনে চলেন বলে সংবাদপত্রের কপির মান খুব ভালো হয় এবং পাঠকের কাছে সংবাদপত্র হয়ে ওঠে এক মনোরম অভিজ্ঞতা।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

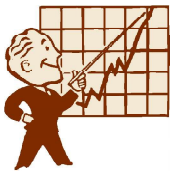
১। সম্পাদনা রীতি সম্পর্কে আলোচনা করুন। (১০০ শব্দের মধ্যে লিখুন)

১১.৪ সংবাদ সাময়িকীর সম্পাদক

সাময়িকপত্র, খবরের কাগজ, পুস্তক প্রকাশনায় সম্পাদনার প্রয়োগ ব্যাপকভাবে ঘটে থাকে। মুদ্রণ মাধ্যম এক্ষেত্রে অন্যতম ভূমিকা পালন করে থাকে। যে কোনো মাধ্যমের রচনাকে নিখুঁত এবং পাঠযোগ্য করে তোলার ক্ষেত্রে সম্পাদকের ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সম্পাদনার নিয়ম ও নীতির ওপর নির্ভর করলেও সংবাদপত্র সম্পাদনা এবং পুস্তক প্রকাশনার সম্পাদনায় আলাদা আলাদা পদ্ধতির প্রয়োগ হয়ে থাকে।

এক দীর্ঘ কর্মবহুল প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে সম্পূর্ণ রূপ পেয়ে প্রতিদিন সকালবেলা আমাদের হাতে এসে পৌঁছায় বিভিন্ন ধরণের সংবাদপত্র। সকালে চা খেতে খেতেই সংবাদপত্রে এক ঝলকে দেখে নেওয়া যায় সারা বিশ্বের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের কথা। এ সব কিছুই সম্ভব হয় নিখুঁত সংবাদপত্র সম্পাদনার মাধ্যমে। পাঠক যে খবরের কাগজ পড়তে বেশি ভালোবাসেন তথা স্বাচ্ছন্দ বোধ করেন, অনায়াসেই নিজের পছন্দের বিভিন্ন খবর পান এবং অতি সহজেই পড়ে যেতে পারেন; ধরে নিতে হবে সেই সংবাদপত্র সম্পাদনার কাজ অনেক বেশি ভালো। বলতে গেলে সম্পাদনাই প্রকৃতপক্ষে কাগজের উৎকর্ষ বৃদ্ধি করে এবং আলাদা চরিত্র প্রতিষ্ঠা করে থাকে। সংবাদপত্র সংগ্রহের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে দিয়ে সম্পাদনার পর একটি সংবাদপত্র ছাপার যোগ্য হয়ে ওঠে।

সংবাদপত্র সম্পাদনার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন অবর-সম্পাদক বা সাব-এডিটর। যে কোনো একটি সংবাদ প্রকাশনায় অসংখ্য সাব-এডিটর বা অবর-সম্পাদক থাকেন, যাঁরা নিউজরুমে বসে প্রতিনিয়ত কপি সংশোধন, পুনর্নির্মাণ, প্রয়োজনে কাটছাঁট করে সংবাদকে সংক্ষিপ্ত করার কাজে নিয়োজিত থাকেন। অবশ্য এঁদের ওপরে থাকেন মুখ্য-অবর সম্পাদক এবং তাঁদের ওপরে থাকেন বার্তা সম্পাদক। মূলত নিউজরুমের সম্পূর্ণ দায়িত্ব থাকে বার্তা সম্পাদকের ওপর। আর এই বার্তা সম্পাদক সম্পাদনা ছাড়াও সংবাদ সংগ্রহের বিষয়ের ওপরে নজরদারী ও তদারকি করে থাকেন।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

২। সংবাদপত্র সম্পাদনা বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করুন। (১০০ শব্দের মধ্যে লিখুন)

১১.৫ সম্পাদনা চিহ্ন

সংবাদ অফিসে অবর সম্পাদকেরা যখন কোনো কপি সম্পাদনা করেন, তখন তাঁরা নিজেদের বক্তব্য বোঝাবার জন্য সেই কপির ওপরে বিভিন্ন ধরণের সম্পাদনা চিহ্ন ব্যবহার করে থাকেন। যাঁরা লেখা কম্পোজ করেন, তাঁরা সেই চিহ্ন দেখেই বুঝে যান সম্পাদকের মূল বক্তব্য—

সম্পাদক কোনো জায়গায় নতুন অনুচ্ছেদ শুরু করার জন্য যে চিহ্নটি ব্যবহার করেন তা হল— (এটি দেখতে তৃতীয় বন্ধনীর মতো। কম্পোজিটার চিহ্নটি দেখে নতুন অনুচ্ছেদ তৈরি করে থাকেন।

একইভাবে যখন দুটি অনুচ্ছেদ যোগ করে একটি অনুচ্ছেদ তৈরি করতে হয়, তখন সম্পাদক — ড্যাশ চিহ্ন ব্যবহার করে থাকেন।

দুটি শব্দকে আলাদা করার জন্য একটা বড় দাঁড়ি চিহ্নের ব্যবহার করেন সম্পাদক।

আবার দুটি শব্দকে একসঙ্গে করতে শব্দ দুটির ওপরে এবং নিচে () ফাস্ট ব্র্যাকেট চিহ্নের ব্যবহার করেন সম্পাদক।

অনেক সময় বাদ যাওয়া অক্ষর বা শব্দকে বাক্যে ঢোকানোর জন্য ∧ ক্যারেট চিহ্ন ব্যবহার করেন সম্পাদক।

এছাড়াও আরও অনেক সম্পাদনা চিহ্ন রয়েছে, যা সম্পাদক তাঁর সম্পাদনার কাজে ব্যবহার করে থাকেন।

১১.৬ অঙ্গসজ্জা

সংবাদপত্র সম্পাদনায় একটি অন্যতম অনুষঙ্গ হল অঙ্গসজ্জা। ছবি, শিরোনামের বৈচিত্র্য, রুল, কার্টুন ইত্যাদির সমন্বয়ে এক একটি পৃষ্ঠার অঙ্গসজ্জা তৈরি করা হয়। আবার সংবাদপত্রকে দৃষ্টিনন্দন ও পাঠযোগ্য করে তুলতে অঙ্গসজ্জার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। যে কোনো সংবাদপত্রের প্রতিটি পৃষ্ঠায় আলাদা আলাদা করে অঙ্গসজ্জা করতে হয়, যদিও সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠার অঙ্গসজ্জাই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সংবাদপত্রের প্রথম পাতাতেই প্রাথমিক পরিচয়, গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ এবং ছবি থাকে।

সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় সব সংবাদের স্থান হয় না বলেই সবচেয়ে বড় খবরকে প্রথম পাতায় রেখে অন্যান্য খবরকে ভেতরের পাতায় নিয়ে যাওয়া হয়। সংবাদের কাগজের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় প্রথম পাতাকেই। অবশ্য এক্ষেত্রে বাণিজ্য, খেলাধূলা,

সংস্কৃতি, সম্পাদকীয়, উত্তর সম্পাদকীয়, চিঠিপত্র ইত্যাদির জন্য আলাদা আলদা পাতার নির্দিষ্ট স্থান থাকে।

কাগজের অঙ্গসজ্জার কাজ শুরু হয় ডামি শিটের ওপর। 'ডামি শিট' মূলত কাগজের পাতার একটি নকল রূপ, যেখানে কলামের মাপ, কাগজের মাপ, বিজ্ঞাপনের জায়গা, বিভিন্ন চিহ্ন ইত্যাদির উল্লেখ থাকে। ডামি শিট বিজ্ঞাপন বিভাগ থেকে সম্পাদকীয় বিভাগে পৌঁছালে সম্পাদনার দায়িত্বে থাকা বার্তা সম্পাদক, মুখ্য অবর-সম্পাদক বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন খবরকে সাজাতে থাকেন। কলাম, সেন্টিমিটার নির্দেশ করে বিভিন্ন সংবাদ এবং ছবিকে নির্দিষ্ট স্থানে বসিয়ে অঙ্গসজ্জার প্রাথমিক কাজ করা হয়ে থাকে। কোনো সংবাদ ঠিক কত কলাম জায়গা নিয়ে কোথায় বসবে, তা সম্পাদনার দায়িত্বে থাকা সম্পাদকগণ ঠিক করে থাকেন।

অঙ্গসজ্জার সময় সংবাদের মূল্য অনুযায়ী বিভিন্ন সংবাদকে সাজাতে হয়। প্রতিদিনের প্রধান খবরকে বড় হরফে বেশি জায়গা নিয়ে বসাতে হয়, যেন সংবাদ পাঠকেরা সেটা দেখেই খবরের প্রতি আকর্ষিত হন। অঙ্গসজ্জাকে দৃষ্টিনন্দন করে তুলতে হয়, পাঠক যেন কাগজের পাতায় চোখ রেখেই বুঝতে পারেন সজ্জাটি অনেক স্মার্ট এবং সুন্দর হয়েছে। অঙ্গসজ্জার মূল নীতি পাঁচটি—

- ভারসাম্য তথা Balance
- কেন্দ্রবিন্দু তথা Focus
- বৈপরীত্য তথা Contrast
- গতি তথ্য Movement এবং
- একতা তথা Unity

ভারসাম্য আবার দুই ধরনের— ক) বিধিসম্মত ভারসাম্যতা এবং খ) বিধি বহির্ভূত ভারসাম্যতা। বিধিসম্মত ভারসাম্যতার মূল কাজ হল কাগজের পাতার ডানদিক এবং বাঁদিক একইভাবে সাজানো। অর্থাৎ ডানদিকে দুই কলাম সংবাদ থাকলে বাঁদিকেও দুই কলাম সংবাদ থাকবে। একইভাবে ওপর এবং নিচের সাদৃশ্যও বজায় রাখতে হয়। বিধিবহির্ভূত ভারসাম্যের ক্ষেত্রে অবশ্য তেমন বাধ্যবাধকতার চাপ নেই। শিরোনাম, কলাম, রুল, ছবি ইত্যাদির ব্যবহার করে এই ভারসাম্যের চাহিদা মেটানো হয়ে থাকে। অঙ্গসজ্জায় এই ধরণের ভারসাম্যের প্রয়োগের চিত্র বেশি লক্ষণীয়।

কেন্দ্রবিন্দুর স্থান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কেন্দ্রবিন্দুর সঙ্গে ভারসাম্যের সম্পর্ক রয়েছে বলেই ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে একটি কেন্দ্রবিন্দুকে স্থির করতে হয়। পাঠকের দৃষ্টিকে ঠিক স্থানে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে কেন্দ্রবিন্দুর ভূমিকা অন্যতম।

অঙ্গসজ্জায় বৈপরীত্য প্রতিষ্ঠার দিকটিও অন্যতম। নান্দনিক ও কার্যকরী দুদিক থেকেই অঙ্গসজ্জাকে সফল করে তোলে বৈপরীত্য। দুই ধরণের হরফসজ্জা দিয়ে বৈপরীত্য প্রতিষ্ঠা করা হয় বলে সংবাদের সৌন্দর্যের পাশাপাশি পাঠকের আকর্ষণ ধরে রাখা সম্ভব হয়।

অনেক সময় আবার ডিসপ্লে, বডি টাইপ, বোল্ড ফেস, লাইট ফেস, বিভিন্ন মাপের শিরোনাম দিয়ে বৈপরীত্যের তারতম্যকে বজায় রাখা হয়।

শিল্পকর্মের সঙ্গে গতির যোগ থাকে বলেই অঙ্গসজ্জাতে গতির প্রয়োজনীয়তা লক্ষ করা যায়। গতির তারতম্যের জন্যই পাঠকের দৃষ্টি সবসময় এক-একটি পাতায় ঘুরে ফিরে নির্দিষ্ট সংবাদ খুঁজতে থাকে। এই গতি যতটা সহজ হয়, অঙ্গসজ্জা ঠিক ততটাই সফল হয়।

অঙ্গসজ্জার আরেকটি দিক হল একতা। একই হরফ ব্যবহারের ফলে এই একতা বজায় থাকে এবং এতে কাগজের মৌলিকত্ব বাড়তে থাকে। শুধুমাত্র হরফ নয়, বরং ছবি, রুল এবং সংবাদ কাহিনি দিয়েও এই একতাকে ধরে রাখা যায়।

অঙ্গসজ্জার বিভিন্ন রূপও লক্ষ করা যায়—

ক) ব্রেস মেক-আপ— এর গুরুত্ব পৃষ্ঠার ওপরের ডানদিকে। হুকের সঙ্গে এর অনেকটাই মিল আছে।

খ) ম্যাগাজিন মেক-আপ— নান্দনিক বোধ প্রতিষ্ঠার ওপরে জোর দিয়ে থাকে। বিভিন্ন সাময়িক পত্রে এর ব্যবহার দেখা যায়।

গ) সার্কেল লে-আউট— বড় শিরোনাম, রঙিন হরফ ও আলোক চিত্রের প্রয়োগ বেশি হয়। তিন রং বিশিষ্ট সার্কাস থেকে সার্কেল লে-আউটের উদ্ভব।

ঘ) মডুলার লে-আউট— আয়তক্ষেত্রের মাপে সংবাদ পরিবেশন করা হয়।

ঙ) ট্যাবলয়েড মেক-আপ— নাটকীয় পরিবেশনার ওপর বেশি জোর দেয়। সান্ধ্য কাগজের মেক-আপ এরকম হয়ে থাকে।

অঙ্গসজ্জার ক্ষেত্রে এমন কিছু নিয়ম রয়েছে, যা মেনে চললে কাজের ক্ষেত্রে অনেকটাই সুবিধে হয়ে থাকে—

- সবচেয়ে ওপরে কাগজের নাম থাকবে।
- ওপরের বাঁদিকে বড় খবর রাখতে হবে।
- সংবাদ কাহিনিগুলো গুরুত্ব অনুযায়ী ক্রম অনুযায়ী নিচে স্থান পাবে।
- প্রত্যেক শিরোনামের মধ্যে বৈপরীত্য বজায় রাখতে হবে।
- বডি টাইপের ধূসরতার জন্য ছবির ব্যবহার ভালো করতে হবে।
- দুটি কলামের মাঝে খুব বেশি সাদা অংশ রাখা যাবে না।
- উৎকর্ষতা বজায় রাখতে প্রয়োজনে নিয়ম ভাঙতে হবে।
- দেখতে হবে অঙ্গসজ্জার সৃজনশীল দিকটি যেন বজায় থাকে।

১১.৭ শিরোনাম

সংবাদপত্রে শিরোনাম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, কেননা যে কোন সংবাদের নির্যাসটুকু ধরা থাকে এই শিরোনামের মধ্যে। সংবাদ পাঠকেরা কাগজের শিরোনামে চোখ

বুলিয়েই সমস্তটা মোটামুটি বুঝে নিতে পারেন। সংবাদপত্র প্রকাশনার প্রথম যুগে শিরোনামের তেমন ব্যবহার ছিল না বললেই চলে।

উনিশ শতকের মধ্যভাগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শিরোনামের চল শুরু হয় বিভিন্ন যুদ্ধের খবরকে কেন্দ্র করে। এরপর আসে হলুদ সাংবাদিকের যুগ তথা বিভিন্ন চাঞ্চল্যকর সংবাদকে নাটকীয় ভাবে চমক সৃষ্টি করে পরিবেশন করা হতে থাকে। পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য বড় শিরোনামের প্রচলন শুরু হতে থাকে। ধীরে ধীরে সংবাদপত্রে শিরোনাম অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়।

সংবাদপত্রের গুরুত্ব অনুযায়ী শিরোনাম তৈরি হতে থাকে। কাগজের প্রথম পাতায় দিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খবর বড় হরফে সবচেয়ে বড় জায়গা নিয়ে ছাপা হয়। তারপর ধীরে ধীরে গুরুত্ব অনুযায়ী খবরের শিরোনাম ছোট হতে থাকে। প্রতিটি পাতায় আলাদা আলাদা শিরোনাম বিভিন্ন সংবাদের ক্ষেত্রে বিভাজন তৈরি করে। বিভিন্ন ছোটো বড়ো শিরোনাম দেখেই পাঠকেরা আলাদা আলাদা সংবাদ বুঝে নিতে পারেন। কোথায় কী ধরণের শিরোনাম ব্যব্যহার হবে তা চূড়ান্ত হয় সংবাদ সম্পাদনার সময়—

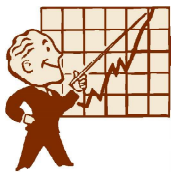
- শিরোনামের একটি জনপ্রিয় রূপ 'বাম স্পর্শক' (Flush left)। সাধারণত দুই-তিন লাইনের মধ্যে তৈরি হয় এই শিরোনাম। প্রতিটি লাইন বাঁ দিকের স্তম্ভরেখা থেকে শুরু হয়ে ডানদিকের যে কোনো স্থানে শেষ হয়।
- অন্য একটি শিরোনাম হল 'দক্ষিণ বাম স্পর্শক' (Flush right and left)। এই ধরনের শিরোনাম দুই-তিন-চার লাইন বিশিষ্ট হয়ে থাকে। দুই দিকের স্তম্ভরেখার পাশে সমান সাদা জায়গা ছেড়ে লাইনগুলি সাজানো হয়ে থাকে। ফলে সমান সাদা স্থান একটি ভারসাম্য নিয়ে আসে।
- আবার বহু প্রচলিত এক ধরনের শিরোনাম হল 'উল্টো পিরামিডের শিরোনাম', যা দুই-তিন লাইন দিয়ে তৈরি হয়। এক্ষেত্রে প্রথম লাইনটি এক দিকের স্তম্ভরেখা থেকে বিপরীত দিকের স্তম্ভরেখা পর্যন্ত প্রসারিত হয়। পরের লাইনগুলো ক্রমশ প্রস্থে ছোটো হতে থাকে বলে উল্টো পিরামিডের মতো দেখতে হয়।
- শিরোনামের অন্য একটি রূপ হল 'ওয়েস্ট লাইন'। যেখানে তিনটি লাইন থাকে, প্রথম এবং তৃতীয় লাইন সমান আকারের হয়। দ্বিতীয় লাইন ছোটো হয়ে বাঁ এবং ডানদিকে সমান ফাঁকা রেখে মধ্যে বসে। কোমরের সঙ্গে সাদৃশ্যবশত হওয়ায় এর নাম ওয়েস্ট লাইন।
- 'স্ট্র্যাপ লাইন' শিরোনামের অন্য এক রূপ, যেখানে মূল শিরোনামের ওপরে ফিতের মতো একটি লাইন রাখা হয় এবং লাইনটি ডান, বাঁ অথবা মাঝে বসতে পারে। এর অপর নাম ওভারলাইন বা শোল্ডার। মূল শিরোনামের মাপ যদি ৪৮ পয়েন্ট হয়ে থাকে, তবে স্ট্র্যাম্প লাইনের মাপ হয় ২৪ পয়েন্ট।

- একটি মাত্র লাইন দিয়ে তৈরি হয় 'ক্রশ লাইন' শিরোনাম। তিন-চার কলাম জায়গা নিয়ে কলামের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং কলামের দুদিকে সামান্য ফাঁক থাকে।

'ব্যানার' শিরোনামে আট কলাম জুড়ে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ ছাপা হয়। বড় খবর হলে সমস্ত পাতা জুড়েই এমন শিরোনাম তৈরি হয়।

সম্পাদনার সময় রিপোর্টার বা সংবাদ প্রতিবেদকের প্রতিবেদনে শিরোনাম দেন অবর-সম্পাদক। ঘষামাজা করে ছাপার উপযুক্ত হলেই অবর সম্পাদক উপযুক্ত শিরোনাম ব্যবহার করেন। অল্পকথায় সঠিক শব্দচয়ন শিরোনামকে সার্থক করে তোলে। শিরোনামের মধ্যে নাটকীয়তা, অভিনবত্ব এবং চমক থাকে বলে মেজাজ ধরে রাখার জন্য উপমা, রূপক ইত্যাদি অলংকারের ব্যবহার চলে না।

স্বভাবত শিরোনামে বর্তমান কালের ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হয়। অনেক সময় শিরোনামে কোটেশনের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। কারো উক্তি অথবা সন্দেহজনক কিছু থাকলে কোটেশন ব্যবহার করা হয়ে থাকে। অনেক সময় আবার শিরোনামের পাশাপাশি উপ-শিরোনামের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। লম্বা লেখার মধ্যে 'উপ-শিরোনাম' মরুদ্যান হয়ে ওঠে যা পাঠকের চোখকে বিশ্রাম দিলেও উপ-শিরোনাম ঘন ঘন ব্যবহার করা উচিত নয় ।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

৩। সংবাদত্রের শিরোনামের রচনার প্রয়োজনীয়তা লিখুন। (১০০ শব্দের মধ্যে লিখুন)

১১.৮ টাইপসজ্জা ও মার্জিন

- **টাইপসজ্জা:**

টাইপ তৈরি হয় মূলত ছাপা লেখা দিয়ে। বিভিন্ন ধরনের এবং বিভিন্ন মাপের টাইপের ব্যবহার মুদ্রণকে দৃষ্টিনন্দন এবং অভিনব করে তোলে। ছাপা লেখাকে সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য এই টাইপসজ্জার প্রয়োজন হয়। টাইপের সাইজ, ধরন এবং ব্যবহারের ওপর নির্ধারণ করেই টাইপসজ্জার রূপরেখা তৈরি হয়ে থাকে।

টাইপসজ্জার বিভিন্ন ধরন সম্পর্কে সম্পাদককে অত্যন্ত দক্ষ হতে হয়। শিরোনাম, সংবাদপত্রের অক্ষর ইত্যাদি সবকিছুতেই টাইপসজ্জার অন্যতম ভূমিকা থাকে। ইংরেজিতে টাইপ ফেস দুই রকমের হয়ে থাকে- 'সেরিফ' ও 'সান্স'। সেরিফে সূক্ষ্মরেখা থাকলেও সান্সে কোনো সূক্ষতা নেই। সান্সের টাইপ একটু ভোঁতা ও মোটা ধরনের হয়ে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়— 'স্টেটম্যান'-এর টাইপ সেরিফ; যার নাম সেঞ্চুরি।

হরফের মাপকে বলা হয়ে থাকে পয়েন্ট। সাধারণত ১ ইঞ্চির ১/৭২ অংশকে বলা

হয় ১ পয়েন্ট। এই একই মাপ অনুযায়ী ৫½, ৬, ৭, ৮, ১০, ১২, ১৪, ১৮, ২৪, ৩০, ৩৬, ৪২, ৪৮, ৬০, ৭২ পয়েন্ট পর্যন্ত হয়ে থাকে। ৭২ পয়েন্ট হল ১ ইঞ্চি। কখনও এর চেয়ে বড় হরফের দরকার হলে তা ক্যামেরার সাহায্যে বড় করে নেওয়া হয়।

টাইপসজ্জার ক্ষেত্রে টাইপের আয়তনও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সব টাইপের আয়তন আলাদা আলদা হয়। আয়তনের হিসেব হল ১ ইউনিট। AB অর্থাৎ বাংলায় ক, খ হল ১ ইউনিট। MW ঝ ঞ হল ১½ ইউনিট। ইংরেজিতে I, অন্যদিকে দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলন ইত্যাদি হল ½ ইউনিট।

টাইপের তিনটি পরিবার রয়েছে—

'আদল' তথা face— বিভিন্ন ধরণের নক্সা।

'শ্রেণি' তথা front— অক্ষরের একটি বিশেষ ধরণের নক্সার সামগ্রিক রূপ।

'পরিবার' তথা family— একই শ্রেণির বিচিত্র অক্ষরের সমষ্টি। যেমন— হাল্কা (light), ছড়ানো (expanded), মধ্যম (medium), স্থূল (bold), ঘনসন্নিবিষ্ট (condensed), বাঁকা (italic) ইত্যাদি।

পয়েন্ট দিয়ে টাইপের প্রস্থ মাপা হলেও বলার সময় বলা হয় 'এম'। এর অপর নাম 'পাইকা এম', যা দেখতে চৌকো আকৃতির। সাধারণত এর মাপ ১২ ×১২ = ১৪৪ বর্গ বিন্দু হয়। অক্ষর দিয়ে লেখা সাজাবার সময় এইসব দিককে মাথায় রেখে কাজ করতে হয়।

মার্জিন:

যে কোনো মুদ্রিত লেখার দুই প্রান্তে যে সাদা অংশটুকু থাকে, তাকে বলা হয় মার্জিন। কম্পোজের ক্ষেত্রে দুই দিকেই মার্জিন সমান রাখা হয়। মার্জিনের সাদা অংশ পাঠযোগ্যতা বাড়িয়ে দেয় বলে পাঠক যে কোনো মুদ্রিত লেখা অতি অনায়াসেই পড়ে যেতে পারেন। এক মার্জিন থেকে অন্য মার্জিনের লাইনের মাপের পাশাপাশি কলামের মাপও লেখার সৌন্দর্যকে বাড়িয়ে তোলে। যদিও কলামের আলাদা আলাদা মাপ থাকে। কলামের দুদিকে সামান্য সাদা অংশের মার্জিন রেখে তারপর লাইন বসাতে হয়। কলামের প্রস্থ যদি 'এম' হয়, তবে লাইনের মাপ হয় ১১½ 'এম'। ½ 'এম' জায়গা দুদিকে ছেড়ে দিতে হয়। রচনার পাঠযোগ্যতা বাড়াতে এবং রচনার উপস্থাপনাকে সুন্দর ও দৃষ্টিনন্দন করতে টাইপসজ্জার পাশাপাশি মার্জিনেরও যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে।



১১.৯ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

এই অধ্যায়টি পড়ে আমরা—

- সম্পাদনার নীতিসমূহ ও সংবাদপত্র সম্পাদনা সম্পর্কে জানলাম।
- সম্পাদনা চিহ্ন, অঙ্গসজ্জা এবং সম্পর্কে অবগত হলাম।
- সংবাদপত্রে শিরোনামের গুরুত্ব কতখানি, তা জানলাম।
- টাইপসজ্জা ও মার্জিনের প্রয়োগ সম্পর্কে ধারণা পেলাম।



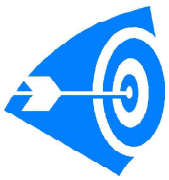
১১.১০.০ অতিরিক্ত পঠন

ভট্টাচার্য, সুভাষ (২০১৮); বাংলা লেখক ও সম্পাদকের অভিধান; কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

ঘোষ, সাগরময় (১৯৬৬); সম্পাদকের বৈঠকে; কলকাতা: ত্রিবেণি প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড

লোধ, বিজন কুমার (১৯৭৩); সম্পাদকের কলমে; কলকাতা: দীপ্তি প্রকাশনী

সেনগুপ্ত, জ্যোতির্ময় (২০২২); পাণ্ডুলিপি থেকে প্রুফ সংশোধন; কলকাতা: সপ্তর্ষি প্রকাশন



১১.১১ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত

১। আমরা সকলেই জানি... মনোরম অভিজ্ঞতা.... এভাবে লিখুন।

২। সাময়িকপত্র... তদারকি করে থাকেন .....এভাবে উত্তর তৈরি করুন।

৩। সংবাদপত্রে শিরোনাম... গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। .....এভাবে উত্তরটি নির্মাণ করুন।



১১.১২ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। সম্পাদনা রীতি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২। সংবাদপত্র সম্পাদনা বলতে কী বোঝ, নিজের ভাষায় লিখুন।

৩। সম্পাদনা চিহ্নের উপযোগিতা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৪। টীকা লিখুন— 'অঙ্গসজ্জা'।

৫। সংবাদপত্রে শিরোনাম রচনার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে লিখুন।

৬। সংবাদপত্রে টাইপসজ্জার বিভিন্ন দিক আলোচনা করুন।

৭। টীকা লিখুন— 'মার্জিন'।

অধ্যায় ১২ : গ্রন্থ সম্পাদনা

বিন্যাস ক্রম

১২.১ জ্ঞাতব্য বিষয়
১২.২ পরিচিতি
১২.৩ গ্রন্থ সম্পাদনা কী
১২.৪ গ্রন্থ সম্পাদকের করণীয় কর্তব্য
১২.৫ নীতি ও নিয়ম
১২.৬ অধ্যায় সংক্ষেপ
১২.৭ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম
১২.৮ অতিরিক্ত পঠন
১২.৯ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত
১২.১০ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১২.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই বিষয়টি পাঠ করে শিক্ষার্থী জানতে পারবেন—

- গ্রন্থ সম্পাদনা কি সেই সম্পর্কে ধারণা জন্মাবে।
- গ্রন্থ সম্পাদনার বিভিন্ন কৌশল বা নিয়ম সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- একজন সম্পাদককে গ্রন্থ সম্পাদনা করতে গেলে কি কি বিষয়ে সচেতন হতে হয় সে বিষয়ে ধারণা প্রদান হবে।

১২.২ পরিচিতি

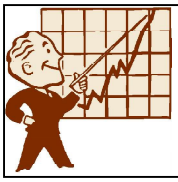
একজন দক্ষ কপি এডিটরের মতোই সম্পাদনার এই কাজটি লেখককে নিজের লেখাকে সুললিত করে তুলতে সাহায্য করে, লেখক যে সমস্যাগুলির মুখোমুখি হয়েছেন তার পর্যালোচনা করে এবং যেখানে উপযুক্ত সংশোধনের (আংশিক বা পূর্ণ) প্রয়োজন তা দেখিয়ে দেয়। বারবার নিজের লেখা পাঠ ও বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি শৈল্পিক সম্ভাবনার দিকটি খতিয়ে দেখাই এই স্তরের প্রধান কাজ। লেখক-সম্পাদক রচনার বক্তব্যকে খুঁটিয়ে পড়েন, পরিমার্জনের জায়গাগুলো চিহ্নিত করেন এবং তারপর নিজের প্রজ্ঞা অনুযায়ী রচনাটির কাঙ্ক্ষিত সাফল্য নিশ্চিত করেন। যখন কোনও লেখক তাঁর সৃজনশীল কাজ সম্পাদনা করেন তখন তিনি মূলত ব্যাকরণ, বানান এবং বাক্য বিন্যাসের স্তরে সেটা করে থাকেন। এই কাজটিকে কেউ কেউ অনুলিপি সম্পাদনা বা 'কপি এডিটিং' বলেন। এখানে লেখকের চেষ্টা থাকে যাতে নির্ভুল ভাবে নির্দিষ্ট বক্তব্য বা আদর্শ সমন্বিত লেখাটিকে

তিনি প্রকাশকের কাছে নিয়ে যেতে পারেন। বলা বাহুল্য, এই স্তরেও সম্পাদনা করতে কিন্তু লেখককে পুনর্লিখন প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে যেতে হয়। তাই বারবার পড়া ও সংশোধন করার কাজটি এই স্তরেও চলতে থাকে, যতক্ষণ না লেখক অভীষ্ট পাঠকের বোধের উপযোগী ভাষা, শব্দ চয়ন, বাক্য বিন্যাস, বর্ণনাভঙ্গি অর্থাৎ সম্পূর্ণ উপস্থাপনা সম্পর্কে সন্তুষ্টি লাভ করেন। কখনও লেখক অনুলিপি সম্পাদন এবং একই সঙ্গে প্রুফ সংশোধনের জন্য পেশাদার সংশোধকের সাহায্য নেন। অনেক প্রকাশনা সংস্থা এই কাজের জন্য পেশাদার সংশোধককে নিয়োগ করেন, যাঁরা অনুলিপি সম্পাদন ও মুদ্রণ সংশোধন করে থাকেন।

১২.৩ গ্রন্থ সম্পাদনা কী

গ্রন্থ সম্পাদনা হল যে কোনো সাহিত্যিক ও গবেষণাধর্মী রচনাকে সঠিকভাবে উপস্থাপনের জন্য ভাষা, ব্যাকরণ, শৈলী, তথ্য ও রূপ গঠনগত দিক থেকে সংশোধন পরিমার্জন ও সুশৃংঙ্খল করার প্রক্রিয়া। ঝকঝকে নতুন বই হাতে তুলতেই আমাদের রোমাঞ্চ হয়। অঙ্গ সৌষ্ঠবের সৌন্দর্য মন ভরিয়ে দেয়। তারপর পাতা উল্টে চলে যাই বিষয়ের গভীরে, অজানা জগৎ-এর অভ্যন্তরে। পরিচ্ছেদ থেকে পরিচ্ছেদে, অনুচ্ছেদের পরতে পরতে মোহবিষ্ট হই বিষয়ের উৎকর্ষতায়, রচনার অভিনব চারিত্রিক বিশিষ্টতায়। একসময় গ্রন্থপাঠ শেষ হয়, মন ভরে ওঠে মনোরম পাঠের উপলব্ধিতে, অভিজ্ঞতায়। বই পড়ার আনন্দটুকুই আমরা উপভোগ করি। রচনার উৎকর্ষে মনপ্রাণ ভরে থাকে। ধন্য ধন্য করি লেখককে। খেয়াল থাকে না একটি গ্রন্থের উৎপাদনে শুধু লেখক নয়, আরো অনেকের অবদান আছে। মলাট থেকে অনুচ্ছেদ সজ্জা সব কিছুতেই রয়েছে সৃজনশীল পরিকল্পনা যার মূল স্থপতি হলেন গ্রন্থ সম্পাদক।

একটি ভালো বই মানেই উৎকৃষ্ট মানের সম্পাদিত বই। একটি যথেষ্ট উচ্চমানের পরিকল্পিত প্রয়াস। লেখক বই লেখেন, বাস্তবায়িত করেন তার ভাবনা ও সৃজনশীলতাকে লেখার মধ্যে। কিন্তু এটুকু সম্পন্ন হলেই ভালমানের গ্রন্থ উৎপাদন হয় না। লেখকের সৃজনকে যথার্থভাবে গ্রন্থে আবন্ধ করতে, পাঠযোগ্য করে গড়ে তুলতে দরকার একজন দক্ষ গ্রন্থ সম্পাদক।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

১। গ্রন্থ সম্পাদনা সম্পর্কে পরিচয় দিন (শব্দসংখ্যা ৮০)

১২.৪ গ্রন্থ সম্পাদকের করণীয় কর্তব্য

লেখক থেকে পাঠক (From Writer to Reader) একটি গ্রন্থের এই যে যাত্রাপথ সেখানে বহু মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টার চিহ্ন লক্ষ করা যায়। একদিকে লেখক তাঁর

জ্ঞানভাণ্ডারের সংহত ভাবনা দিয়ে বিষয়ের গৌরবকে বৃদ্ধি করেন, অন্যদিকে সম্পাদক তাঁর সজাগ দৃষ্টির নিখুঁত প্রয়াসে গ্রন্থটিকে নির্ভুলভাবে পাঠকের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলার যাবতীয় কাজগুলিকে সম্পন্ন করেন, প্রচ্ছদশিল্পী তাঁর দক্ষতা দিয়ে গ্রন্থটিকে দৃষ্টিনন্দন করে তোলেন, কেউ কম্পোজ করেন, কেউ প্রিন্ট করেন, কেউবা সঠিকভাবে বাঁধাই করেন ইত্যাদি সকল কাজগুলি সুচারুরূপে নির্বাহ করার উপর গ্রন্থ প্রকাশের সার্থকতা নির্ভর করে।

- **গ্রন্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে সম্পাদকের অবস্থান**

গ্রন্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে লেখক ও প্রকাশকের মধ্যমণি হিসাবে রূপকারের দায়িত্ব পালন করেন সম্পাদক। লেখকের কাছ থেকে কোনো প্রকাশক পাণ্ডুলিপি পাওয়ার পরে সেটিকে সম্পাদক বা সম্পাদকমণ্ডলীর কাছে গ্রন্থ নির্বাচন প্রসঙ্গ মধ্যমণি হিসাবে রূপকারের দায়িত্ব পালন করেন সম্পাদক। লেখকের কাছ থেকে কোনো প্রকাশক পাণ্ডুলিপি পাওয়ার পরে সেটিকে সম্পাদক বা সম্পাদকমণ্ডলীর কাছে পাঠিয়ে দেন। এখানে উল্লেখ করতে হয় যে, প্রতিষ্ঠিত বা কালজয়ী লেখকের পাণ্ডুলিপি নতুন করে সম্পাদনার প্রয়োজন হয় না।

গ্রন্থের স্রষ্টা যখন তাঁর রচনাকার্যে নিমগ্ন থাকেন, সম্পাদক তখন সেই সৃজনশীল রচনাকে সার্থকভাবে রূপায়িত করার ভাবনায় মগ্ন থাকেন। সম্পাদক তাঁর মনন ও মেধা দিয়ে গ্রন্থটির সামগ্রিক রূপরেখা তৈরি করেন-বইটি কোন উদ্দেশ্যে রচিত, তার পাঠক কারা, বইয়ের মধ্যে উল্লিখিত তথ্য পাঠকের জ্ঞানতৃষ্ণাকে কতখানি পূরণ করতে পারবে, গ্রন্থের শিরোনাম, অধ্যায় বিভাজন, বানান নির্ভুল করা, শব্দের যথাযথ প্রয়োগ বিষয়ে সতর্ক থাকা, চিত্র ও বিভিন্ন সারণির বিন্যাস, প্রচ্ছদ, গ্রন্থের মূল্য-ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ের যথাযথ বিশ্লেষণ, পরিমার্জন, সংশোধন সব দায়িত্ব পালন করা।

গ্রন্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে সম্পাদকের ভূমিকাগুলিকে আমরা সূত্রাকারে নিম্নরূপভাবে তুলে ধরতে পারি—

(১) **ভাষাতাত্ত্বিক সংশোধন:** গ্রন্থের মধ্যে কোনো ভাষাগত ত্রুটি আছে কিনা সে বিষয়টি খতিয়ে দেখেন সম্পাদক। ব্যাকরণগত দিক থেকে কোথাও কোনো ভুল থাকলে কিংবা বাক্যগঠন বা যতি চিহ্নের প্রয়োগে কোথাও কোনো জটিলতা থাকলে সম্পাদক তা সংশোধন করেন।

(২) **বানান বিষয়ে সচেতনতা:** কালের পরিবর্তনের সাপেক্ষে বানানের বিবর্তনধারা সম্পর্কে সম্পাদকের সম্যক জ্ঞান থাকা আবশ্যক। যেমন বাংলা বানানের ক্ষেত্রে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সম্পর্কিত সুপারিশ বা পরবর্তীতে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির বানান-বিধি ইত্যাদি বিষয় মেনে গ্রন্থের বানানকে নির্ভুল করা সম্পাদকের বড় দায়িত্ব। বানান ভুলের পরিমান বেশি থাকলে সম্পাদক অভিজ্ঞ ও প্রফেশনাল প্রুফ রিডারকে দিয়ে বানান সংশোধনের ব্যবস্থা করেন।

(৩) **কপিরাইট আইন:** কপিরাইট আইন বিষয়ে সম্পাদককে বিশেষ সর্তক থাকতে হয়। গ্রন্থের মধ্যে কোনো বাক্য বা অনুচ্ছেদ, চিত্র বা অন্য কোনো তথ্য যদি কপিরাইট আইন ভঙ্গ করে থাকে তাহলে সেই বিষয়টাকে সংশোধন করা অথবা লেখক এবং প্রকাশকের সঙ্গে আলোচনা করে সেই অংশগুলিকে বাদ দেওয়ার ব্যবস্থা করেন সম্পাদক।

(৪) **গ্রন্থের প্রারম্ভিক ও শেষ অংশের পরিমার্জন:** গ্রন্থের প্রারম্ভিক অংশ যথা- শিরোনাম, লেখক ও প্রকাশকের নাম, ISBN, উৎসর্গ, সূচিপত্র ইত্যাদি বিষয়গুলি নির্ভুল এবং যথাযথ করার বিষয়ে সম্পাদকের বিশেষ নজর থাকে। সেই সঙ্গে গ্রন্থের End matter বা শেষ অংশ যেমন—পরিশিষ্ট, গ্রন্থপঞ্জি, নির্ঘণ্ট তৈরি ইত্যাদি বিষয়গুলি যথাযথ করার দিকেও সম্পাদককে খেয়াল রাখতে হয়।

(৫) **প্রচ্ছদ ও মলাট তৈরি:** গ্রন্থের বিষয় ভাবনার সঙ্গে মিল রেখে প্রতিষ্ঠিত শিল্পীকে দিয়ে যথাযথ ও আকর্ষণীয় প্রচ্ছদ সহযোগে ভালো মলাট তৈরির ক্ষেত্রে সম্পাদকের বিশেষ ভূমিকা থাকে সম্পাদকই শিল্পীকে গ্রন্থের বিষয়ভাবনাকে বুঝিয়ে বলেন এবং মলাটের কাগজ ও গুণগত মান বৃদ্ধির দায়িত্ব পালন করেন।

(৬) **পুনরাবৃত্তি সংশোধন:** অনেক সময় লেখার মাঝে একই কথা বা তথ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটে। লেখার মান বৃদ্ধির জন্য সম্পাদক পুনরাবৃত্তি হয়েছে যে অংশগুলি সেগুলিকে বাদ দিয়ে দেন।

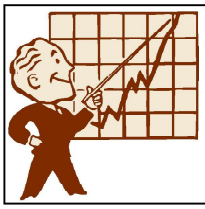
(৭) **রূপসজ্জা:** গ্রন্থের রূপসজ্জা বিষয়ে সচেতন থাকতে হয় সম্পাদককে। গ্রন্থের বিষয়বস্তুকে স্পষ্ট ও আকর্ষণীয় করে পাঠকের কাছে তুলে ধরার লক্ষ্যে সম্পাদক ডিজাইনার, ইলাস্ট্রেটর, টাইপসেটার সকলকেই যথাযথ নির্দেশ দিয়ে থাকেন। দুটি লাইনের মাঝে গ্যাপ, প্যারাগ্রাফের মধ্যে গ্যাপ, হরফের স্টাইল গ্রন্থের আঙ্গিকসজ্জার দিকগুলিকে লেখার বিষয় অনুযায়ী সঠিকভাবে সাজিয়ে দেন সম্পাদক। লেখকের দেওয়া ইলাস্ট্রেশন, ছবি, টেবিল, ইত্যাদি বাছাই করে যথাযথ স্থানে বিন্যাস করা কিংবা অতিরিক্ত ইলাস্ট্রেশন প্রয়োজন হলে কীভাবে কার কাছ থেকে তা পাওয়া যাবে সে বিষয়ে লেখককে পরামর্শ দিয়ে থাকেন সম্পাদক।

(৮) **সময় সচেতনতা:** সম্পাদকের একটি বড় গুণ হল সময় বিষয়ে সচেতনতা। লেখকের কাছ থেকে পাণ্ডুলিপি পাওয়ার পরে সংশোধনের বিভিন্ন পর্যায়ের কাজগুলি সঠিকভাবে সম্পন্ন করে গ্রন্থটির প্রকাশ পর্যন্ত দীর্ঘ প্রক্রিয়া যাতে সঠিকভাবে সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ হয় সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হয় সম্পাদককে। এর জন্য সম্পাদককে নিজের প্রত্যক্ষ কাজের বিষয়ে যেমন দক্ষ

ও সজাগ হতে হয় তেমনি গ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে জড়িত টাইপরাইটার, প্রিন্টিং-এর সাথে যুক্ত ব্যক্তি, প্রুফ রিডার, প্রচ্ছদশিল্পী, বাইন্ডার-ইত্যাদি সকলের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে যথাযথ নেতৃত্ব দিয়ে সমগ্র কাজটিকে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে শেষ করতে হয়।

(৯) **প্রযুক্তিগত দক্ষতা:** ডিজিটাইজেশনের ব্যাপক প্রসারের ফলে আধুনিক প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত সম্পাদকের একটি প্রধান বিশিষ্টতা হল ছাপার কাজের সঙ্গে যুক্ত প্রযুক্তিতে দক্ষতা। তাকে কম্পিউটারের কাজ করতে জানতে হবে, বিশেষ করে ইন ডিজাইন, ফটোশপ, এডোবি ইলাস্টেটর, পেজ মেকার ইত্যাদি সফট্ওয়্যারের ব্যবহার সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। এগুলির সাহায্য নিয়ে আধুনিক প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে সম্পাদক গ্রন্থকে বিশ্বমানের করে তুলতে পারেন।

(১০) **গ্রন্থের মূল্য নির্ধারণ এবং মার্কেটিং :** গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা, ব্যবহারকারীর সংখ্যা ইত্যাদি বিবেচনা করে গ্রন্থটির যথাযথ দাম ঠিক করার কাজটি করতে হয় সম্পাদককে। শুধু তাই নয়, প্রকাশিত বইটি যাতে সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে পৌঁছে যায় অর্থাৎ মার্কেটিং-এর ব্যবস্থাও করতে হয় সম্পাদককে। আধুনিক কালে এই কাজের জন্য বিভিন্ন বৈদ্যুতিন সামাজিক মাধ্যম যেমন— ফেসবুক, টুইটার, হোয়াটস্অ্যাপ গ্রুপ, ইউটিউব ইত্যাদির সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে। সব মিলিয়ে তাই বলা যায় যে, গ্রন্থ প্রকাশ একটি যৌথ কর্মপ্রচেষ্টার সার্থক ফসল। এখানে লেখক, প্রকাশক, সম্পাদক, ছাপাখানার ব্যক্তিগণ, প্রুফ রিডার, বাইন্ডার অনেকের ভূমিকাই রয়েছে। এদের মধ্যে সম্পাদক লেখক এবং প্রকাশকের মাঝে থেকে রূপকার হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

২। গ্রন্থ সম্পাদকের করণীয় কর্তব্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন। (২০০ শব্দের মধ্যে)

১২.৫ নীতি ও নিয়ম

- **কাঠামোগত সম্পাদনা**

এই ধাপের মধ্যে দিয়ে বইয়ের সামগ্রিক কাঠামো, বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতা, গল্পের প্রবাহ বিষয়ে পরীক্ষা করা হয়ে থাকে। এখানে থাকে লেখকের ধারণা কতটা স্পষ্ট সেই দিকটির প্রতিও সচেতনতা এবং বইটির সুবিন্যস্ত গঠন সম্পর্কেও দেখা হয়ে থাকে।

- **বিষয়বস্তু সম্পাদনা**

এই ধাপে বইয়ের বিষয়বস্তুর গভীরতা, নির্ভুলতা নানা বিষয় সম্পর্কে দেখা হয়। এক্ষেত্রে লেখকের সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজন মতে পরিবর্তন করা যেতে পারে।

- **কপি সম্পাদনা**

এই ধাপে, ভাষা, বানান, বিরামচিহ্ন, ব্যাকরণ এবং লেখার শৈলী এই দিকগুলো পরীক্ষা করা হয়। এক্ষেত্রে লেখকের লেখার ধরণ এবং প্রকাশনার শৈলী বজায় থাকে।

- **স্পষ্টতা এবং সংক্ষিপ্ততা**

প্রতিটি লেখার মধ্যে ভাষার স্পষ্টতা থাকা উচিত। অপ্রয়োজনীয় শব্দ পরিহার করা উচিত। এই ধাপে সম্পাদক উক্ত দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন।

- **গঠন ও বিন্যাস**

এক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ এবং বাক্যগঠন সহজ হওয়া উচিত যা সহজে বোঝা যায়।

- **যুক্তি ও ধারাবাহিকতা**

এক্ষেত্রে বিষয়ের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা এবং যুক্তি-নির্ভর লেখা প্রস্তুত করা হয়।

- **লেখার শৈলী**

লেখার মান উন্নত হবে। লেখকের নিজস্বতা বজায় থাকবে।

- **তথ্য যাচাই**

কোনো লেখায় থাকা তথ্যের সত্যতা যাচাই করা। যদি প্রয়োজন হয় থাকে সংশোধন করা।

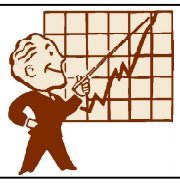
- **প্রযুক্তিগত জ্ঞান**

সম্পাদনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সফট্ওয়্যার এবং সরঞ্জাম সম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন এবং তার সুষ্ঠু প্রয়োগের দক্ষতা থাকাও আবশ্যক।

- **নিয়মিত অনুশীলন**

লেখার দক্ষতা বাড়াতে নিয়মিত অনুশীলন করা প্রয়োজন।

একটি ভালো গ্রন্থ সম্পাদনার মধ্যে দিয়ে লেখার মান উন্নত করে এবং পাঠকের মধ্যেও এক বিশেষ অভিজ্ঞতা তৈরি করে।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

৩। সম্পাদনার নীতি নিয়ম সম্পর্কে যা জানেন লিখুন। (২০০ শব্দের মধ্যে)

১২.৬ অধ্যায় সংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে গ্রন্থ সম্পাদনার বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারবেন। এছাড়া সম্পাদকের মূল কাজ, গ্রন্থ সম্পাদনা করে কীভাবে রক্ষাণা-বেক্ষণ করা যায় সে সম্পর্কেও ধারণা পাওয়া যায়। গ্রন্থ সম্পাদনা একটি সৃজনশীল, মননশীল ও দায়িত্বপূর্ণ কাজ, যা সাহিত্যের মানোন্নয়ন ও পাঠকের সহায়ক পাঠ্যবস্তুর নিশ্চয়তার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একজন সম্পাদকের কাজ শুধু বানান ও ভাষার শুদ্ধি নির্ণয়ে সীমাবদ্ধ নয়; বরং তিনি রচনার বিষয়বস্তু, সংগঠন, ধারাবাহিকতা ও প্রাসঙ্গিকতাও নিরীক্ষণ করেন। মূল লেখকের ভাব, ভাষা ও উদ্দেশ্যকে অক্ষুণ্ণ রেখে পাঠকের গ্রহণযোগ্যতার উপযোগী করে গড়ে তোলাই একজন দক্ষ সম্পাদকের প্রকৃত দক্ষতার পরিচায়ক। বর্তমানে শিক্ষাব্যবস্থা, গবেষণা এবং প্রকাশনাক্ষেত্রে গ্রন্থ সম্পাদনার গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই বলা যায়, গ্রন্থ সম্পাদনা সাহিত্যের একটি অনিবার্য অঙ্গ, যা জ্ঞানচর্চা ও জ্ঞানবিস্তারের পথকে সুসংহত ও সুদৃঢ় করে তোলে।



১২.৭ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

- গ্রন্থ সম্পাদনা করার বিভিন্ন নিয়ম-নীতি বিষয়ে জানতে পারলেন।
- সম্পাদকের গ্রন্থ সম্পাদনায় কতখানি দায়িত্ব নেওয়া উচিত সে বিষয়ে জানতে পারলেন।
- কোন কোন বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে গ্রন্থ সম্পাদনা করা প্রয়োজন সে সম্পর্কেও জানতে পারলেন।



১২.৮ অতিরিক্ত পঠন

চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ (সম্পা) (২০১২); বাংলা কী লিখবেন কেন লিখবেন, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স

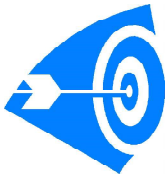
ভট্টাচার্য, সুভাষ (২০১২); লেখক ও সম্পাদকের অভিধান; কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স

ভট্টাচার্য, সুভাষ (২০১৩); তিষ্ঠ ক্ষণকাল, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স

রহমান, সিরাজুর (২০১৯); সম্পাদক দায়ী নহেন, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং

সরকার, সজীব (১৯৮৮); সংবাদ লেখা ও সম্পাদনা; ঢাকা : গতিধারা প্রকাশনী

সেনগুপ্ত, জ্যোতির্ময় (২০২২); পাণ্ডুলিপি থেকে প্রুফ সংশোধন; কলকাতা : সপ্তর্ষি প্রকাশন



১২.৯ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত

১। গ্রন্থ সম্পাদনা হল .....ঝকঝকে নতুন বই .....উত্তরটি এইভাবে তৈরি করুন।

২। লেখক থেকে পাঠক....সম্পাদক তাঁর মনন ও মেধা দিয়ে....উত্তরটি এইভাবে তৈরি করুন।

৩। কাঠামোগত সম্পাদনা.....নিয়মিত অনুশীলন.....উত্তরটি এইভাবে নির্মাণ করুন।



১২.১১ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। গ্রন্থ সম্পাদনা সম্পর্কে পরিচয় দিন।

২। গ্রন্থ সম্পাদকের করণীয় কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৩। সম্পাদনার নীতি ও নিয়ম সম্পর্কে যা জানো লিখুন।

৪। গ্রন্থ সম্পাদনার ক্ষেত্রে সম্পাদকের অবস্থান নির্ণয় করুন।

অধ্যায় ১৩ : প্রুফ সংশোধন-১

বিন্যাস ক্রম

১৩.১ জ্ঞাতব্য বিষয়
১৩.২ পরিচিতি
১৩.৩ প্রুফ সংশোধন আসলে কী ও কেন?
১৩.৪ প্রুফ সংশোধনের বিভিন্ন পুস্তিকা
১৩.৫ বাংলা প্রুফ সংশোধনের ইতিবৃত্ত
১৩.৬ অধ্যায় সংক্ষেপ
১৩.৭ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম
১৩.৮ অতিরিক্ত পঠন
১৩.৯ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত
১৩.১০ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১৩.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই অধ্যায় পাঠ করে শিক্ষার্থী—

- প্রুফ সংশোধন বিষয়ে জানতে পারবেন।
- প্রুফ সংশোধন করার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে অবগত হবেন।
- প্রুফ সংশোধনের ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা গড়ে তুলতে পারবেন।

১৩.২ পরিচিতি

সম্ভবত যেদিন থেকে মানুষের মুখের ভাষা লেখার ভাষা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করল, সেদিন থেকেই তা কীভাবে সংরক্ষণ করা যায় সেটার চিন্তা ভাবনাও শুরু হয়ে গিয়েছিল। বিভিন্ন খননস্থল থেকে প্রাপ্ত নিদর্শন থেকে এটা বোঝা যায় যে পৃথিবীর বিভিন্ন সভ্যতায় মানুষ তার বলবার কথাগুলোকে উত্তরকালের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য কোনো না কোনো ভাবে লিখে রাখতে চেয়েছিল। তাই তার উপযুক্ত পদ্ধতির আবিষ্কারে মনোনিবেশ করেছিল। মাটির পাত্র, মোমের টুকরো এবং অবশ্যই পাথরে খোদাই করে আমাদের পূর্বপুরুষেরা সেই প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছিলেন। গাছের ছাল বা ভূর্জপত্রে বিভিন্ন লিপিতে লেখা শুরু করেছিলেন আমাদের পূর্বপুরুষেরা, কাগজ আবিষ্কার হয়েছিল চিনদেশে, প্রাচীন রোমের মৃৎশিল্পীরা ছাপ বসানো বা খোদাইয়ের জন্য এক-একটি অক্ষর বা চিহ্ন-সমন্বিত ছাঁচ তৈরি করেছিলেন (সূত্র- On the making of Printed Books. P-8) কোরিয়ান মানুষেরা ১৩৭৭ খ্রিস্টাব্দে যন্ত্রের সাহায্য ছাড়াই হাতে ছাপিয়েছিলেন বুদ্ধের বাণী সম্বলিত গ্রন্থ 'Jikji'

(সূত্র- এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা) আর যন্ত্রে ছাপার কাজ শুরু হয়েছিল ইউরোপে। পঞ্চদশ শতকে জার্মানিতে একদিন সম্ভব হয়ে উঠল ছাপাযন্ত্র, যার উদ্ভাবক ছিলেন গুটেনবার্গ। তিনি ১৩৫৬ খ্রিস্টাব্দে কাগজে ছাপানোর জন্য সিলিন্ডারের সাহায্যে 'মুভেবল টাইপ' প্রক্রিয়ার উদ্ভাবন করেন। এরপর লেখার অক্ষরগুলোকে ছাপার আকারে প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই তাকে নির্ভুলভাবে উপস্থাপন করার তাগিদও দেখা দিল লেখক-মনে।

প্রশ্ন জাগতে পারে, নির্ভুল ভাবে প্রকাশের তাগিদ কি ছাপাখানার কাজ শুরু হওয়ার আগে তৈরি হয়নি? নিশ্চয়ই হয়েছিল। ভারতীয় সংস্কৃতিতে গ্রন্থকে আচার্যের সমতুল্য ভাবা হতো, সুতরাং লেখনে যাতে ত্রুটি না থাকে সেদিকেও নিশ্চয়ই লক্ষ ছিল। তাই বোধহয় রাজশেখর তাঁর 'কাব্যমীমাংসা' গ্রন্থে লিখেছিলেন, 'ত্রুটিকবহিরাজশ্চ প্রবন্ধোচ্ছেদহেতব'। অর্থাৎ, ত্রুটিরূপ আগুনই হলো সন্দর্ভ বিনাশের হেতু। এখানে 'সন্দর্ভ' বলতে যেকোনো ধরনের প্রকাশযোগ্য লেখাকে, এমনকী হাতে লেখা পাণ্ডুলিপিকেও বোঝানো যেতে পারে। রচনার সর্বপ্রকার ত্রুটি সংশোধন করে তাকে প্রকাশযোগ্য করে তোলার ওপর প্রাচীন ভারতীয় আলঙ্কারিকেরাও মনোনিবেশ করেছিলেন নিশ্চয়ই। আর সেই পথ ধরেই ভারতবর্ষে 'ত্রুটি সংশোধন' বিষয়টি লেখন-ঐতিহ্যের অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে। পাশ্চাত্যের যন্ত্র-বিপ্লব সেই কাজটিকে শৃঙ্খলাবন্ধ করে তুলেছে। আমরা তাই গ্রন্থাকারে প্রকাশের আগে ছাপাখানায় নির্দিষ্ট মাপবিশিষ্ট কাগজে তোলা যেকোনো পাণ্ডুলিপির প্রাথমিক সংরক্ষিত ছাপ বা মুদ্রিত রূপটিকে 'প্রুফ' বলি এবং এই প্রুফের অন্তর্গত বিভিন্ন ত্রুটি যিনি সংশোধন করার দায়িত্বে থাকেন তাকে বলি 'প্রুফরিডার'। পাশ্চাত্য প্রকাশনার জগতে এর পাশাপাশি সম্পাদনা সমিতির সদস্য হিসাবে আরও একজন পেশাদার ব্যক্তির সহায়তা নেওয়া হয়- তিনি পাণ্ডুলিপি সংশোধক বা 'কপি এডিটর'। এঁদের দুজনের কাজই হলো প্রকাশনার মান উন্নত করে তাকে সম্পূর্ণ নির্ভুল রূপে প্রকাশ করা।

১৩.৩ প্রুফ সংশোধন আসলে কী ও কেন?

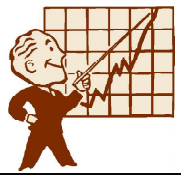
প্রুফ সংশোধনের ইংরাজি প্রতিশব্দ হল 'প্রুফ রিডিং'—যার আক্ষরিক অর্থ হল ছাপার ভুল সংশোধনের জন্য প্রক্রিয়া। কোনো লেখা প্রকাশের আগে হাতে লিখে বা টাইপ করে যা প্রস্তুত করা হয় তাকে পাণ্ডুলিপি বলা হয়। একটি পাণ্ডুলিপি থেকে যখন প্রুফ তৈরি হয় তখন সেখানে অনেকরকম ত্রুটি থাকতে পারে। সেগুলো যেমন লেখকের দিক থেকে হতে পারে তেমনি আবার অপারেটর/কম্পোজিটরের দিক থেকেও হতে পারে। আবার প্রথম বা দ্বিতীয় প্রুফ তৈরির পর যে কম্প্যুটারে টাইপ করা হচ্ছে তার যান্ত্রিক বিচ্যুতি ঘটলেও কখনও প্রুফে ভুল থেকে যেতে পারে। লেখার সময় অসাবধানে লেখক একই বানানের শুদ্ধ-অশুদ্ধ বা পুরনো-আধুনিক রূপ ব্যবহার করতে পারেন, বিরাম চিহ্ন সহ অন্যান্য চিহ্নের প্রয়োগে তাঁর ভুল হতে পারে। আবার কখনও অজ্ঞতাবশত সমার্থক শব্দ, প্রবাদ-প্রবচন-

বাগ্‌ধারা, অনুচ্ছেদ ইত্যাদির উপযুক্ত ব্যবহারে তিনি যথাযথ নাও হতে পারেন। এই ধরনের ত্রুটিগুলো পাণ্ডুলিপি পর্যায়েই হয় এবং একজন অপারেটর বা কম্পোজিটর এই ভুলগুলো শুদ্ধ না করলে প্রুফ-সংশোধকের দায়িত্ব বাড়ে। পাণ্ডুলিপি থেকে 'কপি' তৈরির সময় বর্ণ সংস্থাপনে কম্পোজিটর বা অপারেটর ভুল করতে পারেন। এই ধরনের ভুলগুলোর মধ্যে আছে মাত্রা ও অক্ষরের স্থান বিপর্যাস, অপ্রয়োজনীয় ফাঁক দেওয়া বা ফাঁক না দেওয়া, ভুল অক্ষর টাইপ করা, অতিরিক্ত অক্ষর সংযোজন, একই শব্দ বা বাক্যাংশ একাধিকবার টাইপ করা ইত্যাদি। লেটারপ্রেসের যুগে গ্যালি-ট্রেতে যান্ত্রিক গোলযোগ হলেও প্রুফে ত্রুটি দেখা যেত। যেমন অক্ষর ভেঙে যাওয়া, অক্ষর ওপরে উঠে যাওয়া বা নিচে নেমে আসা, অক্ষর উল্টে বসা, লাইন অর্থাৎ পঙক্তি আঁকাবাঁকা হয়ে যাওয়া ইত্যাদি। এইসব ত্রুটিই সংশোধনই মূলত প্রুফ সংশোধন।

যাই হোক, যে-কোনো মুদ্রিত রচনা (যেমন— দৈনিক পত্রিকা, সাময়িক পত্র-পত্রিকা, পুথি, আইনের বই, পঞ্জিকা, অভিধান, গল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা ইত্যাদির বই, লিফলেট, ক্যালেন্ডার, ডায়েরি ইত্যাদি আরও অনেক কিছু) প্রকাশের আগে ছাপাখানায় পাতার নির্দিষ্ট মাপে গ্যালি-ট্রে তৈরি করে বা আধুনিক যুগে কম্পিউটারে টাইপ করে ছাপিয়ে (কপি প্রিন্ট) নিতে হয়। প্রেসের কম্পোজিটর হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি দেখে সিসার অক্ষর এক একটা 'স্টিক'-এ বসিয়ে ট্রে-তে পঙক্তি সাজান এবং একটি পাতায় পরপর 'স্টিক' বসিয়ে অনুচ্ছেদ তৈরির কাজটি শেষ হবার পর মেশিনের সাহায্যে বিশেষ দৈর্ঘ্য-প্রস্থ বিশিষ্ট কাগজে ছাপ তোলেন। ফটোটাইপের যুগে স্টিকে অক্ষর বসানোর বদলে ক্যামেরার সাহায্যে বিভিন্ন মাপের অক্ষর সমন্বিত ফিল্ম একটি চাকতি বা ডিস্ক মেশিনে বসিয়ে সেখান থেকে সরাসরি কাগজে এই ছাপ তোলার ব্যবস্থা হয়েছিল। বলা যায় বর্তমানের ডেস্ক টপ পাবলিশিং এবং লেটার প্রেসের মধ্যে সেতুবন্ধন করেছিল ফটোটাইপ প্রিন্টিং ব্যবস্থা। লেটারপ্রেসে ব্যবহৃত স্টিকে অক্ষর সাজাতেন 'কম্পোজিটর'। ফটোটাইপ যন্ত্রে তিনি কম্পোজিটরের চেয়ে 'অপারেটর' হয়ে উঠতে শুরু করলেন। বর্তমানে অক্ষর 'বসানো' নয় 'সাজানো'র কাজই করতে হয় একজন কম্পোজিটরকে। তাই আজকের ডিটিপি পদ্ধতিতে প্রকাশনার জগতে কাজটি অপারেটরের। তাঁকে অক্ষর বসানোর কাজটা করতে হয় উন্নত প্রযুক্তির ফটো-টাইপ সেটিং যন্ত্র অর্থাৎ কম্প্যুটারের পর্দায়। কী-বোর্ডের সাহায্যে একটি নতুন বা আগে ব্যবহৃত doc file-এর পর্দায় (স্ক্রিন) তিনি অক্ষর সংযোজনের কাজটি করেন। অক্ষর সংযোজনের আগে তিনি পাতার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ, মার্জিনের পরিমাপ, অক্ষরের প্রকৃতি ও দৈর্ঘ্য, দুটো পঙ্‌ক্তির মধ্যবর্তী ফাঁক ইত্যাদি ঠিক করে নেন। অপারেটরের সেই নির্দেশনা মেনে পঙ্‌ক্তি ও অনুচ্ছেদের দৈর্ঘ্যপ্রস্থ যান্ত্রিক ভাবে কম্প্যুটার নির্ধারণ করে। এরপর অপারেটর একটি পাতার কাজ শেষ হলে কম্পোজিটরের মতোই ছাপ তোলেন অর্থাৎ প্রিন্টার থেকে একটি 'কপি' বা 'প্রিন্ট আউট' বার করে নেন। এই ছাপ তোলা কাগজটিকেই প্রুফ বলা হয়। এটি পাণ্ডুলিপির মুদ্রিত প্রতিলিপি। শুধু প্রুফ তৈরি করলেই ছাপার কাজ শেষ হয়ে যায় না। কম্পোজিটর

সিসার অক্ষর বসিয়ে লাইন তৈরির সময় লেখকের পাণ্ডুলিপিটিকে হুবহু অনুসরণ করেছেন কিনা তা পাণ্ডুলিপিটির সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হয়। তখন যদি দেখা যায় কম্পোজিটর পাণ্ডুলিপির কিছু অংশ বাদ দিয়েছেন, কিংবা বানানে ভুল করেছেন অথবা হস্তাক্ষর না বুঝতে পেরে অন্য শব্দ কম্পোজ করেছেন তখন ওই সব ত্রুটি সংশোধন করাই প্রুফ-সংশোধনের কাজ। যিনি এই কাজটি করেন তাঁকে প্রুফরিডার বলে। যদিও Proof'-এর বাংলা প্রতিশব্দ 'মুদ্রণিকা', (অর্থাৎ যে মুদ্রিত প্রতিলিপি থেকে মূল মুদ্রণের উপকরণ তৈরি হয়) তবু 'প্রুফ' শব্দটি ছাপাখানার জগতে প্রচলিত হয়ে গেছে। এখন বাংলায় প্রুফ-সংশোধন বলতে মুদ্রণিকা সংশোধন বলা যেতে পারে।

ভারতবর্ষের প্রকাশনা জগতে সংশোধন নিয়ে একটি সাধারণ ধারণা প্রচলিত। সেটা এই যে, পাঠ সংশোধন ব্যাপারটি অনেকটা লেখকের এবং কিছুটা প্রধান সম্পাদক বা প্রকাশকের দায়িত্ব। কিন্তু মনে রাখতে হবে, লেখক নন, প্রুফ বা মুদ্রণিকা সংশোধন ছাপাখানার অভিজ্ঞ সংশোধকেরাই করে থাকেন। তবে এই অভিজ্ঞতা অর্জিত। বাংলা প্রকাশনার জগতে প্রুফ সংশোধকেরা সবাই স্বশিক্ষিত। অভিজ্ঞতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা এই ক্ষেত্রে এক একজন দক্ষ সংশোধক হয়ে ওঠেন। কোনো প্রথাগত বিদ্যায়তনিক শিক্ষা লাভ করে তাঁরা পেশাদারিত্ব অর্জন করেন না। আর হাতে গোনা কয়েকটি প্রকাশন সংস্থাকে বাদ দিলে, পেশাদার পাণ্ডুলিপি সংশোধকের ধারণাটা এখনও বাংলা প্রকাশনার জগতে যথাযথভাবে গড়ে ওঠেনি, মফস্বল বা ছোটো শহরগুলোতে তো একেবারেই নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দায়িত্বটা অভিজ্ঞ সম্পাদক নিজেই সামলে নেন। ২০১৯ এ ইউ.জি.সি সারা দেশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অধীন মহাবিদ্যালয়ে পরিবর্তিত শিক্ষানীতি চালু করার আগে স্নাতক স্তরে প্রকাশন ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত এই ধরনের পাঠক্রমের কথা ভাবা হয়নি। তাছাড়া ছাপা মাধ্যমকে ছাড়িয়ে ওয়েব দুনিয়ায় এখন জার্নাল, ম্যাগাজিন বা বই প্রকাশের জোয়ার এলেও 'কপি এডিটর' ও 'প্রুফ রিডার' অর্থাৎ পাণ্ডুলিপি ও প্রুফ (মুদ্রণিকা) সংশোধকের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়নি। পাশ্চাত্য জগতে তো বটেই, ভারতবর্ষেও এই দুটি কাজ এখন 'অনলাইন'-এ হচ্ছে। কিন্তু আমেরিকান স্টাইল ম্যানুয়াল বা শৈলী নির্দেশিকার মতো এমন কোনো সর্বজনমান্য নির্দেশিকা বাংলায় এখনও গৃহীত হয়নি, যেখানে শুধু গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ-নিবন্ধের উৎস উল্লেখ প্রক্রিয়া নয়, বিরাম সহ অন্যান্য চিহ্ন, শব্দ-বাক্য ইত্যাদির ব্যবহার বিধি সম্পর্কে মান্য নীতি নথিবদ্ধ আছে। কিন্তু সুষ্ঠু প্রকাশনার জন্য (ছাপা বা ওয়েব) এই ধরনের নীতি আর পেশাদার পাণ্ডুলিপি ও প্রুফ সংশোধক থাকাটা অত্যন্ত জরুরি। পাশ্চাত্য প্রকাশনার জগতে কখনও কখনও পাণ্ডুলিপি সংশোধক আর প্রুফ সংশোধকের কাজকে সমধর্মী বলে মনে করা হয়। দুজনের কাজের পরিসর ও ব্যাপ্তি আলাদা হলেও কখনও কখনও একে অপরের বৃত্তে ঢুকে পড়েন। তবু দুজনেই পেশাদার এবং দুজনকেই প্রায়োগিক বিদ্যায় পারদর্শী হতে হয়। তাছাড়া দুজনেই মূল সম্পাদনা সমিতির গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার।



অগ্রগতির নির্ধারক প্রশ্ন

১। প্রুফ সংশোধন কেন করা হয় সে বিষয়ে আলোকপাত করুন। (২০০ শব্দের মধ্যে)

১৩.৪ প্রুফ সংশোধরে বিভিন্ন পুস্তিকা

'প্রুফ রিডিং' বা 'কপি এডিটিং' নিয়ে বহু বই, যেখানে প্রুফ সংশোধন বা মুদ্রণিকা সংশোধনের রীতিনীতির উল্লেখ থাকে, যা এখন পাওয়া যায়। যেমন, 'Oxford Dictionary for Writers', 'MacGraw-Hill's Proofreading Handbook (Laura Anderson), 'Copyediting and Proofreading for Dummies' (Suzanne Gilad), 'Proofreading & Grammar Drills Workbook' (Ashan Hamp-ton), 'One Word, Two Words, Hyphenated (Mary Louise Gilman), Merrium-Webstar Dictionary। ১৮৫৮ সালের ১২ই জুলাই প্রুফ সংশোধনের জন্য একটি সর্বজন মান্য রীতি প্রচলনের উদ্দেশ্যে নিউ দিল্লি স্থিত 'ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডস ইন্সটিটিউট' (যার বর্তমান নাম Bureau of Indian Standards) অনেক আলোচনা এবং বিতর্কের পর, 'Proof Corrections for Printers and Authors' শিরোনামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ২০০৩ সালেও তার পুনর্নবীকরণ করা হয়েছে। এই নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে আজও প্রকাশক, মুদ্রক, লেখকরা প্রুফ সংশোধন করে থাকেন। মূলত ১৯৪৫ সালে British Standard Institute কর্তৃক প্রকাশিত 'Printers' And Authors' Proof Corrections', ১৯৫২ সালে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত S.R.Ranganathanএর 'Social Bibliography Or Physical Bibliography For Librarians' এবং ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত 'Proof Correction Signs For Manuscripts of Type Written Texts' (Institute Belge de Normalisation)-এই তিনটি গ্রন্থ অবলম্বন করে প্রুফ সংশোধনের উপর্যুক্ত মানক পুস্তিকাটি তৈরি করা হয়। শুধু ইংরেজি নয়, বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার প্রুফ (মুদ্রণিকা) সংশোধনের জন্যও এই পুস্তিকাটিতে বিভিন্ন রীতি-নিয়ম সংযোজিত হয়েছিল। অবশ্য নিজেদের প্রয়োজনে মুদ্রণ পদ্ধতির বদল ঘটলেও প্রুফ সংশোধনের চিহ্নের বিশেষ কিছু পরিবর্তন কিন্তু হয়নি।

১৩.৫ বাংলা প্রুফ সংশোধনের ইতিবৃত্ত

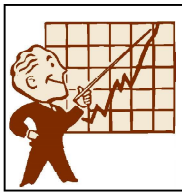
বাংলা হরফ মুদ্রণের পর সেই মুদ্রিত অংশটির সংশোধন একটি বড় কাজ ছিল সেই সময়ও। এখন যাকে ইংরাজিতে 'প্রুফ' সংশোধন করা বলে মুদ্রণ শিল্পের আদিযুগেও এই কাজ যথেষ্ট সতর্কতার সাথেই করতে হত। কিন্তু সংশোধিত কপিগুলির কোনো দৃষ্টান্ত

কোনোভাবেই সংরক্ষণ করা যায়নি। তবে বানান সংশোধনের উপর যে যথেষ্ট গুরুত্ব সেই সময়ও দেওয়া হত তার প্রমাণ ছড়িয়ে রয়েছে অগ্নিকাণ্ডে শ্রীরামপুর প্রেসে ঘটে যাওয়া নানা ক্ষয়ক্ষতির বিবরণে। ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তির পরিমাণ নির্ণয় করতে গিয়ে প্রচুর হরফ, মূল্যবান পাণ্ডুলিপি, ছাপার কলের সঙ্গে সঙ্গে প্রুফরিডারদের বসবার ঘরের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও দেখানো হয়েছে। বানানের ব্যাপারে কেরীসাহেব ও শ্রীরামপুরের মিশনারীরা মূলত নির্ভর করতেন নিজেদের সংস্কৃত জ্ঞান এবং তার চেয়েও বেশি দেশীয় পণ্ডিতদের সংস্কৃত জ্ঞানের উপর। অত্যন্ত সহজেই তারা বুঝেছিলেন ছাপার প্রয়োজনেই বানানগত সমতা বজায় রাখা প্রয়োজন। এই প্রয়োজন থেকেই বানানের সমতার উৎসস্বরূপ অভিধানের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতে থাকে তখন থেকেই। পাঠ্যপুস্তকের বানান যে একই নিয়মে নির্ণীত হবে এবং ছাপার ফলে বহু মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে বানানের সেই সমতাবিধান-একথা সেই সূচনা দিনে দাঁড়িয়েই বুঝেছিলেন তাঁরা। গিলক্রিস্ট বাঙালি ছাপাখানার কর্মীদের বলেছিলেন 'অ্যা পোসে অব ব্ল্যাক আনপ্রিন্সিপল্ড নেভস'। যার অর্থ ব্যবহারে তাঁরা চিরকালের বিশ্বাসঘাতক। পাণ্ডুলিপি ভুলভাবে কম্পোজ করা, অশুদ্ধ প্রুফ সংশোধন করে পাঠালেও আরো বেশি ভুলভাবে ছাপিয়ে দেওয়ার মতো বহু অভিযোগই তখনকার ছাপাখানার কর্মীদের সম্পর্কে ছিল। কিন্তু ভাষার বিন্যাস রীতিটিই যে যুগে হাজারো পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে চলেছে, হরফের বিন্যাসরীতি, অক্ষর ডালার নিয়ন্ত্রিত সজ্জা যে যুগে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠেনি, সেইযুগে কর্মচারীদের প্রতি ওঠা অভিযোগের সত্যতা নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন থেকেই যায়।

বাংলা গদ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশনা জগৎ, মুদ্রণ শিল্পেরও অভাবনীয় উন্নতি ঘটেছে। হাতে সাজানো লেটার প্রেসের যুগ চলে গেছে। পরিবর্তে এসেছে কম্পিউটার। কম্পিউটার বিভিন্ন সফট্ওয়্যার ব্যবহারের মাধ্যমে D.T.P মুদ্রণের জগতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। লেখকের পাণ্ডুলিপি দেখে প্রথমে কম্পোজিটর কম্পিউটারে বিভিন্ন সফট্ওয়্যারের মাধ্যমে কম্পোজ করেন। ফটো টাইপ সেটিং-এর যন্ত্র প্রচলিত হওয়ায় খুব তাড়াতাড়ি মুদ্রণের কাজটি সম্পন্ন হচ্ছে। কাজেই বানান সংশোধনের কাজটিও খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বেশ কম সময়ের মধ্যে প্রুফরিডারকে নিখুঁত ভাবে বানান সংশোধন করতে হয়। সংশোধিত বানান সম্পর্কে কম্পোজিটরকে যথাযথ নির্দেশ দিতে হয় প্রুফরিডারকে। কাজেই নির্ভুল গ্রন্থ মুদ্রণের জন্য প্রুফরিডারকে অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণভাবে কাজ করতে হয়। 'প্রুফরিডার' শব্দটি থেকেই 'প্রুফরিডিং'-এর কাজের একটা ধারণা পাওয়া যায়। এর অর্থ মুদ্রণগত বিভিন্ন ত্রুটি-বিচ্যুতির সংশোধনীকরণ। কম্পোজিটর যথাযথভাবে লেখকের মূল পাণ্ডুলিপি অনুসরণ করেছেন কিনা সেটি দেখাও প্রুফরিডারের অন্যতম দায়িত্ব।

বানান সংশোধনের জন্য প্রথমেই প্রুফরিডারকে লেখকের মূল পাণ্ডুলিপিটি ভালো করে পড়ে নিতে হয়। এরপর যেখানে যেখানে ভুল রয়েছে সেই ভুলগুলির সংশোধিত রূপে কম্পোজ করা ম্যাটারের ডানদিক ও বাঁদিকে ক্রমানুসারে বসাতে হয়। প্রত্যেক লাইনের দুপাশের ফাঁকা জায়গায় সংশোধনগুলি থাকবে। কম্পোজ করা ম্যাটারের ভুল ধরবার জন্য

প্রুফরিডার-এর চোখ ও মনের দৃষ্টি অত্যন্ত শানিত হওয়া প্রয়োজন। তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তি ও বানান সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা না থাকলে প্রুফরিডারের কাজ করা যায় না। বর্তমানে বাংলা বানানের বেশ কিছু অদল-বদল ঘটেছে। প্রচলিত বাংলা বানানবিধি মান্য করেই প্রুফ-রিডারকে সংশোধন করতে হয়। তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তি, বানানের স্বচ্ছ ধারণা ছাড়াও একজন প্রুফরিডারের পরিশীলিত রুচি ও সৌন্দর্যবোধ থাকা দরকার। সঠিকভাবে কম্পোজ-করা ম্যাটারকে বই-এর বিভাগ, বিষয় ও চরিত্র অনুযায়ী সাজানোও প্রুফরিডারের অন্যতম দায়িত্ব। অক্ষরের মাপ কোথায় বড়ো, কোথায় ছোটো, কোথায় বাঁকা হবে-এ বিষয়েও প্রুফ-রিডারকে নজর রাখতে হয়। গ্রন্থ মুদ্রণ নির্ভুল করবার জন্য সাধারণত তিনবার ভুল সংশোধন করতে হয় প্রুফরিডারকে। বিষয়ের বৈচিত্র্য, সৌন্দর্য প্রভৃতি রক্ষার জন্য বিভিন্ন ধরনের অক্ষর ব্যবহার করেন কম্পোজিটর। সেগুলি সঠিক হয়েছে কিনা সেটি দেখে নেওয়াও প্রুফরিডারের দায়িত্ব। আধুনিক ব্যবস্থায় কম্পোজিটরকে নির্ভুলভাবে গ্রন্থ মুদ্রণে সহায়তা করার জন্য প্রুফ সংশোধনের বিভিন্ন প্রতীক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। মূলত ৭৫টি প্রতীক চিহ্ন আছে। এর মধ্যে সাধারণ চিহ্ন ১২টি, যতিচিহ্ন ২৫টি, স্থান কমানো-বাড়ানোর চিহ্ন ১২টি, সমতার চিহ্ন ১৬টি, এবং হরফ সম্পর্কিত চিহ্ন ১০টি। এইসব চিহ্ন, প্রতীক, অক্ষরবিন্যাস সম্পর্কে প্রুফরিডারের নির্ভুল ধারণা ও দক্ষতা থাকা প্রয়োজন।



অগ্রগতির নির্ধারক প্রশ্ন

৩। বাংলার প্রুফ সংশোধনের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করুন। (২০০ শব্দের মধ্যে)

১৩.৬ অধ্যায় সংক্ষেপ

প্রকাশই সাহিত্য— আর যাকে আমরা 'সাহিত্য' বলি, তাকে প্রকাশযোগ্য করে তোলার পেছনে লেখক ছাড়াও একজন সম্পাদক ও প্রুফ-সংশোধকদের ভূমিকা অন্যতম। মূলত একটি লেখা ত্রুটিহীন করে তুলতে প্রুফ সংশোধকরাই প্রাক্ স্মরণীয়। লেখক তাঁর লেখার সম্পূর্ণ রূপ দানের পর লেখাটি যখন টাইপ হয়ে আসে তখন তিনি প্রুফ সংশোধকের দ্বারা অনুচ্ছেদ ও বাক্য দেখার পাশাপাশি বানান, ভুল টাইপিং ইত্যাদি সামগ্রিক খোলনচে পরীক্ষা করে দেখেন। পরবর্তীতে প্রুফ পরীক্ষকের সবুজ সংকেত পেলেই লেখাটির গ্রন্থরূপ বাস্তবায়িত হয়ে ওঠে।



১৩.৭ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

- অধ্যায়টি পাঠ করে প্রুফ-সংশোধন যে একটি মুদ্রিত লেখার প্রাণ স্বরূপ সে বিষয়ে অবগত হওয়া সম্ভব হল।

- প্রুফ সংশোধনের আদি ইতিহাস যে মধ্যযুগেই প্রচ্ছন্ন ছিল সে সম্পর্কে অবগত হয়ে আধুনিক কাল পর্যন্ত প্রুফ সংশোধনের বিস্তৃত ইতিহাস জানা সম্ভব হল।

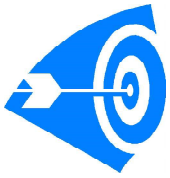


১৩.৮ অতিরিক্ত পঠন

ইসলাম, শেখ মকবুল (২০১২); গবেষণার পদ্ধতি বিজ্ঞান সাহিত্য-সমাজ-সংস্কৃতি; কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ

বন্দ্যোপাধ্যায়, অপরাজিতা (বাংলা ১৩২২); প্রুফ সংশোধনের প্রথম পাথ; কলকাতা : প্রজ্ঞা বিকাশ

সেনগুপ্ত, জ্যোতির্ময় (২০২৩); পাণ্ডুলিপি থেকে প্রুফ সংশোধন; কলকাতা : সপ্তর্ষি প্রকাশন



১৩.৯ অগ্রগতির নির্ধারক উত্তর-সংকেত

১। নং প্রশ্নের উত্তর : প্রুফ সংশোধনের ইংরাজি প্রতিশব্দ হল 'প্রুফ রিডিং'-যার আক্ষরিক অর্থ হল ছাপার ভুল সংশোধনের জন্য প্রক্রিয়া। .....একজন অপারেটর বা কম্পোজিটর এই ভুলগুলো শুদ্ধ না করলে প্রুফ-সংশোধকের দায়িত্ব বাড়ে। .....এখন বাংলায় প্রুফ-সংশোধন বলতে মুদ্রণিকা সংশোধন বলা যেতে পারে। এভাবে লিখে উত্তর শেষ করতে হবে।

২। নং প্রশ্নের উত্তর : বাংলা হরফ মুদ্রণের পর সেই মুদ্রিত অংশটির সংশোধন একটি বড় কাজ ছিল সেই সময়ও.....বাংলা গদ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশনা জগৎ, মুদ্রণ শিল্পেরও অভাবনীয় উন্নতি ঘটেছে। হাতে সাজানো লেটার প্রেসের যুগ চলে গেছে বদলে এসেছে কম্পিউটার.....এই আলোচনা আরও এগিয়ে নিয়ে গিয়ে বাংলা প্রুফ সংশোধনের ইতিবৃত্ত লিখতে হবে।



১৩.১০ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। প্রুফ সংশোধন কাকে বলে এবং এর প্রয়োজনীয়তা লিখুন।
২। প্রুফ সংশোধনের ইতিহাস বিবৃত করুন।
৩। বাংলা প্রুফ সংশোধনের ইতিবৃত্ত তুলে ধরুন।
৪। আদর্শ প্রুফ সংশোধন বলতে কি বোঝানো হয় সে সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ আলোচনা প্রস্তুত করুন।
৫। ভারতে প্রুফ সংশোধনের ধারণা সম্পর্কে লিখুন।

অধ্যায় ১৪ : প্রুফ সংশোধন-২

বিন্যাস ক্রম

১৪.১ জ্ঞাতব্য বিষয়
১৪.২ পরিচিতি
১৪.৩ পাণ্ডুলিপি পরিচয়
১৪.৩.১ পাণ্ডুলিপি লেখকের কিছু আবশ্যিক শর্ত
১৪.৩.২ পাণ্ডুলিপির বিন্যাস
১৪.৪ প্রুফ সংশোধকের যোগ্যতা
১৪.৫ প্রুফ সংশোধন প্রক্রিয়া
১৪.৬ প্রুফ সংশোধনের বিভিন্ন সংকেত ও তাদের প্রয়োগ
১৪.৭ অধ্যায় সংক্ষেপ
১৪.৮ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম
১৪.৯ অতিরিক্ত পঠন
১৪.১০ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত
১৪.১১ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১৪.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই অধ্যায় পাঠ করে শিক্ষার্থী—

- প্রুফ সংশোধন বিষয়ে জানতে পারবেন।
- প্রুফ সংশোধন করার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে অবগত হবেন।
- প্রুফ সংশোধনের ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা গড়ে তুলতে পারবেন।

১৪.২ পরিচিতি

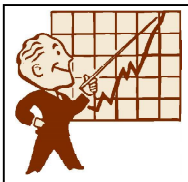
প্রুফ সংশোধন যেকোনো গ্রন্থ বা লেখা প্রকাশিত রূপে আসার জন্য গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। একটি সার্থক পাণ্ডুলিপিকে দায়িত্ব সহকারে সফল প্রকাশিত রূপ দিতে প্রুফ সংশোধনের দায়িত্ব অনন্য। আমরা জানি প্রকাশনার জগত বুদ্ধিবৃত্তিজাত মানুষের বিশেষ সম্পদ। সেই সম্পদকে সুষ্ঠুরূপে আত্মপ্রকাশের যোগ্য করে তোলেন একজন অভিজ্ঞ প্রুফ রিডার বা প্রুফ সংশোধক। সে হিসাবে প্রুফ সংশোধন হল প্রকাশন শিল্পের অলংকার স্বরূপ। একজন নারী যেমন অলংকারের সজ্জায় সুন্দর হয়ে ওঠেন ঠিক তেমনি প্রুফ সংশোধনের সফল হাতের ছোঁয়ায় একটি লেখাও বিশেষভাবে সুসজ্জিত হয়ে ওঠে।

১৪.৩ পাণ্ডুলিপি পরিচয়

সাধারণত, ইংরেজি 'ম্যানাসক্রিপ্ট' শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে 'পাণ্ডুলিপি' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। সম্ভবত ১৫৭৯ খ্রিস্টাব্দে, লাতিন 'মানুস্ক্রিপ্টাস্' (হাত দিয়ে লেখার) (লাতিন 'মানু' ('হাত') + স্ক্রিপ্টাস্ ('লেখার জন্য') থেকে শব্দটির উদ্ভব। লাতিন শব্দটিও সম্ভবত পঞ্চদশ শতকে (১৪৫০ খ্রি.) প্রচলিত জার্মান (মিডল হাই জার্মান) শব্দ 'hants chrift' (হ্যান্তস্ক্রিপ্ত) বা 'hantegeschrift' (হান্তেজেস্ক্রিপ্ত) শব্দ অথবা প্রাচীন 'নর্স' (Norse) শব্দ 'handrit' (হ্যান্ডরিট) থেকে গড়ে উঠেছে (১৪০০ খ্রিষ্টাব্দ)। পাশ্চাত্যের ধারণা অনুযায়ী 'ম্যানাসক্রিপ্ট' হলো হাতে লেখা যে কোনো ধরনের গ্রন্থ বা রচনা। এই ধরনের লেখার ডিজিটাল প্রতিলিপি হলো আজকের 'কপি'। এই 'কপি'র যে প্রাথমিক হাতে লেখা রচনা, সেটাকে এখন বলে খসড়া। মধ্যযুগ থেকেই মূলত গ্রন্থ, দলিল, চুক্তিপত্র ইত্যাদিকে পাণ্ডুলিপি নামে অভিহিত করা হতো। অর্থাৎ এগুলো কোনো খসড়া রচনা ছিল না। ভারতবর্ষেও হাতে লেখা গ্রন্থাদির পরিচয় ছিল 'পুথি' হিসাবে, লিখতেন লিপিকরেরা আর এই পুথিগুলোর প্রচুর 'নকল' বা অনুলিপি তৈরি করা হতো যুগে যুগে, স্থানে স্থানে। গুরুত্ব ও চাহিদা অনুযায়ী একাধিক অনুলিপি করা হতো। যে উপাদানে পুথি লেখা হতো তার বর্ণ হতো সাধারণত পাণ্ডু বা ধূসর। কাগজ আবিষ্কারের আগে পুথি-লেখার উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হতো চামড়া, ভূর্জপত্র, তেরেটপত্র, গাছের বাকল, কলাপাতা, তালপাতা ইত্যাদি প্রাকৃতিক উপাদান। এগুলিকে জলে ভিজিয়ে, সেদ্ধ করে এবং রোদে শুকিয়ে লেখার উপযোগী করে তোলা হতো। ফলে এর বর্ণ হতো পাণ্ডু বা ধূসর এবং এতে সহজে পোকা ধরত না। পাণ্ডু বর্ণের পত্রে লিপিকর বা অনুলিপিকরেরা লিখতেন বলে লিপি সমন্বিত পত্রের নাম হয়েছে পাণ্ডুলিপি। এখন অবশ্য, প্রাচ্য বা পাশ্চাত্যে, মুদ্রণের পূর্বে যেকোনো রচনার খসড়াকেই পাণ্ডুলিপি বলে। পাণ্ডুলিপি বলতে সেই কাজকে বোঝায়, যা কোনো লেখক তাঁর অপ্রকাশিত সম্পূর্ণ খসড়া লেখাটিকে কোনো প্রকাশক বা প্রকাশনা সংস্থার সম্পাদকের কাছে প্রকাশের জন্য জমা দেন। সেই খসড়াটি হাতে লেখা তো হতেই পারে; কিন্তু আধুনিক সুযোগ সুবিধার কথা মাথায় রেখে বলা যায়, গ্রন্থাকারে প্রকাশের জন্য লেখক তাঁর রচনার যে মুদ্রিত এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিলিপিটি প্রকাশকের হাতে তুলে দেন সেটাই পাণ্ডুলিপি।

তাহলে পাণ্ডুলিপি হলো লেখকের দিক থেকে চূড়ান্ত প্রাক্‌প্রকাশ খসড়া রচনা। পাণ্ডুলিপি তিন ধরনের হতে পারে হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি, টাইপ করা 'কপি' এবং 'word processed' পাণ্ডুলিপি। শেষেরটি বাঁধানো বইতে যেরকম দেখা যায় ঠিক সেরকমই কম্প্যুটারের পর্দাতে ফুটে ওঠা পাণ্ডুলিপি, যেখানে পৃষ্ঠা সংখ্যা দেওয়া থাকবে এবং পাতার লে-আউটও দেখা যাবে। পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতিতে লেখকের ভূমিকা প্রকাশনার জন্য পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতকরণের প্রাথমিক পর্যায়ে লেখকের কিছু মৌলিক কাজ রয়েছে। শুধু মূল লেখাটি (কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক ইত্যাদি) বা প্রকাশযোগ্য বিষয়ের খসড়া 'টেক্সট'

লিখলেই লেখকের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। সেই খসড়া পাণ্ডুলিপি প্রকাশকের কাছে জমা দেওয়ার আগে যেমন লেখকের প্রস্তুতি রয়েছে তেমনি পাণ্ডুলিপি জমা দেওয়ার রয়েছে নিয়ম-পদ্ধতি।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

১। পাণ্ডুলিপির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন। (১০০ শব্দের মধ্যে)

১৪.৩.১ পাণ্ডুলিপি লেখকের কিছু আবশ্যিক শর্ত :

পাণ্ডুলিপির ক্ষেত্রে প্রথমেই আসে লেখকের প্রস্তুতির কথা। বিশেষ করে সৃজনশীল যাঁরা হতে চান বা ভাবেন লেখক হিসাবে প্রতিষ্ঠা বা খ্যাতি লাভ করবেন, অথবা নিছক মনের ভাব প্রকাশ করার তাগিদ অনুভব করবেন, তাঁদের কয়েকটি আবশ্যিক শর্ত পালন করতে হবে। যেমন—

ক) প্রচুর বই পড়া এবং বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়া (কবি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে চাইলে কবিতার বই, গল্পকার বা ঔপন্যাসিক হতে চাইলে প্রচুর গল্প-উপন্যাস অথবা নাট্যকার বা চলচ্চিত্র-বেতার-দূরদর্শনের জন্য চিত্রনাট্য লেখক হতে গেলে সেরকম লেখা।)

খ) নিজের অভিজ্ঞতাগুলোকে পরিণত হতে দেওয়া। অর্থাৎ চারপাশের জীবন ও জগৎ থেকে যা-যা শিখছেন এবং দেখছেন তা থেকে একটা বোধ বা অন্তর্দৃষ্টি অর্জন করা।

গ) নিজস্ব চিন্তাভাবনা আর ঘটনা বা অভিজ্ঞতাগুলোকে ডায়েরিতে লিখে রাখার অভ্যাস গড়ে তোলা।

ঘ) বিষয় সম্বন্ধে ধারণাকে নিজের মধ্যে স্পষ্ট করে তোলা (যা বলতে চান, সেটা সম্বন্ধে নিজের মনে যাতে কোনো অস্পষ্টতা না থাকে)।

ঙ) বক্তব্যকে সহজবোধ্য, যথাযথ এবং প্রত্যক্ষ করে তোলার চেষ্টা করা।

চ) নিজেই নিজের লেখার সমালোচক হয়ে ওঠা এবং অন্যদের গঠনমূলক সমালোচনাকেও গুরুত্ব দেওয়া।

ছ) ভাষা ব্যবহার বা প্রয়োগরীতির ওপর ব্যুৎপত্তি অর্জন করা যাতে লেখাটা পাঠযোগ্য হয়ে ওঠে বা পাঠকের রসবোধকে জাগিয়ে তুলে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত লেখার প্রতি তাঁর আকর্ষণ ধরে রাখতে পারে। (বাংলা ভাষায় লিখলে বাংলার বিভিন্ন আঞ্চলিক রূপগুলোকে জানা, বাগ্‌ধারা, শব্দের বিশিষ্ট ও আলঙ্কারিক প্রয়োগ এবং ব্যাকরণ ইত্যাদিকে ভালো করে জানা এর মধ্যে পড়ে।)

সহজ কথায়, শুধু মূল লেখাটি লিখে ফেললেই লেখকের ভূমিকা শেষ হয়ে যায় না বরং এটাকে নান্দনিকভাবে উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে প্রকাশককে নানান তথ্য ও ডকুমেন্ট দিয়ে সার্বিক সহযোগিতা করতে হয়। প্রকাশকের কাছে প্রয়োজনীয় সব তথ্য ও ডকুমেন্ট জমা দেওয়ার পর প্রকাশনায় সংশ্লিষ্ট কাজগুলো শুরু হয়। প্রকাশক তখন নিজস্ব ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। তিনি তাঁর সহযোগী সম্পাদক, কম্পোজিটর বা অপারেটর, প্রুফসংশোধকদের সাহায্যে পাণ্ডুলিপিটিকে বই হিসেবে প্রকাশের উপযোগী করে তোলেন। অনেক সময় বিপণনের ব্যবস্থাও করেন।

১৪.৩.২ পাণ্ডুলিপির বিন্যাস :

কেউ প্রথম প্রয়াসেই নিখুঁত খসড়া লিখতে পারেন না। তার জন্য চাই প্রতিনিয়ত অভ্যাস, আর চাই বিষয় ও পদ্ধতি সম্পর্কে গভীর প্রায়োগিক জ্ঞান। একজন লেখক কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, গীতিনাট্য, প্রবন্ধ ইত্যাদি যা'ই লিখতে চান না কেন, এদের রূপরীতি বা কাঠামো সম্পর্কে তাঁর প্রাথমিক ধারণা থাকা আবশ্যক। এগুলোকে বুনিয়াদি ধারণা বলাই সঙ্গত। নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে তিনি ওই বুনিয়াদি ধারণা অনুযায়ী উপযুক্ত কাঠামোর মধ্যে নিজস্ব ভাবনাগুলোকে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেন। এক্ষেত্রে নিরন্তর পাঠের অভ্যাসই লেখককে কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ ইত্যাদি লেখার কৌশল সম্বন্ধে সচেতন করে তোলে। এই কৌশলগুলো আয়ত্ত করতে হলে সেসম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন একজন শিক্ষানবিশ লেখকের মৌলিক কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। কৌশল আয়ত্ত হলেই যেকোনো ধরনের রচনার জন্য একজন ভালো পাণ্ডুলিপি লেখক হিসাবে তিনি প্রতিষ্ঠা পেতে পারেন। আর সেজন্য পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করার সময় লেখককে কতগুলো পর্বের ভেতর দিয়ে যেতে হয়। এগুলোকে কেউ কেউ তিনটি আবার কেউ কেউ পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করে নিতে পারেন। তিনটির পরিবর্তে পাঁচটি পর্বে রচনার কাজটিকে ভাগ করলে অনেকটা বড়ো পরিসরে লেখকের দায়িত্বকে বোঝানো সম্ভব।

১৪.৪ প্রুফ সংশোধকের যোগ্যতা ও কর্তব্য

সম্পাদনার একেবারে সর্বশেষ ধাপ প্রুফ এডিটিং। তাই কাজটা অনেক স্পর্শকাতর। কারণ, ছাপা হয়ে গেলে আর সংশোধনের সুযোগ থাকে না। ভুল বানান বা এই জাতীয় অন্য কোনো ভুল ভ্রান্তি পাঠকের কাছে সেই প্রকাশনার বিশ্বাসযোগ্যতাকে বিনষ্ট করে ও গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্নও ওঠে। পাঠকের কাছে ভুল বার্তা তুলে ধরে একই সাথে নবীন

পাঠকদের কাছে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। তাই ভুল প্রকাশনা মানেই পাঠকের ক্ষতির সাথে সাথে প্রকাশনার বিশ্বাসযোগ্যতার ক্ষতিও বটে। এই সকল বিষয়কে মাথায় রেখে বলা যেতেই পারে যে কোনো প্রকাশনার ক্ষেত্রেই প্রুফ সংশোধন আবশ্যিক। তাই একজন প্রুফ রিডারের কিছু যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন, সেগুলি হল—

১। প্রুফ রিডারের অবশ্যই যে ভাষায় লেখা প্রুফ করতে হবে সে সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকতে হবে।

২। সবচেয়ে বেশি বানান-সম্পর্কিত জ্ঞানের ওপর জোর দিতে হবে। প্রুফ রিডার হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে নিজের জানাশোনার আগ্রহ থাকা দরকার। শুদ্ধ করে বানান লেখার খুঁটিনাটি বিষয় আয়ত্তে রাখতে হবে। বানানের ক্ল্যাসিক ও আধুনিক ফরম্যাট সম্পর্কেও স্বচ্ছ ধারণা থাকতে হবে।

৩। ব্যাকরণ বিষয়ে ধারণা থাকলে আনুষঙ্গিক ভুলও সংশোধনে সাহায্য করতে পারা যায়।

৪। প্রুফ রিডিংয়ে ভালো করতে চাইলে সাহিত্য বিষয়ক বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

৫। এ পেশায় সার্টিফিকেটের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা।

৬। নিয়মিত অভিধান পড়তে হবে, যেন প্রয়োজনের সময় দ্রুত সঠিক বানানটি বের করা যায়।

এসব ছাড়াও প্রুফ রিডার হতে গেলে কতকগুলি অতি আবশ্যিক গুণাগুণ থাকতে হয়। সেগুলো হলে:

- পেশাগত জ্ঞান।
- ব্যকরণের উপর বিশেষ দক্ষতা।
- ভাষার উপর দক্ষতা (যে ভাষায় তিনি প্রুফ রিডিং করবেন)।
- বানান সম্পর্কে অতি সচেতন।
- সম্পাদনার জ্ঞান।
- বাক্য সংগঠনের জ্ঞান।

সংবাদপত্র, পত্রিকা, বই বা এ জাতীয় মুদ্রণ প্রকাশনার ক্ষেত্রে ছাপার আগে কম্পোজিং এ কোনো ভুলভ্রান্তি আছে কিনা যাচাই করে, বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করে, নির্ধারিত প্রুফ রিডিং সংকেত ব্যবহার করে প্রুফ রিডিং করে সংশোধন করা হয়। এখন অবশ্য বিভিন্ন সফট্ওয়্যার এই ভুল সংশোধনে সহায়তা করে। 'প্রুফরিডার'-এর সংশোধনের স্তরটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। একটি পাণ্ডুলিপিকে ছাপার যোগ্য করে তুলতে হলে তাঁকে নিবিড়ভাবে বহু দিকে লক্ষ রাখতে হয়। যেমন—

- প্রুফ সংশোধকের যাবতীয় সংশোধনী চিহ্ন সম্বন্ধে জ্ঞান থাকতে হয়। কেননা উপযুক্ত চিহ্ন ব্যবহার করেই তিনি গ্যালিপ্রুফের নানা ত্রুটি দেখিয়ে দিতে পারেন।

- একজন প্রুফ সংশোধক প্রথমেই দেখবেন সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপিতে একই বানান রীতি যেন অনুসরণ করা হয়। লেখকের পাণ্ডুলিপিতে ভুল বানান থাকলে তাকে প্রুফরিডার সংশোধন করবেন বাক্যগঠন, শব্দার্থ ও তার যথার্থ প্রয়োগ সম্বন্ধেও সম্যক জ্ঞান থাকতে হয় একজন প্রুফ-সংশোধকের। প্রয়োজন হলে বাক্যগঠন, শব্দ প্রয়োগ ইত্যাদি বিষয়ে লেখকের যাবতীয় ত্রুটি সংশোধনের দায়িত্ব তাঁর।
- বইয়ের বহিরঙ্গ সৌন্দর্যের প্রতি বা তার নান্দনিক পরিবেশনার ওপর প্রুফ-সংশোধকের কড়া নজর থাকতে হবে। গ্যালিপ্রুফটি সুশৃঙ্খল ভাবে সাজানো হয়েছে কি না, ছবি-সারণি-মানচিত্র ইত্যাদির স্থান নির্দিষ্ট করা এবং যে পৃষ্ঠায় সেগুলো ছাপা হবে তা নির্দিষ্ট করা হয়েছে কি না, হঠাৎ বড়ো অক্ষর দেওয়া হয়েছে কিনা বা হরফ বদলে গেছে কি না, গ্যাপিং প্রয়োজন কি না, হরফের মধ্যে ফাঁক বেশি বা কম আছে কি না, কোনো আঙ্কিক নিয়মের বা প্রতিপাদ্যর (mathematical formula) চিহ্ন ঠিকঠাক বসানো হয়েছে কি না, 'কপি' বহির্ভূত শব্দ-বাক্যবন্ধ ছাপা হয়েছে কি না বা একই বাক্যাংশ দুবার ব্যবহার করা হয়েছে কি না- ইত্যাদি বিষয়ের ওপর প্রুফ-সংশোধকের নজর রাখতে হয়। এছাড়াও যেসব বিশেষ কাজ একজন প্রুফ-রিডারকে করতে হবে সেগুলো হলো—
    - ভুল বানান । বাংলা বানানের ক্ষেত্রে আর একটি বড় করে দেখার বিষয় হল ঐক্যবদ্ধ বানান (Uniformed Spelling) একই বইতে একই বানান নানাভাবে লেখা উচিত নয়।
    - উলটে যাওয়া অক্ষর অযথা অপ্রয়োজনীয়/অতিরিক্ত কোন অক্ষর।
    - একটি শব্দের বিভিন্ন অক্ষরের মধ্যে ফাঁক থাকা বা দুটি শব্দের মধ্যে প্রয়োজনীয় ফাঁক না থাকা বা অতিমাত্রায় ফাঁক থাকা।
    - মূল লেখার কিছু অংশ বাদ যাওয়া।
    - এক রকম টেইপের সঙ্গে অন্য রকম টাইপ মিশে যাওয়া বা এক পয়েন্টের টাইপর মধ্যে অন্য পয়েন্টের টাইপ আসা, একে বলে Wrong fount (wf)।
    - তারিখ ও সালের গোলমাল।
    - একই শব্দ বা বাক্য দুবার কম্পোজ হওয়া।
    - ইংরাজি টাইপের ক্ষেত্রে ক্যাপিটালের বদলে স্মল ও স্মলের বদলে ক্যাপিটাল।
    - প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ইটালিক শব্দ বসানো বা না বসানো।

- প্যারাগ্রাফ না ভেঙে দীর্ঘ প্যারাগ্রাফ করা।
- পাতার ভুল নম্বর বসানো।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

২। প্রুফ সংশোধকের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ে লিখুন। (২০০ শব্দের মধ্যে)

১৪.৫ প্রুফ সংশোধন প্রক্রিয়া

প্রুফ সংশোধনের বিভিন্ন স্তর বা পর্যায় আছে। একটা পাণ্ডুলিপি তৈরি হওয়ার সময় থেকেই কাজটা শুরু হয়। চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপিটি লেখক যখন তৈরি করেন, তখন প্রাথমিক সম্পাদনার ভারটা তাঁর ওপরেই বর্তায়। সেজন্য সংশোধনের এই পর্যায়গুলোকে নিম্নলিখিত ভাবে সাজানো যেতে পারে—

- লেখকের প্রাথমিক সংশোধনের স্তর
- কম্পোজিটর বা অপারেটরের স্তর
- 'প্রুফ রিডার'-এর সংশোধনের স্তর (এটা একাধিকবার হতে পারে)
- নির্দেশানুযায়ী কম্পোজিটর বা অপারেটর পর্যায়ে সংশোধনের স্তর

লেখকের দিক থেকে তাঁর পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের কাছে দেবার আগে পাঠশুদ্ধি সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে নেওয়া খুব জরুরি। এই স্তরেই বানান শুদ্ধি, উপযুক্ত শব্দ প্রতিস্থাপন, বিরাম চিহ্নের প্রয়োগ ইত্যাদি বিষয়ে লেখককে নিঃসন্দেহ হয়ে নিতে হবে। বাংলায় ইংরেজির মতো বড়ো হাতের (Capital letter) বা ছোটো হাতের (Small letter) অক্ষরের প্রয়োগ নেই। তবু হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি হলে হরফের প্রকার ও পরিমাপ (যেমন, গীতাঞ্জলি/১৪ বা কালপুরুষ/১২) বলে দেওয়া উচিত। পরিচ্ছেদের কোন অংশের হরফ কত পরিমাপের হবে, সেটাও তাঁকে নির্দিষ্ট করে দিতে হয়। শিরোনামের অক্ষর/হরফের পরিমাপ, মূল অংশের হরফ ও বিশেষ অক্ষর বা পঙ্‌ক্তির পরিমাপ বিষয়েও লেখকের নির্দেশনা থাকা জরুরি। তবে পাণ্ডুলিপি টাইপ করা হলে এসব সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব। অনেক নির্দেশনাই তখন পাণ্ডুলিপিতে না লিখে দিলেও 'কম্পোজিটার' বা সম্পাদক বুঝে নিতে পারেন। তাছাড়া প্রত্যেক প্রকাশনা সংস্থারই নিজস্ব টাইপ-সেটিং ব্যবস্থা থাকে। সুতরাং লেখকের নির্দেশনা থাকলেও সম্পাদক কাজের সুবিধের জন্য নির্দিষ্ট টাইপ-সেটিং ব্যবহার করতে পারেন। নিম্নে প্রুফ-সংশোধনের প্রক্রিয়াটি আলোচনা করা হল—

ক) সাধারণ ত্রুটি (General)

১। বানান সমতা অনুসরণ করা, অর্থাৎ সর্বত্র একই বানান-রীতি প্রয়োগ নিশ্চিত করা

২। শব্দ, পদ বা বাক্যের মধ্যে অবাঞ্ছিত অক্ষর বা শব্দ/পদ মোছা (delet)

৩। উলটে যাওয়া বা ভাঙা অক্ষর বদলানো (অফসেট প্রেসে এর প্রয়োজন হয় না)

৪। শব্দ বা পদের মধ্যকার ত্রুটিপূর্ণ ভাবে ছাপা হওয়া অক্ষর বা মাত্রার ক্রম বদলানো

৫। পাণ্ডুলিপির বাদ পড়া অংশ যেমন অক্ষর, পদাংশ, বাক্যাংশ ইত্যাদি জুড়ে দেওয়া

৬। সাংকেতিক ভাবে লেখা কোনো শব্দ বা পদকে তার পূর্ণ রূপে উল্লেখ করা (যেমন সু.সেন > সুকুমার সেন, পৃ. > পৃষ্ঠা)

৭। সন, তারিখ ইত্যাদি যথাযথ ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে কি না, দেখা

৮। একই শব্দ, পদ, বাক্য বা বাক্যাংশ দুবার ছাপা হলে মুছে দেওয়া

৯। প্রয়োজনীয় শব্দ বা পদ বা বাক্যাংশ নিম্নরেখায়িত (Underline) করা বা না করা

১০। পৃষ্ঠা সংখ্যা ঠিক করা (কোন পৃষ্ঠাগুলো রোমান লিপি বা বাংলা বর্ণের ক্রম অনুসারে হবে, আর কোনোগুলোতে সংখ্যা শব্দ বসবে) ইত্যাদি।

খ) বিরাম সহ অন্যান্য চিহ্ন (Punctuation marks and others)

১। বিভিন্ন বিরাম চিহ্ন (যেমন কমা, দাঁড়ি, সেমিকোলন, প্রশ্নবোধক, বিস্ময়বোধক ইত্যাদি) ঠিক জায়গায় বসেছে কি না বা বাদ পড়ে গেছে কিনা

২। অন্যান্য চিহ্ন (যেমন ড্যাশ, কোলন, হাইফেন, উদ্ধৃতি, ঊর্ধ্বকমা, হসন্ত চিহ্ন, বন্ধনী, ত্রিবিন্দু, তারকা ইত্যাদি) যথা প্রয়োগ করা হয়েছে কি না বা বাদ পড়ে গেছে কিনা

৩। বিভিন্ন অঙ্কসূত্রের (formula) চিহ্ন বা যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ ইত্যাদি চিহ্ন, সময় প্রকাশক চিহ্ন ঠিকভাবে দেওয়া হয়েছে কিনা।

গ) ফাঁক সম্পর্কিত (Spacing)

১। শব্দ বা পদের অন্তর্গত বিভিন্ন অক্ষরের মাঝে ফাঁক কমানো বা বাড়ানো

২। শব্দ বা পদের মধ্যে অবস্থিত বিচ্ছিন্ন অক্ষরগুলো জুড়ে দিয়ে ফাঁক সমান করা

৩। পঙ্‌ক্তি বা অনুচ্ছেদের মধ্যে অবস্থিত প্রতিটি শব্দ বা পদের ফাঁক সমান করা

৪। অনুচ্ছেদের অন্তর্গত প্রতিটি পঙ্‌ক্তির মধ্যে ফাঁক বাড়ানো বা কমানো

৫। ফাঁকা অংশে কোনো চিহ্ন (বিরাম বা অন্যান্য) বসিয়ে জুড়ে দেওয়া

৬। পঙ্‌ক্তির অন্তর্গত প্রতিটি অক্ষরের মধ্যে ফাঁক সমান রেখে বিন্যস্ত করা ইত্যাদি।

ঘ) পঙ্‌ক্তি বিন্যাস সম্পর্কিত (Alignment)

১। অনুচ্ছেদ ডান দিকের ধার (margin) বা বাঁদিকের ধার ধরে অথবা পাতার

মাঝখানে রেখে বিন্যস্ত করা (এটা পাঠের মধ্যে একটি বিশেষ অংশকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য করা হয়ে থাকে)

২। এলোমেলো পঙ্‌ক্তিগুলোকে বিন্যস্ত করা

৩। অনুচ্ছেদের প্রথম শব্দ বা পদের প্রথম অক্ষরের বিন্যাস ঠিক করা

৪। পঙ্‌ক্তির 'মেজার' ঠিক করা, তাকে বাড়ানো বা কমানো

৫। পঙ্‌ক্তির কোনো অংশ ওপরের দিকে ওঠানো বা নিচের দিকে নামিয়ে বিন্যস্ত করা

৬। পঙ্‌ক্তির অন্তর্গত আঁকাবাঁকা অক্ষরগুলোকে দৃঢ়ভাবে বিন্যস্ত করা

৭। ছবি, মানচিত্র, সারণি ইত্যাদির বিন্যাসের স্থান নির্ধারণ

৮। নতুন অনুচ্ছেদ শুরু করা বা দুটি অনুচ্ছেদকে একটিতে রূপান্তরিত করা ইত্যাদি।

ঙ) অক্ষর বা হরফ বিন্যাস (Type)

১। শব্দ বা পদের অন্তর্গত প্রয়োজনীয় অক্ষর বা হরফকে বক্র (Italics), গাঢ় বা মোটা (Bold) করা

২। একরকম অক্ষর বা হরফের সঙ্গে একই শব্দ বা পদে অন্য পরিমাপের বা প্রকারের অক্ষর বা হরফ ব্যবহারকে ঠিক করা

৩। একটি শিরোনাম বা অনুচ্ছেদ বা পৃষ্ঠার হরফে বদল করা (আকার বাড়ানো বা কমানো অথবা প্রকার)

৪। অনুচ্ছেদের প্রথম অক্ষর বা হরফটি বড়ো আর বাকিগুলো ছোটো পয়েন্ট-এ হবে, সেটা জানানো ইত্যাদি।

বস্তুতপক্ষে, অফসেট-প্রেসের যুগে (যেখানে ফটোটাইপ পদ্ধতিতে কম্প্যুটারের স্ক্রিনে ম্যাটার তৈরি করা হয়) পঙ্‌ক্তি বিন্যাস ও অক্ষর বিন্যাসের অনেক নিয়মই বাতিল হয়ে গেছে। কারণ এই পদ্ধতিতে পঙ্‌ক্তির অক্ষরগুলো এলোমেলো হয়ে যাবার কোনো সুযোগ নেই। মেজার দিয়ে পঙ্‌ক্তির দৈর্ঘ্য সুবিন্যস্ত করা হয় ঠিকই, কিন্তু লাইনোটাইপ প্রেসে (টাইপ রাইটারের মতো) সিসার অক্ষরের টাইপ সেট বা লেটারপ্রেসে গ্যালি-ট্রেতে অক্ষর সাজানোর যুগ শেষ হয়ে যাওয়ায় পঙ্‌ক্তি বিন্যাসে আঁকাবাঁকা হরফ বসানো বা দুটি পঙক্তির মধ্যে একটি নিচের দিকে নেমে যাওয়া বা বেশি ওপরে উঠে যাওয়া, অক্ষর ভাঙা বা উল্টে যাওয়া ইত্যাদি ব্যাপারগুলোর মুখোমুখি আর প্রুফ-সংশোধককে হতে হয় না। হরফের বেলাতেও একই কথা। একবার যে হরফটিকে পেজ-সেটআপে কম্পোজিটর নির্দিষ্ট করে দিলেন, সেটাই থেকে যায় -যদি না তিনি অন্য কোনো হরফকে মাঝখানে বদলে নেন। সুতরাং হরফ সম্বন্ধীয় নানা অসুবিধা আজ আর প্রুফ-সংশোধককে দেখতে হয় না। যদি কম্পোজিটরের ভুলে হরফ বদল হয়ে যায়, একমাত্র তখনই তিনি তা নজরে আনেন। এছাড়া একজন দক্ষ প্রুফ সংশোধককে ম্যাটারে কোনো ছবি, মানচিত্র, সারণি থাকলে তার রঙ, গঠন, পরিমাপ

ইত্যাদি যথাযথ হয়েছে কিনা সেটাও দেখতে হয়। ছবির রঙের যথার্থ (resolution) তিনি ঠিকঠাক ভাবে বুঝতে পারেন ডিজিটাল প্রেস প্রুফে। সাধারণ প্রুফে, যা কাগজে ছাপান হয়, রঙ সম্বন্ধে সঠিক সিদ্ধান্ত তিনি নিতে পারেন না।

উল্লিখিত কাজগুলো করার আগে একজন প্রুফ-সংশোধককে 'প্রুফ-কপি' তৈরি করে নিতে হয়। প্রুফকপি বা প্রুফশিট তৈরির ব্যাপারে এখনও কোনো প্রেস কোনো সাধারণ পদ্ধতি নির্ণয় করেননি। বিভিন্ন ছাপাখানায় এখন A4 পরিমাপ বিশিষ্ট একটি কাগজে এক ইঞ্চি বা দেড় ইঞ্চির মার্জিন রেখে ম্যাটার তৈরি করে এবং সেটাই প্রুফকপি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কখনও নিজেদের সুবিধার জন্য অপারেটররা প্রকাশিতব্য গ্রন্থ বা যেকোনো রচনার চূড়ান্ত পরিমাপে ম্যাটার তৈরি করে সেটাকেই 'প্রেসপ্রুফ' হিসাবে ব্যবহার করেন। এ-বিষয়ে ছাপাখানাগুলোতে কোনো মানক নির্দেশিকা (standard instructions) ব্যবহৃত না হলেও মনে রাখতে হবে যে চূড়ান্ত সংশোধিত প্রুফ তৈরি হবার আগে অপারেটরকে অন্তত তিনটি পর্যায়ে প্রুফকপি তৈরি করতে হয়। লেটারপ্রেস যতদিন ছিল (এখন তার ব্যবহার খুবই সীমিত) ততদিন গ্যালিপ্রুফের গুরুত্ব ছিল সর্বাধিক। কারণ কাগজের দৈর্ঘ্য এখনকার A4 পরিমাপের চেয়ে অনেক বড়ো ছিল (প্রায় সংবাদপত্রের একটি পাতার মতো) এবং তাতে সংশোধনী চিহ্ন দেওয়া বা মন্তব্য সংযোজনের জন্য লেখার ডান ও বাঁদিকে প্রচুর জায়গা থাকত। তখন 'প্রেসপ্রুফ' থেকেই সংশোধনের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হতো। অফসেট ছাপাখানার যুগে 'soft proof' বা প্রুফের ডিজিটাল সংস্করণের প্রচলন বাড়লেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'print proof' বা A4 কাগজে ছাপানো কপিপ্রুফ (hard proof) ব্যবহৃত হয়। এই ধরনের প্রুফকে 'গ্যালি প্রুফ' না বলাই সঙ্গত। তবে এভাবে প্রুফকপি তৈরির একটি সাধারণ নিয়ম অনুসরণ করলে প্রুফ-সংশোধকের কাজ অনেকটা সহজ হয়ে যায়। এগুলোকে 'প্রুফকপি তৈরির নিয়ম' বলা যেতে পারে—

ক) প্রথম অসংশোধিত প্রুফকপিতে A4 কাগজের এক পিঠে ডানে-বাঁয়ে, উপরে-নিচে দুই ইঞ্চি করে মার্জিন রাখতে হবে। দুটো পঙ্‌ক্তির মধ্যে দুই পরিসর ফাঁক (double space) রাখতে হবে এবং অক্ষরের পরিমাপ হবে ১৪ পয়েন্ট।

খ) দ্বিতীয় প্রুফে পাতার মার্জিন একই থাকবে অর্থাৎ চারদিকেই দুই ইঞ্চি করে জায়গা থাকবে। দুই পঙ্‌ক্তির মাঝখানে ফাঁক দুই পরিসর ও অক্ষরের পরিমাপ হবে ১৪ পয়েন্ট। এবারেও প্রুফ সংশোধক ত্রুটিগুলো গভীর অভিনিবেশ সহকারে দেখে মার্জিনে চিহ্ন দিয়ে পাঠে ত্রুটির অংশটিকে নির্দিষ্ট করে অপারেটরের কাছে পাঠাবেন।

গ) চূড়ান্ত প্রুফে (final press proof) মার্জিন এক ইঞ্চি, পঙ্‌ক্তির ফাঁক ১.১৫ পরিসর ও অক্ষর ১২ পয়েন্টের হবে। কখনও অপারেটর চূড়ান্ত প্রুফ তৈরির আগে 'পেজ সেটআপ' করে নিতে পারেন। তখন বইয়ের সেই চূড়ান্ত বর্ণ সংস্থাপন সমন্বিত পাতাগুলো চূড়ান্ত প্রুফ হিসাবে প্রুফ-সংশোধকের কাছে

যাবে। সেক্ষেত্রে দুটি পঙ্‌ক্তির মাঝখানের ফাঁক এবং অক্ষরের পরিমাপ পাতার যথার্থ পরিসর অনুযায়ী নির্ধারিত হতে পারে।

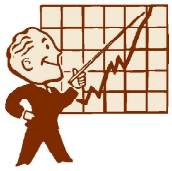
অনেক সময় দেখা যায় কোনো কোনো প্রুফ-সংশোধক কাজের সুবিধার জন্য A4 কাগজের দু-ধারে আলাদা কাগজ জুড়ে নেন। যদি মূল প্রুফটি কলাম-বিশিষ্ট হয় তবে এক একটি কলাম আলাদা করে A4 কাগজের মাঝখানে সেঁটে তারপর প্রুফ সংশোধন করেন। কিন্তু যেভাবেই করুন, প্রুফ-সংশোধককে সংশোধনের চিহ্ন ও মন্তব্য লিপিবদ্ধ করার জন্য উপযুক্ত পরিসর যুক্ত প্রুফকপি তৈরি করে নিতে হয় বা অপারেটরকে সেটা তৈরি করে দিতে হয়। প্রুফ সংশোধনের কাজে এই প্রুফকপি তৈরি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

১৪.৬ প্রুফ সংশোধনের বিভিন্ন সংকেত ও তাদের প্রয়োগ

একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রুফ-সংশোধন করা উচিত। প্রুফ সংশোধকদের মধ্যে চিহ্ন ব্যবহার নিয়ে কিছু মত পার্থক্য আছে। যেমন শব্দ বা অক্ষর মুছে দিতে কেউ 'del' লেখেন, কেউ বা ইংরেজি 'd' অক্ষরটি লিখে দেন, আবার কেউ সুতোর পাকের মতো বিচিত্র চিহ্ন তৈরি করেন। একই সংশোধনী নির্দেশিকার জন্য ভিন্ন ভিন্ন 'ম্যানুয়াল'-এ আলাদা আলাদা সংশোধনী চিহ্ন ব্যবহৃত হতেও দেখা যায়। আবার লেটারপ্রেসের পরিবর্তে যাঁরা অফসেট বা ডিজিটাল প্রেসে কাজ করেন, অনেক নির্দেশিকাই এখন আর তাঁদের কাজে লাগে না। তা হলেও এখানে একটি সর্বজনমান্য সংশোধনী রীতি এবং তার সঙ্গে যুক্ত চিহ্নগুলোকে দেখানো হয়েছে, যেটা অনুসরণ করে প্রুফ-সংশোধনের বিভিন্ন চিহ্ন সম্বন্ধে একটি সাধারণ ধারণা গড়ে ওঠা সম্ভব—

⁀	:	জুড়ে দাও Close up.
trs./	:	স্থানান্তরিত কর বা চাল। Transfer.
L.e./	:	ছোট ছাঁদের হরফ। Small letters. (ইংরাজির ক্ষেত্রে)
sm. cap/	:	বড় ছাঁদের ছোট হরফ। Small Capitals.
cap./	:	বড় অক্ষর। Change to Capital letter
all cap/	:	সবগুলো অক্ষর বড় হাতের হবে। All Cap
ital/	:	বাঁকা অক্ষর বসাও। Replace with italic letters.
St/	:	কাটা হরফ ঠিক রাখ। Put the lins though penned through.
N.P./	:	নতুন প্যারা আরম্ভ কর। Begin a new paragraph.
F2/	:	মোটা অক্ষর দাও। Put antique letters.
Run on	:	এক লাইনে সাজাও। Put in the same line.

d/	:	তুলে দাও বা বাদ দাও। Delete.
See Copy	:	কপি ছাড়া গেছে। দেখে ঠিক কর। Insert the word or words omitted.
#/	:	ফাঁক দাও। Insert space.
’/	:	Inverted comma দাও। Put inverted comma.
,/	:	কমা বসাও। Put a comma.
eq#/	:	ফাঁক সমান কর। Equalize spacing
Less #/	:	ফাঁক কমাও। Reduce space.
ব/	:	কোনো অক্ষর নীচে বসলে, যেমন— (উজ্জ্বল)
ব/	:	কোনো অক্ষর উপরে বসলে, যেমন— (লব্ধ)
$F^1|_4$	:	সরু হরফ
Pt. Up	:	টাইপ বড় কর
Pt.down	:	টাইপ ছোট কর
=/	:	লাইন সমান কর



অগ্রগতির নির্ধারক প্রশ্ন

৩। বাংলা প্রুফ সংশোধনের প্রক্রিয়া ও চিহ্ন পরিচিতি তুলে ধরুন। (২০০ শব্দের মধ্যে)

১৪.৭ অধ্যায় সংক্ষেপ

প্রকাশই সাহিত্য— আর যাকে আমরা ‘সাহিত্য’ বলি, তাকে প্রকাশযোগ্য করে তোলার পেছনে লেখক ছাড়াও একজন সম্পাদক ও প্রুফ-সংশোধকদের ভূমিকা অন্যতম। মূলত একটি লেখা ত্রুটিহীন করে তুলতে প্রুফ সংশোধকরাই প্রাক্ স্মরণীয়। লেখক তাঁর লেখার সম্পূর্ণ রূপ দানের পর লেখাটি যখন টাইপ হয়ে আসে তখন তিনি প্রুফ সংশোধকের দ্বারা অনুচ্ছেদ ও বাক্য দেখার পাশাপাশি বানান, ভুল টাইপিং ইত্যাদি সামগ্রিক খোলনচে পরীক্ষা করে দেখেন। পরবর্তীতে প্রুফ পরীক্ষকের সবুজ সংকেত পেলেই লেখাটির গ্রন্থরূপ বাস্তবায়িত হয়ে ওঠে। একজন প্রুফ রিডার প্রুফ সংশোধনের নির্দিষ্ট চিহ্ন মাথায় রেখে প্রুফ কপির মার্জিনে তিনি ভুল সংশোধনের স্পষ্ট নির্দেশ প্রদান করবেন যার দ্বারা প্রকাশন সংস্থা সেটা বুঝে সেসব ভুল সংশোধনের মাধ্যমে একটি নির্ভুল লেখা প্রকাশে সমর্থ হবেন।



১৪.৮ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

- অধ্যায়টি পাঠ করে পাণ্ডুলিপি যে একটি লেখার প্রাথমিক অবস্থা ও তা নির্মাণে লেখকের বিশেষ কিছু দায়িত্ব বর্তায় সে সম্পর্কে অবগত হবেন।
- প্রুফ সংশোধকের যে বিশেষ ধরনের দায়িত্ব ও কর্তব্য থাকে তার পূর্ণাঙ্গ তথ্য জানবেন যেমন একজন প্রুফ সংশোধককে যে একজন ভালো পাঠক হতে হয় এবং লক্ষ্য ভাষা ক্ষেত্রে স্পষ্ট জ্ঞান থাকতে হয় সে বিষয়ে জানবেন।
- প্রুফ সংশোধনের বিশেষ সাংকেতিক চিহ্ন চিনে তাদের প্রয়োগ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ভবিষ্যতে তার সুষ্ঠু প্রয়োগ করার উপায় শেখা হলো।



১৪.৯ অতিরিক্ত পঠন

ইসলাম, শেখ মকবুল (২০১২); গবেষণার পদ্ধতি বিজ্ঞান সাহিত্য-সমাজ-সংস্কৃতি; কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ

বন্দ্যোপাধ্যায়, অপরাজিতা (বাংলা ১৪২২); প্রুফ সংশোধনের প্রথম পাঠ; কলকাতা : প্রজ্ঞা বিকাশ

সেনগুপ্ত, জ্যোতির্ময় (২০২৩); পাণ্ডুলিপি থেকে প্রুফ সংশোধন; কলকাতা : সপ্তর্ষি প্রকাশন



১৪.১০ অগ্রগতির নির্ধারক উত্তর-সংকেত

১। নং প্রশ্নের উত্তর : সাধারণত, ইংরেজি 'ম্যানাসক্রিপ্ট' শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে 'পাণ্ডুলিপি' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। ... (দ্রষ্টব্য ১৪.৩ অংশ)

২। নং প্রশ্নের উত্তর : ভুল প্রকাশনা মানেই পাঠকের ক্ষতির সাথে সাথে প্রকাশনার বিশ্বাসযোগ্যতার ক্ষতিও বটে। এই সকল বিষয়কে মাথায় রেখে বলা যেতেই পারে যে কোনো প্রকাশনার ক্ষেত্রেই প্রুফ সংশোধন আবশ্যিক।.... তাই একজন প্রুফ রিডারের কিছু যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন (দ্রষ্টব্য ১৪.৪ অংশ)

৩। নং প্রশ্নের উত্তর : প্রুফ সংশোধনের নির্দিষ্ট চিহ্ন ও তার প্রয়োগ জেনে এই উত্তর সম্পন্ন করতে হবে। (দ্রষ্টব্য ১৪.৬ অংশ)



১৪.১১ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। পাণ্ডুলিপি বিষয়ে একটি বিস্তৃত আলোচনা প্রস্তুত করুন।

২। প্রুফ সংশোধনের প্রক্রিয়া বিষয়ে নিজের মতামত লিপিবদ্ধ করুন।

৩। একজন অভিজ্ঞ প্রুফ সংশোধকের যোগ্যতা ও করণীয় বিষয়ে আলোকপাত করুন।

৪। পাণ্ডুলিপি লেখকের বিশেষত্ব বিষয়ে আলোচনা করুন।

৫। উদাহরণসহ প্রুফ সংশোধনের সাংকেতিক চিহ্নের ব্যবহার বুঝিয়ে দিন।

——